বিবাহিতা স্ত্রী

বিবাহিত স্ত্রী

প্রতিভা বসু

নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদচিত্র খালেদ চৌধুরী কর্তৃক অঙ্কিত

প্রথম মুদ্রণ
বৈশাখ ১৩৬১, মে ১৯৫৪

দাম : সাড়ে তিন টাকা

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

উৎসর্গ

প্রিয়ংবদ

শ্রীঅরুণকুমার সরকার-কে

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রমীলার স্বভাব মন্দ ব'লে কপাল মন্দ নয়। জীবনে তার নিজের বুদ্ধিতে যা-যা সব চাইতে কাম্য ব'লে মনে হয়েছিলো সবই সে পেয়েছিলো। জন্মেছিলো ধনবান পিতার ঘরে। সেখানে তার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ছিলো। হিংসা, দ্বেষ, লোভ, ক্রোধ— চরিত্রে প্রায় প্রত্যেকটা রিপু নিয়েই সে এসেছিলো সংসারে। পিতার অপরিমিত প্রশ্রয়ে সেগুলো আগুনে ঘৃতাহুতির মতো আরো বেড়ে উঠবার অবকাশ পেলো। কাজে-কাজেই তার সেই হিংসুক স্বভাব, ঝগড়ার প্রবৃত্তি এবং অন্ধ স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনের যাবতীয় ক্লেদ আশেপাশের সকলকেই পীড়িত করতো। কেবলমাত্র যারা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশত তার নিকটতম আত্মীয়রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলো তারাই যে উৎপীড়িত হ'তো তা নয়, প্রমীলার মা সুধাময়ীও অত্যন্ত অসুখী ছিলেন।

প্রমীলার আগে আরো-তিনটি শিশু জন্মেছিলো সেই বাড়িতে। একটি কোনো-এক বসন্তের সকালে, একটি শীতের ঈষদুষ্ণ দুপুরে, আর-একটি শরতের শেফালি-ঝরা সন্ধ্যায়। প্রথমটি অন্ধ হ'য়ে এসেছিলো, পৃথিবীকে সে ভাখেনি। সুধাময়ী মৃতপ্রায় হয়েছিলেন এই সন্তানের জন্ম দিতে, কাজেই শিশুটি তার এক সপ্তাহের ক্ষণিক জীবনে মাতৃসুধা পান ক'রেও ভাখেনি তার আস্বাদ কেমন। এ-দাইয়ের হাত থেকে ও-দাইয়ের হাতে, এ-মাসীর কোল থেকে ও-পিসীর কোলে যেতে-যেতেই শেষ হ'য়ে গেল। দ্বিতীয়টি ছিলো সতেরো দিন। রোগা, ছোট্ট, জীর্ণ-শীর্ণ এইটুকু একটা ছাল-ছাড়ানো পাখির মতো। যে-ক'দিন রইলো অবিশ্রান্ত কাঁদলো, তারপর হঠাৎ কান্না থামলো একদিন। একটু লাল হ'লো, একটু নীল হ'লো, একটু যেন হাসলো যাবার আগে, তারপরেই

স্থির। পথ ভুল ক'রে বুঝি পরের ঘরে এসে পড়েছিলো, এইবার রাস্তা চিনে চ'লে গেল আপন-ঘরে। এর পরে প্রমীলার মা শয্যা নিলেন এবং কোনো প্রাণ-কণিকাকে এ-বাড়িতে আমন্ত্রণ করার তুল্য পাপ যে আর নেই সে-সত্যটিও হৃদয়ঙ্গম করলেন। কাজেই চেষ্টা করলেন যাতে আর-কোনো শিশু না জন্মায় তাঁর গর্ভকোষে, তাঁর স্বামীর দূষিত রক্তে। তাঁর অশান্তিময় জীবনে আর যেন দুঃখ না বাড়ে। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর কন্‌ট্র্যাকটর তাঁর স্বামিত্বের বলাৎকারে স্ত্রীর সব আপত্তি ভাসিয়ে প্রত্যহের চেষ্টায় কিছুকালের মধ্যেই আরেকটি বীজ উপহার দিলেন। বললেন, 'একটু হাসো, একটু খুশিতে থাকো, ডাক্তারের কথা মতো খাও-দাও। তোমার জন্যই তো এ-রকম সব রুগ্ন শিশুর জন্ম হয়।'

'আমার জন্য?' বাঁ-চোখের ভুরুর একটা দিক তুলে স্ত্রী এমন ক'রে তাকালেন স্বামীর দিকে যে যজ্ঞেশ্বরবাবুর ছোটো-ছোটো লাল-লাল করমচার মতন চোখ পিটপিট করতে লাগলো।

দশ মাস পরে আরেকটি মৃত সন্তান জন্মালো তাদের।

প্রমীলার সম্ভাবনা হ'লো তার পুরো এগারো বছর বাদে। এতদিন পরে আবার কেন? এই প্রশ্নটি সুধাময়ী অনেকদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে জিগ্যেস করেছেন কি জানি কার উদ্দেশ্যে। আলস্যে, অবসাদে, ঘেন্নায় খারাপ লাগায় শরীর ভেঙে পড়েছে তাঁর। রাত দুটোয় গৃহপ্রত্যাগত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বোবা হ'য়ে গেছে সব ইচ্ছে, সব সাধ। মাতৃত্বের ক্ষুধা তাঁর মিটে গিয়েছিলো। বিবাহিত জীবন তাঁকে নিয়ে যে বঞ্চনা করলো, গর্ভজাত সন্তান যে তার ক্ষতিপূরণ ক'রে দেবে না এটা তিনি প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েই বুঝেছিলেন। তা ছাড়া, যে আসবে সে যে তার পিতারই পুনরাবৃত্তি হ'য়ে আসবে না তার কি কিছু স্থিরতা আছে? সেই সন্তান দিয়ে আবার কার

জীবনে তিনি নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখবেন? এ-কথা ভেবেই তাঁর আরো বেশি খারাপ লাগতো। না, শত্রুর জন্যেও সেই কামনা তিনি করেন না।

২

যজ্ঞেশ্বর কিন্তু ভীষণ খুশী হ'লো। সন্তানের পিতা হবার রোমাঞ্চ ছিলো না তার মনে, ছিলো সন্তানের পিতা হবার যোগ্যতার দম্ভ। এইখানে কোথায় একটা পরাজয়ের লজ্জা ছিলো তার। স্ত্রী বন্ধ্যা হ'লে কথা ছিলো না, কিন্তু তা যে নয়, সেটা তো আগেই প্রমাণ হ'য়ে গেছে। সন্তান দিয়ে জান বাঁচানোর মতোই মান বাঁচানোর একটা তাগিদ অনুভব করছিলো সে ভেতরে-ভেতরে। তাই আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, প্রতীক্ষায় অধীর হ'য়ে তার নীরন্ধ্র কৃপণ মুঠো এবার ঢিলে হ'লো স্ত্রীর যত্নে। মা ভালো থাকলে সেই নির্যাস টেনে তবে তো শিশুও ভালো থাকবে?

কন্‌ট্র্যাকটরি ক'রে রোজগার করে সে দু-হাতে, কিন্তু জমায় দশ হাতে। একটি পয়সা তার এ-পাশ ও-পাশ হবার উপায় নেই। আর সেই সঞ্চিত টাকায় দমদমের নির্জন মাঠ লীজ নিয়ে বস্তি বসিয়েছে আধমাইল জুড়ে, ভাঙাচোরা একতলা পৈতৃক বাড়িকে তেতলা ক'রে পাঁচ-ঘর ভাড়াটে বসিয়েছে, নিজে সেই একতলাতে থেকেই। লরি কিনেছে তিনটি, বারো-মাস ভাড়া খাটছে। নিজের জন্যেও একটা ঝরঝরে গাড়ি কিনেছে কার দুর্গতির সুযোগে। তা ছাড়া, ফাঁকে-ফিকিরে আসবাবপত্রও কিনেছে কিছু। আর কিনেছে সোনা। ভারি-ভারি গয়না গড়ানো হয়েছে তাই দিয়ে স্ত্রীর জন্য। কিনেছে সাচ্চা-জরির বহুমূল্য শাড়ি। বিয়ে-চুড়োয় যেতে-আসতে সে-সব খুলে দেয় স্ত্রীকে, পরতেই হয়। এক-গা গয়না প'রে

রোগা ছোট্ট মানুষটি ধুঁকতে থাকে; ভারি, থরথরে অবিরি বেনারসিতে বেলা দুপুরের রোদ্দুরে গা চুটমুট করে।

কিন্তু উপায় কী? যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রী না সে? তার স্বামীর টাকা আছে না? আর সেই টাকা তো তার শরীরেই ফুটে বেরুনো চাই। এমনিতে বাড়ির আটপৌরে ব্যবস্থাটা কিন্তু একেবারে নিম্নতম। হেঁটো শাড়ি আর গিলটির চুড়ি প'রেই জনম গেল। আর অশন তো অর্ধাশন। কেননা, বাজে শৌখিনতা যজ্ঞেশ্বরের দু-চক্ষের বিষ। ওতে ক'রে স্ত্রীলোকের ভ্রষ্টা হবার সম্ভাবনা থাকে। তা ছাড়া বাড়ির মধ্যে দেখতেই বা আসছে কে? খালি গায়েই থাকো আর সোনার জামাই পরো, দুই-ই সমান। সেটা অবিশ্যি সত্যি। যজ্ঞেশ্বরের বাড়িতে লোক আসাটা নেহাত বিরল। সেটা সে পছন্দ করে না। লোক এলেই অপব্যয়। স্ত্রী তার লক্ষ্মী নয়, বাজে খরচের দিকেই নজর বেশি। কে জানে লুকিয়ে-চুরিয়ে হয়তো পাঁচ-কাপ চা-ই তৈরি ক'রে দিলো। ঘরের চিনি, ঘরের দুধ পরের পেটে পাঠিয়ে কী যে লাভ কে জানে!

প্রত্যেক দিন বাজারও করে না সে। পাঁচ-কাঠা জমি জুড়ে তার লাউ-কুমড়োর খেত আছে, পুঁইয়ের মাচা আছে। বিক্রি ক'রেও প্রচুর থাকে তাদের খাবার মতো। মাছেই তো বাজারে আসল খরচ, পয়সা তো তাতেই যায়, তাই নিয়ম ক'রে সপ্তাহে তিন দিন কুচো চিংড়ি কি ছোটো পুঁটি আসে, সেদিন তো প্রায় ভোজ। দুধটা অবিশ্যি খায়। কেননা ঘরের গোরু আছে চারটি, জল মিশিয়ে বেশির ভাগ বিক্রিতে গেলেও নিজেদের জন্য বরাদ্দ আছে খানিকটা। নিজে সে দুধ ভালোবাসে।

ঐশ্বর্য তো ভোগের জন্য নয়, ঐশ্বর্যের কাজই হ'লো স্থির হ'য়ে থেকে অন্যের বুক ফাটানো, চোখ টাটানো— তোমরা শোনো, তোমরা ছাখো, তোমরা সবাই জানো আমার ঘরে এই আছে, ঐ আছে, অত ভরি

সোনা আছে, অত টাকা নগদ আছে, কতো সব আসবাবপত্র আছে ঘর ঠেসে।

সেই যজ্ঞেশ্বর দামি-দামি ওষুধ খাওয়াতে লাগলো স্ত্রীকে। মাছ না-খেলে প্রোটিনের অভাব হয় আর প্রোটিনের অভাব হ'লে প্রসূতির শরীর খারাপ হয় আর প্রসূতির শরীর খারাপ হ'লে শিশু রুগ্ন হয়, অতএব আসতে লাগলো মাছ, ফল খেলে শিশু সুস্থ থাকে, আসুক ফল। একতলার স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘর ডাক্তারের পছন্দ না, আচ্ছা চলো দোতলায় থাকি। আস্তে-আস্তে নিবিড় মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে কখন যেন সুধাময়ীর মনেও রোদ উঠলো একটু, মমতার রোদ। মাসের পর মাস বহন করতে-করতে মনে-মনে বললেন, 'আসছে আসুক। যেন আর আমাকে ছেড়ে না যায়, যেন বেঁচে থাকে কোল-জুড়ে, বুক-জুড়ে।' স্বামীর কথা মতো, ডাক্তারের কথা মতো প্রত্যেকটি পা ফেললেন দশ মাস ধ'রে। তারপর কোনো-এক অসম্ভব দুর্যোগের মধ্যরাত্রে ককিয়ে উঠলেন অসহ্য বেদনায়। বিদ্যুতে, বর্ষণে, মেঘগর্জনের গম্ভীর নিনাদে, ঝড়ের দাপাদাপিতে মনে হ'লো কালো কুচকুচে অন্ধকার রাতটি বুঝি সেদিন ভেঙে পড়বে আকাশসুদ্ধু। পৃথিবী নামে কোনো-কিছুরই আর অস্তিত্ব থাকবে না,—পৃথিবী মুছে যাবে, ধুয়ে যাবে, চারদিকে থাকবে শুধু জল, জল, আর জল।

এতদিন পরে, এত ইচ্ছের পরে সন্তান আসছে— তা নাকি এই দিনে? এই ভাবে? যজ্ঞেশ্বর একেবারে মাথায় হাত দিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো। কোমরে একটি ছোটো বটুয়া গুঁজে কতো বার চেষ্টা করলো একবার বেরুতে, একজন ডাক্তার আনতে। অসম্ভব। বন্ধ-দরজা ভেঙে ফেলছে ঝড়ের ধাক্কা, দরজা খুললে কি আর রক্ষা আছে?

আর, এদিকে বাতাসের শিস শুনতে-শুনতে হাত-পা এলিয়ে এলো

প্রমীলার মা-র। কী ভাগ্য তাঁর! মনে-মনে ভাবলেন। ব্যাকুল বাসনায় বুকের উপর দুই হাত জড়ো ক'রে বললেন, 'দাও, দাও— যে আসছে আসতে দাও তাকে, হে ঈশ্বর, তুমি তাকে পাঠিয়ে দাও তার মা-র কোলে, মা-র বুকে।' যত কাঁদলেন যন্ত্রণায়, তত কাঁদলেন প্রার্থনায়। ঈশ্বর শুনলেন সেই প্রার্থনা। গর্ভের অন্ধকার থেকে ধীরে-ধীরে নিচের দিকে নেমে এলো শিশু, মাকে বিদীর্ণ ক'রে নিজে থেকেই এক-সময় বেরিয়ে এলো পৃথিবীর আলো-হাওয়ায়। ডাক্তার তো দূরের কথা, একটা নার্স না, দাই পর্যন্ত না। দূর-সম্পর্কের একজন আশ্রিত বৃদ্ধা আনাড়ি হাতে নাড়ি কেটে বিভক্ত ক'রে দিলো মা আর শিশুকে। কেঁদে উঠে আপন অধিকার সাব্যস্ত করলো সদ্যোজাত কন্যা।

সেই ছাল-ছাড়ানো পাখি, বোজা চোখ, চোখের কোলভরা পিচুটি আর বিবর্ণ মুখশ্রী। ভয়ে সুধাময়ী মুখ ফিরিয়ে রইলেন। না, আর দেখে কী হবে? যে যাবার জন্যেই এসেছে তাকে আর মায়ায় জড়ানো কেন? চোরের মতো টিপিটিপি পায়ে দিন কাটে তাঁর। আর, আশ্চর্য! বাচ্চাটা কিন্তু হাত নাড়লো, পা নাড়লো, টেনে-টেনে ছিঁড়ে দিলো মায়ের শুকনো স্তন। গলার জোরে ফুসফুসের শক্তি প্রমাণিত করলো। ডাক্তার বললো, 'ভয় পাচ্ছেন কেন? এ-শিশু আপনাদের দীর্ঘায়ু হবে।' আর সত্যিই সুধাময়ীর সব আশঙ্কা দূর ক'রে দিয়ে দিনের পর দিন আদরে, যত্নে, তৈলমর্দনে কোলে-কোলে শশিকলার মতো বেড়ে উঠতে লাগলো মেয়ে। নাম রাখা হ'লো প্রমীলা।

ছ-মাসে ঘটা ক'রে মেয়ের মুখে ভাত দিলো যজ্ঞেশ্বর। এক-বছরের জন্মদিনে রাজ্যের লোক জড়ো হ'লো বাড়িতে। কোলে ক'রে সে সগৌরবে সকলকে দেখাতে লাগলো তার সুস্থ সবল সন্তান। এই

পিতৃত্ব কি ইচ্ছে করলেই সকলে ভোগ করতে পারে? সে-ই কি পেয়েছিলো এগারো বছর আগে?

ধীরে-ধীরে কোরকের পাপড়ি খুলতে লাগলো একটি-একটি ক'রে। একটি-একটি বছর বাড়তে লাগলো। ভয় কাটলো, বিশ্বাস এলো, নিশ্বাস ছেড়ে সুধাময়ী ভাবলেন, তা হ'লে ও রইলো? সত্যি রইলো?

৩

শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সতেরো বছরে পা দিলো প্রমীলা। বয়সের তুলনায় বলিষ্ঠ হ'লো বেশি, বুদ্ধি হ'লো কম, কিন্তু দাপট হ'লো প্রবল। এইবার খুব ভালো একটা সম্বন্ধ এলো তার। কী-এক অজানা ভয়ে কেঁপে উঠলেন সুধাময়ী।

এই ক'বছরে প্রায় বুড়ো হ'য়ে গেছেন তিনি। স্বামীর রাজত্বে যদি-বা কিছু স্বাধীনতা ছিলো মেয়ের রাজত্বে এসে একেবারে চোরেরও অধম। তবু, হাজার হোক সন্তান তো, ভালো তো বাসেন, ভালো-মন্দের কথা কিছুতেই না-ভেবে পারেননি। আর যতবার কিছু করতে গেছেন বা বলতে গেছেন ততবারই ধাক্কা খেয়েছেন জোরে। প্রমীলা লেখাপড়া শিখুক এটাই হ'লো তাঁর প্রথম যুদ্ধ। বলাই বাহুল্য, সেখানে তিনি সর্বতোভাবে হেরে গেলেন। লেখাপড়ায় প্রমীলার মাথা ছিলো না, প্রমীলার বাবাও সেটাকে খুব জরুরি কিছু ব'লে গণ্য করতেন না জীবনে। অতএব অনেক অশান্তি অনেক চোখের জলের অপব্যয় ক'রে বাল্যশিক্ষাতেই মেয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করতে হ'লো তাঁকে। তারপর সুধাময়ী মন দিলেন স্বভাব-সংশোধনে। শাসন করতে চাইলেন, বললেন, 'এ কি ভালো? এই আদর তো আদর নয়, শত্রুতা।'

যজ্ঞেশ্বর চোখ পাকালো, 'থামো, থামো। শিক্ষয়িত্রীগিরি রাখো তোমার। কেন, করেছে কি শুনি?'

'তুমি কি দেখতে পাও না? কী বিশ্রী স্বভাব হয়েছে। এই স্বভাবের জন্য ওর ত্রিসীমানায় একটা লোক ঘেঁষতে পারে? লোক দেখলেই ওর রাগ, বিরক্তি। একটা জিনিস কাউকে ছুঁতে দেবে না, কিছু দিতেই প্রাণে সয় না ওর। প্রত্যেকের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি হিংসুটেপনা। কাউকে ওর পছন্দ না, কিছুই ওর কাছে ভালো না।'

'সকলের সঙ্গে মেলামেশা আমিও পছন্দ করি না। কেন সব মরতে আসে আমার বাড়িতে। কেন মিশতে আসে আমার মেয়ের সঙ্গে?'

সুধাময়ী দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। এই তো, এই আশঙ্কাই তো তিনি করেছিলেন। তিনি তো জানতেনই এই-ই হবে তাঁর অদৃষ্টে শেষ পর্যন্ত। মেয়ে যে শুধু তার পিতার চেহারাটাই পেয়েছে তা তো নয়, চরিত্রটিও ঠিক ব্লটিংয়ের মতো শুষে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে পৃথিবীতে। ক্ষীণস্বরে বললেন, 'এ-ভাবেই কি জীবন যাবে? মেয়ে হ'য়ে জন্মেছে, বড়ো হচ্ছে, পরের ঘরে কি যেতে হবে না কোনোদিন?'

'পরের ঘর! পরের ঘরে কোন্ ব্যাটার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে আমার মেয়েকে কিছু বলবে? টাকা! টাকা! বুঝলে?' স্ত্রীর নাকের কাছে বুড়ো আঙুল নাচালো যজ্ঞেশ্বর, 'আমার টাকার অনেক জোর। আমার যে সবই ওর, তা কি কেউ জানবে না?'

'টাকাটাই কি সব? তাতেই কি সব অভাব পূরণ হয় মানুষের? মায়া, মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা! এর কি—'

স্বামীর এক ধমকে কেঁপে উঠে থেমে গেলেন— 'থিয়েটারের মেয়েদের মতো ভালোবাসা-ভালোবাসা কোরো না! ন্যাকামি!'

মেয়েও তারপর থেকে মা কিছু বললেই তাঁকে চড়ে-চাপড়ে অস্থির

ক'রে দিয়ে নেচে-কেঁদে পাড়া মাৎ ক'রে ছুটতো বাবার কাছে নালিশ জানাতে।

এই মেয়েকে তিনি কার ঘরে দেবেন? কার ঘাড়ে গছাবেন? ভাবতেই তাঁর প্রাণ কেমন ক'রে ওঠে। সম্বন্ধটা এনেছিলো যজ্ঞেশ্বরের এক দূর-সম্পর্কের বিধবা মামী। ঘটকালিই তার জীবনের প্রধান ব্রত, প্রধান পেশা। বরপক্ষও তার ভাইয়ের দেশের কুটুম্ব। যাতায়াত আছে, ঘনিষ্ঠতা আছে, কাজেই অসুবিধে হ'লো না কিছু।

তারপর পৌষ মাসের কোনো-এক দুর্জয় শীতের অকালবর্ষণ রাত্রির শেষভাগে অদৃষ্টের জোরে চমৎকার বিয়ে হ'য়ে গেল প্রমীলার। জন্মদিনের মতো সেদিন ঝড়ের দাপট ছিলো না, কিন্তু ভোররাত্রি থেকেই অবিরল বৃষ্টিতে পৃথিবীর কান্না যেন নেমে এসেছিলো সেই উৎসব-দিনে। কে আসবে আর? আর কী-ই বা ব্যবস্থা হবে। যজ্ঞেশ্বরের গোঁফের ফাঁকে হাসি চিকচিকোলো।

বেড়াল-ভেজা হ'য়ে সুনির্মল একা-একাই একমাত্র অভিভাবক তার পিতাকে সঙ্গে ক'রে এসে বিয়ের পিঁড়িতে বসলো।

যজ্ঞেশ্বর যত খুশীই হোক, প্রমীলার মা-র আরেকটি আকাঙ্ক্ষায় ছাই পড়লো। জামাইয়ের অনিন্দ্যসুন্দর (অন্তত তাঁর চোখে তাই লেগেছিলো) তরুণ মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ ভ'রে জল এলো তাঁর।

এমন চমৎকার ঘরে-বরে বিয়ে হ'লো মেয়ের অথচ একটি পয়সা খরচ হ'লো না, এ-কথা যত বার ভাবলো যজ্ঞেশ্বর তত বার সে নতুন ক'রে মেয়েকে আরো বেশি ভালোবাসলো। সুনির্মলের বাবা পণ নেননি ছেলের বিয়েতে। মেয়ে দিচ্ছেন ভদ্রলোক, তার চেয়ে বেশি মূল্যবান আর কোন জিনিস তিনি আনতে পারেন নিজের ঘরে? যজ্ঞেশ্বরের মামী বলেছিলেন, বড়োলোকের মেয়ে, রাগ-চাপ দিলে রাজেনবাবু ভালো

হাতেই পেতে পারেন কিছু। ছেলে তো তাঁর কম উপযুক্ত নয়? এম্. এস-সি পাস, ভালো চাকরি পেয়েছে, বয়স অল্প, চেহারা সুন্দর, নন্দ-গ্রামের বিখ্যাত কুলীন, বাপ পদস্থ চাকুরে, ঠাকুরদারও যা-হোক-কিছু আছে তো দেশে-গাঁয়ে—কোন দিকে খাটো? ভদ্রমহিলা আসলে বানরের পিঠে ভাগের পার্টটা নিয়েছিলেন। এ-পক্ষ ও-পক্ষ দু-পক্ষ থেকেই তা হ'লে মোটাসোটা জোটে কিছু। রাজেনবাবু জিব কাটলেন। বেশ তো, ওঁর যদি টাকা থেকেই থাকে সে তো খুব ভালো কথা। বড়ো ঘরের মেয়ে হওয়াই তো বাঞ্ছনীয়। সচ্ছলতার মধ্যে বড়ো হ'লে মন উদার হয়, মেজাজ ভালো হয়, কিন্তু সে-টাকায় তাঁর দরকার কী? তাঁর তো কোনো অভাব নেই। এবার মামী গয়নার কথা পাড়লেন। গয়নার তিনি কী বোঝেন। হিরণ্ময়ীর সঙ্গেই বরং সে-বিষয়ে কথা হোক। হিরণ্ময়ী হাসলেন। ছেলে বিয়ে দিচ্ছি ব'লে কি মাথা কিনছি নাকি ভদ্রলোকের? না, না, ও-সব কিছু কড়াক্কর নেই আমাদের। তাঁর মেয়ে, তাঁর যা খুশি তাই দেবেন। আমাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে, ব্যস্। এর উপরে আর কথা কী? বাসনকোসন, আসবাবপত্র সব-সম্বন্ধেই তাঁদের ঐ এক কথা। সবেতেই তাঁদের সংকোচ। যজ্ঞেশ্বরের মামী ভাগ্নের কাছে গিয়ে একেবারে আছড়ে পড়লেন, 'দেখলে? দেখলে তো কী সম্বন্ধ ক'রে দিলাম তোমার মেয়ের? একটি কড়ি খসাতে হ'লো না।' তারপর একটু ঠাট্টা করলেন নাতনির থুত্নি ধ'রে, 'ভালো ক'রে ঘটক বিদায় দিস লো, কেমন টুকটুকে বর এনে দিলাম।' প্রমীলা ভ্রুকুটি দেখিয়ে একটা ঝাপটা মেরে স'রে গেল দরজার ধারে।

বরপক্ষ নিজে থেকেই যখন কিছু চাইছে না, তখন আবার দেয় কেমন ক'রে? ও-সব সাধাসাধি ভালোবাসে না যজ্ঞেশ্বর। তাই যা

নেহাত না দিলে নয়, যেমন একসেট বিছানা, একটা ছাতা, একটা লাঠি, একটা সরু সুতোর নালের মতো আংটি, এই রকম কয়েকটা দানসামগ্রী দিয়েই সব ল্যাঠা চুকোলো। ঈশ্বর দয়া করলেন, বৃষ্টি নামলো, আলো নিবলো, উনুন গললো, পৃথিবী ঠাণ্ডা হ'লো, প্রাণ ঠাণ্ডা হ'লো। যৎ-সামান্য যা-কিছু আয়োজন করেছিলো সেই রাত্রে তা তেমনি প'ড়ে থেকে পরের দিন বাসি-বিয়ের খরচ চালালো। রাত দুটো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে-সব বিয়ের রাত্রে নিজেই ভালো ক'রে গরম-টরম করিয়ে রেখেছিলো। বাসি ভাত বৈবাহিকের পাতে তুলে দিতে পরের দিন আপত্তি করেছিলো ব'লে স্ত্রীকে কেবলমাত্র ধাতানিই দিলো না, ঝাঁকানিও দিলো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্বশুরবাড়ি এসে হকচকিয়ে গেল প্রমীলা। এত ভিড় আর কবে দেখেছে সে? একসঙ্গে এতগুলো লোক, এত গোলমাল সে ভাবতেও পারে না। তিনটি সন্তান বিসর্জন দিয়েও যজ্ঞেশ্বরের রক্ত এতটা পরিস্রুত হয়নি, যাতে ক'রে একটি স্বাভাবিক সুস্থ সন্তান সে আনতে পারে সংসারে। প্রমীলা যে শুধুমাত্র হিংসুক, লোভী বা স্বার্থপরই ছিলো, তাই নয়, কিছুটা নির্বোধও ছিলো। বাড়িতে আবদার, অত্যাচার করতো বটে, কিন্তু কথাবার্তা বলতো কম। বলতে জানতো না। আর তার সঙ্গীই বা ছিলো কে? সারা-বাড়িতে এক পিস্তুতো ভাই রাখাল, বছর দুয়েকের ছোটো তার চাইতে, তাকে সে দু-চক্ষে দেখতে পারতো না। সে যে তাদের বাড়িতে আছে, তার বাবারটা খাচ্ছে এ নিয়ে একটা অসহ্য গাত্রদাহ ছিলো। যজ্ঞেশ্বরের বিধবা বোন মৃত্যুর সময় এই ছেলেটিকে দশ বছরের ক'রে তার মামার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন আর সেই সঙ্গে ছত্রিশ ভরি সোনা। গায়ের চাকা-চাকা গয়না সব। তেজীয়ান ছেলে, মামা তাড়িয়ে দিতে চাইলেই সেই গয়নার বাক্স ফিরে চায়। সে কি ভাখেনি? দশ বছর বয়েস কি খুব কম? হাজার ঠেলাঠেলিতেও সে নড়ে না এখান থেকে। খায়-দায় ইস্কুলে যায়, বছর-বছর লাফিয়ে ওঠে ক্লাসে। চুপি-চুপি মামীর বুকে মাথা ঠেকিয়ে মায়ের আদর ভোগ করে। মামী ভাবে এই রাখালটাই আমার জীবনের একফোঁটা আলো।

সেই প্রমীলা এই বাড়িতে এত আত্মীয়ের বহর দেখে— অসংখ্য দেওর, ননদ, জা, মাসী, পিসী, খুড়ী, জেঠীর ছড়াছড়ি দেখে যদি না থমকায় তো থমকাবে কে? দু-দিনের মধ্যে আর মুখ দিয়ে তার একটি

শব্দ বেরুলো না। একমাত্র ছেলে না-হ'লেও প্রথম ছেলে তো। প্রথম সাধ, প্রথম আহ্লাদ। তা ছাড়া, পাঁচটি ছেলেমেয়ের মধ্যে এই-ই সবচেয়ে বড়ো সন্তান হিরণ্ময়ীর। প্রচুর আড়ম্বর করলেন তিনি। চারদিক থেকে স্রোতের মতো লোকজন এসে বাড়ি ভ'রে ফেললো। স্বস্থ কি তাঁর একলার? পিসিদের না? কাকাদের না? মামী-মাসীরা কি কেউ নয়? লতা ধ'রে-ধ'রে তিনি আঁকশি বাড়ালেন। লোকজনই তো লক্ষ্মী। লোকজন না-হ'লে কি উৎসব হয়, আনন্দ হয়? তবু তো এ-সব উপলক্ষ ক'রে দেখা হয় কতো আপনজনের সঙ্গে, অতীতের কতো মনের মানুষের সঙ্গে। মস্ত বাড়ি ভাড়া নিয়ে, মস্ত গাড়ি দরজায় দাঁড় করিয়ে আলোয়, গানে, সুগন্ধে, সুখাদ্যে, ঝলমল শাড়িতে গয়নাতে একেবারে ইন্দ্রপুরীর আনন্দ নামিয়ে আনলেন তিনি। খুশী হ'য়ে রাজেনবাবু দু-হাতে টাকা খরচ করলেন। হালচাল দেখে মেয়ের মতো যজ্ঞেশ্বরও মনে-মনে অবাক হ'লো বৈকি। বুকটা কড়কড় করলো তার। এক রাত্রির জন্য একটা ফুঁয়ে মানুষ নাকি এমন ক'রে টাকা উড়োয়! ফুল, ফুল, ফুলই বা কতো! কী হবে এত ফুল দিয়ে? এ কি থাকবে? এ তো শুকোলো ব'লে। কতো আলো জ্বলছে মুহুর্মুহুঃ, কতো বিল উঠছে কে জানে। আর খাচ্ছে কতো লোক। শহরের লোক কি এরা বাকি রাখেনি?

অনেক রাত্রে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে যখন দেখা করতে এলো মেয়ের সঙ্গে, বাবার কাঁধে মাথা রেখে ভয়চকিত চোখে প্রমীলা বললো, 'বাবা, আমি যাবো।'

যজ্ঞেশ্বর বললো, 'যাবি-ই তো। আজ রাতটা থাক্। আজ তো ফুলশয্যা, আমি কাল সকালেই আবার আসবো।' প্রমীলা প্রবোধ মানলো না, নির্বোধ চোখে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। চোখ মুছলো

যজ্ঞেশ্বরও। মনে-মনে ভাবলো, কী দরকার ছিলো মেয়েটাকে পরের ঘরে পাঠাবার, ঘরজামাই রাখাই উচিত ছিলো তার।

বাপ চ'লে গেলে সেই যে প্রমীলা সুর ক'রে কাঁদতে আরম্ভ করলো কিছুতেই থামানো গেল না তাকে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে হিরণ্ময়ী নিভৃতে ডেকে নিয়ে অনেক বোঝালেন, বাড়ি-ভর্তি আত্মীয়-কুটুম্ব, বলবে কী তা'রা, একটা তো রাত, আবার কাল বিকেলেই তো যাবে, সকালেই তো তোমার বাবা আসবেন। কিছুতেই কিছু হ'লো না। শুভরাত্রির সব স্ফূর্তি, সব প্ল্যান ভিজিয়ে সে কাদা ক'রে দিলো। ঘর ভালো, বর ভালো, কত্তো কথা সে শুনেছে এ-ক'দিন ধ'রে, এরই নাম বর— এই তার ঘর ? পারলে প্রমীলা সব ছেড়ে-ছুড়ে একছুটে চ'লে যেত দমদম; যাবার জন্য তার অদম্য ইচ্ছেও হয় কিন্তু রাস্তা সে চেনে না, তা ছাড়া, এ লোক-গুলোকে কেমন জানি ভয়-ভয় করে।

সুনির্মল শুতে এসে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো স্ত্রীর দিকে। কালকে বৃষ্টিতে ভিজে তার শরীর খারাপ হয়েছিলো, মাথা ধরেছিলো, চুপচাপ হাত-পা ছড়িয়ে আরাম ক'রে শুলো সে, 'উঃ, আঃ' করলো একটু, হয়তো কোনো প্রতীক্ষা, কোনো অপেক্ষা। জেগে রইলো খানিকক্ষণ, তারপর পাশ ফিরলো। আর তার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে প্রমীলা একটা হিংস্র ক্ষোভ অনুভব করলো মনের মধ্যে, এই তো, এই লোকটাই তো তার যত দুঃখের মূল। এই সর্বনাশা লোকটাই কাল তাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে এসেছে এই বাড়িতে, এই বিশ্রী লোকগুলোর মধ্যে।

২

প্রমীলা যে ঠিক সংসারের আর-পাঁচজন মানুষের মতো নয় এ-কথা অনুভব করতে খুব দেরি হ'লো না সুনির্মলের। সে বুঝলো, এই হৃষ্টপুষ্ট,

মোটাসোটা ফর্সা গোলগাল মেয়েটির কোনো হৃদয়ের বালাই নেই, মনের বালাই নেই, বুদ্ধিরও বালাই নেই। বুঝলেন হিরণ্ময়ীও। ছেলের চোখে-চোখে তাকিয়ে তাঁর বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটলো। দাঁতে দাঁত চাপলেন, কয়েক রাত ঘুমুলেন না, তারপর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যত তাড়াতাড়ি পারেন ভিড় মিটিয়ে দিলেন বাড়ির। ঝপ্ ক'রে একটা অন্ধকার ঝুলে পড়লো বাড়িতে কালো ছায়ার মতো।

সুনির্মলের মত ছিলো না এই বিয়েতে। হিরণ্ময়ীও যে একজন মস্ত উৎসাহী ছিলেন তা নয়। বরং যজ্ঞেশ্বরের মামী যখন প্রস্তাবটা নিয়ে এলেন, হেসেছিলেন, ওমা এখুনি বিয়ে কী, আজকালকার দিনে আবার এ-বয়েসে বিয়ে করে নাকি কোনো ছেলে? সুনির্মলের বাবা রাজেনবাবু সবে ফিরে এসেছেন আপিস থেকে, গলার টাইটা খুলতে-খুলতে উৎসুক চোখে তাকালেন, 'মেয়েটি কেমন?'

'তোমার যে খুব গরজ?' ঠাট্টা করলেন হিরণ্ময়ী। রাজেনবাবুর মতো সব বিষয়ে উদাসীন অন্যমনস্ক মানুষের পক্ষে এ-প্রশ্নটা একটু আশ্চর্যই মনে হয়েছিলো তাঁর। একটু হেসে জামা খুলে আরাম ক'রে ইজিচেয়ারে ব'সে স্ত্রীকে তিনি আরো আশ্চর্য ক'রে দিলেন, 'দেখেছেন নাকি আপনি? মনোমতো হয়তো দেখুন-না চেষ্টা ক'রে। শুনে-টুনে তো ভালোই মনে হচ্ছে।'

কোনো ব্যাপারেই সংসারে যার কোনো হস্তক্ষেপ নেই, উচ্ছ্বাস নেই, উৎসাহ নেই, হঠাৎ সেই মানুষটি যে ছেলের বিয়ে নিয়ে কেন এমন মেতে উঠলেন কে জানে। কী জানি কেন, একটি পুত্রবধূর আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে বাসা বেঁধেছিলো কিছুদিন থেকেই। এবার জ্ব'লে উঠলো ইন্ধন পেয়ে। ভেবে পেলেন না হিরণ্ময়ীও কেন তাঁরই মতো উৎসুক হ'য়ে উঠছেন না

এ-ব্যাপারটা নিয়ে। কম বয়েস, এটা কি একটা যুক্তি? এই তো সবচেয়ে সুন্দর সময়। বিয়ে করবার পক্ষে এর চেয়ে ভালো সময় আর আছে নাকি মানুষের জীবনে? তিনি নিজে তো এর চেয়েও কম বয়সে বিয়ে করেছিলেন। হিরণ্ময়ী কি ভুলে গেছে সে-কথা? সে-সময়কার যত মধুরতা, যত রোমাঞ্চ, এখনো আঙুরের রসের মতো টলটলে হ'য়ে জ'মে আছে বুকের মধ্যে। তার কি কোনো তুলনা আছে? হিরণ্ময়ী কি চান না তাঁর ছেলের জীবনেও সেই সুখ নেমে আসুক অতল হ'য়ে। তিনি কি চান না সুনির্মলও তেমনি ক'রে পার হ'য়ে আসুক সেই সব দরজা, সেই সব সময়? সন্তানের হৃদয় তো পিতার চাইতে মায়েরই ভালো ক'রে বোঝা উচিত। নতুন বৌ পৃথিবীর সব নির্যাস, সব আনন্দ নিয়ে ঘুরে বেড়াক এই বাড়িতে, এই ঘরে, নিটোল হ'য়ে পূর্ণ হ'য়ে উঠুক তাঁর ছেলের জীবন। মন যদি ভরা থাকে তা হ'লে ওর আরো কতো উৎসাহ হবে কাজেকর্মে, বেঁচে থাকায়।

মনে পড়লো সুনির্মলের যখন বাইশ বছর বয়েস, তখন রাজেনবাবুরই একটি বন্ধুকন্যার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছিলো। দেখে-শুনে মনে-মনে তিনি তখনই স্থির করেছিলেন পরীক্ষা হ'য়ে গেলে এই মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দেবেন ছেলের। কিন্তু টাইফয়েড হ'য়ে হঠাৎ মারা গেল মেয়েটি। সুনির্মল বিচলিত হয়েছিলো। পরীক্ষায় ভালো করতে পারেনি। রাজেন-বাবুর মনে এখনো এই ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে আছে যে সেই তিন বছর আগের দুঃখের স্মৃতিটি একটি বেদনার বিন্দু হ'য়ে এখনো লেগে আছে তাঁর ছেলের বুকের মধ্যে। বিয়েতে যে তার আপত্তি তাও ঐ একই কারণে। হিরণ্ময়ী তো সবই জানেন। একজন মেয়ের সাহচর্য ছাড়া কি সেই দুঃখ আর-কিছু মুছে দিতে পারে? অবিশ্যি সমস্ত ধারণাই তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে গড়া। সেই ধারণার উপর ভিত্তি ক'রেই

তিনি ছেলের অমতকে একটা খুব-কিছু গুরুতর কারণ হিসেবে গণ্য করলেন না। আর তাঁর ইচ্ছার এই প্রবলতা দেখে সুনির্মলও বলতে পারলো না কিছু। বাবা আর কবে কী বলেছেন তাকে? কী চেয়েছেন? পেয়েছে ছাড়া এতটুকুও তো দিতে হয়নি জীবনে। তবে কেন এই সরলচিত্ত ভালোমানুষটিকে নিরাশ করা। বিয়ে যে সে সারা-জীবনেও করবে না এমন প্রতিজ্ঞা তো তার নেই। তবে হোক না, এখনই হোক না, এখানেই হোক না। সুকৌশলী হিরণ্ময়ীও তাই বললেন। তা ছাড়া, যজ্ঞেশ্বরের মামী তার বাক্‌জালে মেয়ের রূপলাবণ্য এবং গুণপনা সম্বন্ধে এমন একটি সুষমা রচনা করলেন সকলের মনে যে, শেষ পর্যন্ত হিরণ্ময়ী রাজেনবাবুর চাইতেও বেশি উদ্যোগী হ'য়ে কাজে হাত দিলেন।

সুনির্মল মুখ ভার ক'রেই রইলো শেষ পর্যন্ত। বৃষ্টিতে ভিজে ভারি মুখেই বিয়ে ক'রে এলো। বৌ নিয়ে এসে সেই মুখে অভিমানের সঙ্গে একটি দুঃখের ছায়াও পড়লো ঘন হ'য়ে।

হিরণ্ময়ী নিজেকে ধিক্কার দিলেন। একটু অবহেলা হয়েছে বৈকি। যজ্ঞেশ্বরের মামীর কথায় কেন অত বিশ্বাস করেছিলেন তিনি? তিনি নিজে কেন গেলেন না দেখতে? একটা ভাত টিপলেই তো এক-হাঁড়ির ভাত বুঝে নিতে পারতেন। আর এই মেয়েকে! রাজেনবাবু দেখেছেন। তাঁর চোখের দেখার কতোটুকু মূল্য। যে-রকম লাজুক মানুষ, কথা তো একটাও বলেননি, নামটা পর্যন্ত জিগ্যেস করেননি। হাত ধ'রে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে এসেছে, কটা রং দেখেই ভুলে গেছেন তিনি, আবার হাত ধ'রে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে মেয়ে। যে-মানুষকে বুঝতে একটা পলকও খরচ করতে হ'তো না, সেইখানে এত বড়ো একটা ভুল তিনি কেমন ক'রে করলেন? এত বড়ো একটা ব্যাপারে কী ক'রে এত বড়ো একটা

ফাঁক রাখলেন! সংসারের সব বিষয়ে তিনিই কর্ত্রী, তাঁর পায়ের পাতায় ভর ক'রেই এতগুলো মানুষের পা চলে, এ-সংসারে তাঁর বুদ্ধিই চরম। ছেলেদের শিক্ষা-দীক্ষা, খাওয়া-পরা, স্বামীর সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধা, আত্মীয়-পরিজনের খোঁজ নেওয়া, খবর নেওয়া, আদর-আপ্যায়ন, ভদ্রতা-অভদ্রতা, সামাজিকতা, লৌকিকতা কী তিনিই করেন না? কী তিনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে নির্ভর করেন স্বামীর উপর? রাজেনবাবু উপার্জন ক'রেই খালাস, সুনির্মল এত বড়ো হ'লো, এখনো সে মা ছাড়া দিশে পায় না কিছু, আর এত বড়ো একটা বিষয়ে চোখ বুজে রইলেন তিনি। একা ঘরে কপালে করাঘাত করলেন, চিন্তা করলেন, মন-খারাপ ক'রে ঘুরে বেড়ালেন চোরের মতো, তারপর উপায় স্থির ক'রে আবার কোমর বেঁধে উঠে-প'ড়ে লাগলেন সেই ভুল সংশোধনের প্রায়শ্চিত্তে।

কিন্তু মুস্কিল হ'লো প্রমীলাকে নিয়েই। সে কিছুতেই থাকতে চায় না এখানে। তার ভালো লাগে না এখানে। যে-ক'দিন থাকে কথা বলে না কারো সঙ্গে, নিজের ঘরে নিজের মনে ব'সে থাকে চুপচাপ। দেবররা, ননদরা সাধাসাধি করে, টানাটানি করে, নিয়ে যায় বেড়াতে, নিয়ে যায় সিনেমায়, হৈ-হল্লা ক'রে আয়োজন করে ভোজের, প্রমীলা একেবারে নিঃসাড় পাষাণ। রাত্রে ফোঁস্‌ফোঁস্ ক'রে কাঁদে স্বামীর কাছে— 'আমি দমদম যাবো।'

'এখানে ভালো লাগে না?'

'না।'

'কেন?'

'ওরা আমাকে সারাদিন বিরক্ত করে।'

'কারা?'

'তোমার ভাই-বোন মা সবাই।'

সুনির্মল চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে সিলিঙ-এর দিকে।

প্রমীলা বলে, 'তুমি ওদের সঙ্গে থাকো কেন?'

'কাদের সঙ্গে?'

'এদের সঙ্গে?'

'তবে কোথায় থাকবো?'

'দমদম।'

'দমদম কি আমার বাড়ি?'

'বাবা বলেছেন সেখানে থাকলে তোমাকে বিনা ভাড়ায় দুটো ঘর ছেড়ে দেবেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আরো বলেছেন—'

'কী?'

'ইচ্ছে করলে বাবার দপ্তরে বসতে পারো হিসেব-নিকেশের জন্য! বাবা কি এত বড়ো ব্যবসা একা সামলাতে পারেন? সেজন্য তোমাকে মাইনে দেবেন তিনি।'

'বাঃ, চমৎকার কাজ তো! কিন্তু উনি তো কনট্র্যাক্টরিই করেন, আর কিসের ব্যবসা?'

প্রমীলার মুখে উৎসাহের বন্যা নামে। কে বলবে এই মানুষ সারাদিন কথা বলে না কারো সঙ্গে। তিনবার জিগ্যেস করলে একবার জবাব দেয়। শোয়া থেকে উঠে বসে বেগে, একটু আগে যে কেঁদেছে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে তার চিহ্নমাত্র থাকে না কোথাও। চোখ টান ক'রে হাতের আঙুলে গুনে-গুনে ব্যবসার ফিরিস্তি দেয়— তিনটে লরি খাটে সারাদিন, এতগুলো বাড়ি ভাড়া, বস্তির খাজনা আদায়, লগ্নি কারবারের সুদ আর জমার খাতা ঘাঁটতে হয় রোজ, সকাল থেকে কতো লোক যে আসে—

হঠাৎ চোখের দৃষ্টি লোভে বড়ো-বড়ো হ'য়ে ওঠে, 'সে-বার মনার মা করলো কী জানো? গলার সাতনরি হার বাঁধা রেখে মাত্র পঞ্চাশ টাকা নিলো। তিন মাসের মধ্যে খালাস করবার কথা ছিলো, এলো তিন মাস পুরে যাবার দু-দিন পরে, আর কি আমরা সে-মাল ছাড়ি? মাগির কী কান্না, কী কান্না।' এখানে হাসলো প্রমীলা। 'তারপর সেই, সেই গদাধর বাঁড়ুয্যের তিন বিয়ের বৌটা, সোঁয়ামীটা তো ষাট বছরের ঘাটের মড়া, আর বৌটা একটা ছুঁড়ি। আগ-পক্ষের ঢেঁকি-ঢেঁকি ছেলে-মেয়েতে ঘর ঠাসা, টাকাও তেমনি। বৌটার স্বভাবচরিত্র মোটে সুবিধের ছিলো না, বাঁড়ুয্যেবাবুর যখন শ্বাস উঠলো ছুটে এলো বাবার কাছে, শেমিজের বুকে তাড়া-তাড়া নোট—'

গলা খাটো ক'রে, স্বামীর মুখের কাছে একটু এগিয়ে, 'আমি সব জানি, বুঝলে? সব বুঝি। তোমরাই খালি আমাকে বোকা ভাবো, আমার বাবা তা বলেন না কখনো। এই তো বিয়ের মাত্র আট মাস আগের কথা, দরজার ধারে দাঁড়িয়ে দেখি কী, বাবা খপ্ ক'রে ওর শেমিজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে তুলে নিলেন নোটগুলো। তুমি স্বামী, তোমাকে বলতে তো বাধা নেই,' একেবারে ফিস্‌ফিসিয়ে—'বাবার সঙ্গেই ওর ভাব ছিলো।'

সুনির্মল মুখে হাত-চাপা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো, তার গা গুলোচ্ছে, সোজা ছাতে উঠে গিয়ে মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়ে নিজেকে সুস্থ না-করতে পারলে সারারাত আর ঘুম হবে না তার।

এই উৎসাহ অবিশ্যি প্রত্যেক রাতের নয় প্রমীলার, কেননা উৎসাহিত হবার ইন্ধন সে একেবারেই পায় না। যেটা তার বিষয়, যে-বিষয়ে সত্যিই তার বলবার মতো কথা মনের মধ্যে কিছু জমা আছে, মাথার মধ্যে বুদ্ধিও আছে, কিন্তু এ-বাড়ির কারোরই সে-বিষয়ে আগ্রহ নেই। এ-বাড়িতে

সব-কিছুরই কেবল বাজে খরচ। সেটা টাকাই হোক আর কথাই হোক। এরা এত-এত রান্না করে, সকালবেলা টেবিলে ব'সে দুধ, ডিম, রুটি, মাখন থেকে আরম্ভ ক'রে রাত্তির পর্যন্ত এত খায় যে দেখে দস্তুরমতো গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে প্রমীলার। চাকরবাকরদের সঙ্গে শাশুড়ীর আদুরেপনা দেখে তার সতেরো বছরের নরম শরীর গরম হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কী করবে? কী বলবে? এটা কি তার বাবার বাড়ি? বাবার বাড়িতে তার মা-র সাধ্য ছিলো এ-ভাবে অপব্যয় করে? এমন স্বাধীনভাবে অসভ্যতা করে? তারা বাপে-মেয়েতে খুন বাধিয়ে দিতো না? কিন্তু এ যে হিরণ্ময়ী। এ যে হিরণ্ময়ীর সংসার। এই হিরণ্ময়ীকে সে যে বাঘের চেয়েও বেশি ভয় করে।

না, স্বামীও তার মানুষ না। বাবা বলেছেন, 'জামাইটা একটা হাঁদাকান্ত, তা নইলে এতগুলো মাইনের টাকা তক্ষুনি ব্যাঙ্কে জমা না দিয়ে কিংবা নিজের বিয়ে-করা বৌ-এর হাতে না দিয়ে মা-র হাতে এনে দেয়? খায় তো বাপের হোটেলে। রাজেনবাবু কি যথেষ্ট রোজগার করেন না? প্রমীলাও বোঝে সব-কথা। বিয়ের এই ন-মাসে দু-এক মাস যা থেকেছে, দেখেছে তো সব। বুঝেছে তো সব। যজ্ঞেশ্বরবাবুও তো আসেন, দেখেন, বুদ্ধি দেন মেয়েকে। মাইনে পেয়ে একবার মোটা ব্যাগটা সুনির্মল রাখতে দিয়েছিলো তাকে, হিরণ্ময়ী বাড়ি ছিলেন না। বলেছিলো, মা এলে তাঁর হাতে দিয়ে দিয়ো। পাঁচদিন পর্যন্ত প্রাণে ধ'রে দিতে পারেনি প্রমীলা। যেদিন হিরণ্ময়ী চেয়ে নিলেন দাঁতে দাঁত চেপে ছিলো সে।

তাই এ-বাড়ির কিচ্ছু তার ভালো লাগে না। এ-বাড়িতে দম বন্ধ হ'য়ে আসে, লোকগুলোর মুখের দিকে তাকালে রাগ হয়। এদের সঙ্গে কী বলবে? কী করবে? এরা তাকে বোঝে না, সেও তাদের বোঝে না। একসঙ্গে একমাসও টিঁকতে পারে না সে এখানে। বাপকে খবর পাঠিয়ে আনিয়ে চ'লে যায় বারে-বারে।

৩

এতদিন এ-বিষয়ে প্রতিবন্ধক হয়নি, হিরণ্ময়ী অনেক সময় বিরক্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু কিছু বলতে পারেননি, হয়তো এজন্যেই পাছে একটা শাশুড়ীপনার মতো দেখায় ব্যাপারটা। এবার শক্ত হ'লেন। দু-মাস পরে এসে, পনেরো দিন যেতে-না-যেতেই মেয়েকে নিতে এলে তিনি ফিরিয়ে দিলেন যজ্ঞেশ্বরকে। প্রমীলা কাঁদলো, জেদ্ করলো, নেমে এলো রাস্তা পর্যন্ত, যজ্ঞেশ্বরের রাগ বোঝা গেল চোখের দৃষ্টিতে, হিরণ্ময়ীর 'না' তবু 'হাঁ'-তে গললো না। না, আর দেরি নয়, সময় নষ্ট ক'রে আর লাভ নেই। যথেষ্ট! যথেষ্ট ভুল হ'য়ে গেছে, যথেষ্ট অন্যায় হ'য়ে গেছে, আর নয়।

'শোনো।' গুরুগম্ভীর গলায় তিনি ডাকলেন পুত্রবধূকে।

অশ্রুসিক্ত চোখে শাশুড়ীর কঠিন মুখের দিকে তাকালো প্রমীলা।

'ও-রকম কাঁদো কেন বাপেরবাড়ি যাবার জন্যে? বিয়ে হ'লে কি মেয়েরা অমন ক'রে রোজ-রোজ বাপেরবাড়ি যায়? আর এখান থেকে এখানে যাবে, চ'লে আসবে। তা তো নয়, গেলে তিন মাসের আগে তুমি এসেছো কখনো?'

উচ্ছ্বসিত শোকে প্রায় শব্দ ক'রে কেঁদে উঠলো পুত্রবধূ। হিরণ্ময়ীর টানা ভুরু কুঁচ্‌কোলো। এ কী অদ্ভুত।

'ন-মাস হ'য়ে গেল তোমার বিয়ে হয়েছে, তার মধ্যে ক'দিন তুমি এ-বাড়িতে থেকেছো বলো দেখি? এটাই তো তোমার বাড়ি, এই ছেলে-মেয়েরাই তোমার ভাই-বোন, আর অমন স্বামী যার তার মন এমন উড়ু-উড়ুই বা হয় কেমন ক'রে? না, এখন থেকে তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

'এখানেই?'

'হ্যাঁ, এখানেই।'

প্রমীলার কান্না প্রায় রোদনে পৌঁছলো।

পৌঁছুক। আর নরম হ'লে চলে না। রাগ বিরক্তিকেও তিনি মুছে ফেলতে চেষ্টা করলেন মন থেকে। তা হ'লে তো নিজের থুতু নিজের মুখেই এসে পড়বে।

বৌকে নিয়ে তিনি বেড়াতে যেতে লাগলেন এখানে-ওখানে, মনে করলেন নানা লোকের সংস্পর্শে যদি-বা ওর ঘুমন্ত মন হঠাৎ সজাগ হ'য়ে ওঠে, পাঁচজনকে একরকম দেখতে-দেখতে যদি-বা হঠাৎ ও বুঝে ফেলে নিজেকে, নিজের ত্রুটিকে। বই কিনতে লাগলেন বিজ্ঞাপন দেখে-দেখে, মাসিক-পত্রিকার গ্রাহক ক'রে দিলেন, অন্যান্য নতুন বিবাহিত মেয়েদের ডেকে এনে ভিড় বাড়ালেন বাড়িতে, অকারণে ঘন-ঘন নিমন্ত্রণ খাইয়ে মাসের শেষে সংসারে টান ফেলতে লাগলেন, কিন্তু প্রমীলার কোনো পরিবর্তন হ'লো না। কেবল এ-বাড়ির হাওয়া আরো অসহ্য, আরো বিষ হ'য়ে উঠলো তার কাছে। শাশুড়ীকে সে আরো বেশি ভয় করতে লাগলো, সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল বিতৃষ্ণা। স্বামীকে একটা মস্ত আপদ ছাড়া আর-কিছু ভাবতে পারলো না। একটা অসহায় ক্রোধ ভেতরে-ভেতরে ক্ষিপ্ত করলো তাকে।

স্থনির্মলের অনাবিল সুখে-ভরা সুন্দর জীবনটা সহসা যেন একটা ফাটা-বেলুনের মতো চুপসে গেল, সব হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে শূন্য হ'য়ে গেল। চারটি ভাই-বোন আর মা-বাবার আনন্দমুখর সংসার নিঃশব্দ হ'য়ে গেল কী-এক অজানা আশঙ্কায়। দাদার মুখ গম্ভীর, মা-র মুখ গম্ভীর, বাবার চিরসহাস্য মুখে চিন্তার রেখা, তবে আর কা'কে নিয়ে নাবালক আর-তিনটি ছেলে-মেয়ে আসর জমাবে? দু-জন মানুষ— যাদের যুগল-জীবনের মাধুর্য ছড়িয়ে পড়বে আকাশে-বাতাসে, আনাচে-কানাচে, মনে-প্রাণে সবখানে, যাদের সুখ সংক্রমিত হ'য়ে অন্যকেও দুঃখ ভুলিয়ে দেবে,

পারস্পরিক অস্তিত্ব হবে যাদের কাছে অপরিহার্য— ভালোবাসার অতল প্রশান্তিতে যাদের আকণ্ঠ নিমগ্ন হ'য়ে থাকা উচিত, তাদের মধ্যে যদি সান্নিধ্যটাই এত অসহ্য হ'য়ে ওঠে তবে তার চেয়ে মর্মান্তিক আর কী হ'তে পারে? মা-র কাছে এসে বসলো সুনির্মল— 'তুমি মনে-মনে কী ঠিক করেছো?'

'কী?'

'ওকে দমদম যেতে দিচ্ছো না কেন?'

মা বুঝতে পারলেন না কী বলতে চায় ছেলে, তাকিয়ে রইলেন মুখের দিকে।

'প্রত্যেক দিন কান্নাকাটি আমি সহ্য করতে পারবো না, হয় তুমি ওকে যেতে দাও, নয় আমাকে ছেড়ে দাও, হস্টেলে-ফস্টেলে যেখানে হয় চ'লে যাই।'

অপরাধী হ'য়ে মাথা নিচু ক'রে রইলেন মা। একটু পরে বললেন, 'এ তো ফেলে দেবার জিনিস নয় বাবা, মায়া-মমতা বসাতে হবে তো? ও না-হয় নির্বোধ—'

'তা হ'লে তুমি মায়া-মমতা বসাও, আমাকে রেহাই দাও।' রাগ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুনির্মল।

•

কিন্তু রাগ করুক আর যা-ই করুক, ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে তো আর বৌকে ত্যাগ করতে পারবে না! সেবারকার মতো প্রমীলাকে আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে বাপেরবাড়ি যেতে দিলেও এবং থাকতে দিলেও এক-সময় তার নিজেরই মনে হ'লো ঘর তো এই মানুষের সঙ্গেই বাঁধা হ'য়ে গেছে, যে ক'রে হোক এই মানুষটাকেই তো সহ্য করতে হবে জীবন ভ'রে, কাজেই একেই চেষ্টা-চরিত্র ক'রে যেমন ক'রে হোক একটা মনুষ্য-পদবাচ্যে তো আনতে

হবে? এবার মা-র সঙ্গে সহযোগিতা করলো সে। মনকে অদম্য হতাশা থেকে টেনে তুললো জোর ক'রে। রাগ থেকে দুঃখ থেকে নিজেকে সংযত করলো প্রাণপণ শক্তিতে, তারপর চললো গবেষণা। গবেষণাই তো! তা ছাড়া আর কী? কী ভাবে বললে, কী ভাবে চললে, কোন্ ভাবে আরম্ভ করলে প্রমীলার হৃদয়ের ঠিক আসল জায়গায় গিয়ে পৌঁছানো যায় তারই তো অবিশ্রান্ত চেষ্টা আর চিন্তা। হিরণ্ময়ী বললেন, 'একটু না-হয় বেশি খরচই হ'লো, তবু, আয় একটা মিশনারী মেম রেখে দি, ওরা ভারি ভালো, ভারি চমৎকার। ওদের শিক্ষা-দীক্ষার পদ্ধতিও অতি সুন্দর।'

'রাখো।'

লাল মুখ আর শাদা পোশাক নিয়ে তারপর এলো সহাস্য সুন্দরী মেম। তার পরামর্শ মতো বিলেত থেকে বই এলো দেড়-শ' টাকার, এলো নানারকম ছবি, নানারকম আসবাব, আলাদা ঘর সাজানো হ'লো, অতগুলো বই গোগ্রাসে শেষ ক'রে সুনির্মল আরও খানিকটা শিক্ষিত হ'লো, হিরণ্ময়ীর হাতের এমব্রয়ডারি, লেসের কাজ, উল বোনা আরো সুন্দর হ'লো, কেক তৈরিতে তিনি আরো-একটু পটু হ'লেন, প্রমীলার বিরুদ্ধ মন এদের প্রতি আরো তীব্র বিদ্বেষে ভ'রে গেল। শেষে অতিষ্ঠ হ'য়ে বারুদের মতো একদিন ফেটে পড়লো সে, বাড়ি মাথায় করলো তীব্র চিৎকারে। হাত-পা ছুঁড়ে, অমার্জিত ভাষায় গালিগালাজ করলো শাশুড়ীকে, স্বামীকে, পৃথিবীর সকলকে; রাশি-রাশি আগুনের ফুলকি ছিটোতে-ছিটোতে যজ্ঞেশ্বর এসে পৌঁছলো ঝরঝরে গাড়ি নিয়ে, তার শাদা রং লাল হ'লো, ছোটো চোখ কুঞ্চনে আরো ছোটো দেখালো, চোখের স্তিমিত তারায় পশুর দৃষ্টি ফুটলো, মেয়ে নিয়ে যাবার সময় সে প্রতিজ্ঞা ক'রে গেল: 'আর যদি কখনো এই ইতর চামার দরিদ্র অভদ্র বাড়িতে পাঠায় তার মেয়েকে তা হ'লে সে অমুকের অমুক নয়।'

হিরণ্ময়ী ঘরের জানালার শিক ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলেন স্তব্ধ হ'য়ে, রাজেনবাবু বৈবাহিকের ক্রোধ উপশমের উপায় হাতড়াতে লাগলেন, আর সুনির্মল নিজের ঘরে ব'সে অক্ষম অসহায় রোষে হাতে হাত ঘষতে-ঘষতে অস্ফুটে উচ্চারণ করলো, 'সোয়াইন!' ভাই-বোনেরা কৌতূহলী হ'য়ে ভীরু-ভীরু চোখে দেখতে লাগলো তামাশা। প্রমীলা বাপের পেছনে-পেছনে সদর্পে সরোদনে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলো।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রাজেনবাবু কিন্তু-কিন্তু হ'য়ে বললেন, 'কেমন জানি সব গোলমাল হ'য়ে গেল।'

হিরণ্ময়ী বললেন, 'হুঁ।'

'সুনুর বিয়ে দেওয়াটা বোধ হয় ভালো হয়নি।'

'হুঁ।'

'মিছিমিছি—' হিরণ্ময়ী উঠে গেলেন সেখান থেকে। আর, রাত্রে ফাঁকা ঘরে একলা শুয়ে শান্তিতে ঘুমুলো সুনির্মল। মনে-মনে একটা আশার ঝল্‌কানি লাগলো, উজ্জ্বল একখণ্ড হীরে। হয়তো ও আর আসবে না, আসবেই না। হয়তো ঈশ্বর দয়া করলেন এতদিনে।

৪

আস্তে-আস্তে সময় কাটতে লাগলো। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। প্রমীলা কিন্তু সত্যিই আর ফিরে এলো না শ্বশুর-বাড়িতে। হিরণ্ময়ী অবিশ্যি চুপে-চুপে কয়েক বার খবর পাঠালেন আসবার জন্য। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চিঠিও লিখলেন দু-একখানা। কোনো সাড়া এলো না ও-পক্ষ থেকে। লোকমুখে শোনা গেল ওদের আত্মীয়-স্বজনরা বলাবলি করছে, অমন দজ্জাল শাশুড়ী আর দুশ্চরিত্র স্বামীর ঘরে মেয়ে দেওয়ার চাইতে যজ্ঞেশ্বর ওকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলো না কেন।

ততদিনে হিরণ্ময়ীর মেজো ছেলে আই. এ. পাস করলো, ছোটোটি ম্যাট্রিক পাস করলো, আর বিয়ে হ'য়ে গেল একমাত্র মেয়ের। বিয়ের সময় হিরণ্ময়ী আরেক প্রস্থ চেষ্টা করলেন। লজ্জা তো তাঁরই। দুঃখও তাঁর। এ-ভাবেই জীবন কাটবে নাকি সুনির্মলের? তা ছাড়া লোকেরা কানাকানি করে, বিশ্রী লাগে ভাবতে, কেমন অসম্মান বোধ হয়, লজ্জা করে। এ-বিষয়ে হিরণ্ময়ীর মনের জোর নেই। প্রথমে ছাপানো নেমন্তন্ন-চিঠি পাঠালেন, তারপর হাতে চিঠি লিখে লোক পাঠালেন নিয়ে আসবার জন্য। যজ্ঞেশ্বর ব'লে পাঠালো, ও-বাড়ির মুখ দেখতে আর-কোনোদিন যাবে না তার মেয়ে। তার ঘরে কি ভাত-কাপড়ের অভাব? একটা মেয়ে কেন, ও-রকম দশটা মেয়ে থাকলেও যজ্ঞেশ্বরের কোনো ভাবনা ছিলো না, যজ্ঞেশ্বরের টাকা তো আর রাজেনবাবুর মতো নির্দিষ্ট মাসোহারা নয়, ভাড়া-বাড়িতেও তার জীবন কাটে না। সুনির্মল বললো, 'হ'লো?' হিরণ্ময়ী বললেন, 'হ'লো।'

হ'লো বৈকি। যা করবার, যতদূর করবার তা তো করলেনই। এবার শান্ত হ'লো তাঁর বিবেক। অস্বস্তি দূর হ'লো। সঙ্গে-সঙ্গে মনের সংগোপনে আবার আর-একটি ইচ্ছার কুসুমও কুঁড়ি হ'য়ে দেখা দিলো। প্রমীলা যদি না-ই আসে তা হ'লে আর কী করতে পারেন তিনি! তবে কেন আর মনের কাছে হাতজোড় ক'রে থাকা? লোকনিন্দা? কী এসে যায়? নিজেকেই নিজে যুক্তিতর্কে ঘায়েল করলেন। ছেলের আবার আমি বিয়ে দেবো। স্ত্রী-পুরুষের মিলিত জীবনের যে কতো আনন্দ, কতো মধুরতা তা কি সুনির্মল জানবে না কোনোদিন? এই একটা বুদ্ধিহীন, নির্মম, হাবা মেয়ের কাছে বলির পাঁঠার মতো উৎসর্গিত হ'য়ে থাকবে? ঈশ্! অসম্ভব। তিনি বেঁচে থাকতে অমন ক'রে তাঁর সন্তানের আশা-

আকাঙ্ক্ষার উপর মূর্তিমান সমাধি হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেবেন না তাকে। ও কী? ও কী একটা মানুষ? ওর সঙ্গে একজন বুদ্ধিমান মানুষের কি কোনো সম্পর্ক হ'তে পারে— বুদ্ধিমান কেন, যে-কোনো একটা সাধারণ মানুষের সঙ্গেই কী ও বসবাসের যোগ্য? যার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না, মিলন হয় না, প্রেম-বিরহ কিছুই হয় না? আর তাঁর ছেলে— বিদ্যায়, বিনয়ে, শিক্ষায়, সুরুচিতে যে-ছেলে দশজনের একজন, যে-কোনো মেয়ের তপস্যার ধন— তার জীবন নাকি কাটবে এই একটা ব্যর্থ নীরস মৃত ভার বহন ক'রে?

ভেবে-চিন্তে নিরালা নিভৃতে অবকাশ মতো মনের কথাটা তিনি স্বামীকে বললেন একদিন, 'দ্যাখো—'

'উঁ—'

'ভাবছি সুনুকে আবার বিয়ে দেবো আমি।'

সংসারের কোনো বিষয়েই কোনো হস্তক্ষেপ ছিলো না এই ভদ্রলোকটির, একটিমাত্র ব্যাপারে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যর্থ হ'য়ে তিনি যেন আরো গুটিয়ে গিয়েছিলেন, স্ত্রীর কথা শুনে তখন চুপ ক'রে রইলেন, কেবল নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন মাত্র।

স্বকৃত অন্যায়ের জন্য দুঃখ লজ্জা দুই-ই পীড়িত করছিলো তাঁকে। তাঁর সদানন্দ মনে সুখ ছিলো না এ-ব্যাপারটা নিয়ে। এক স্ত্রী বর্তমানে আবার বিবাহ, এর চেয়ে বিসদৃশ আর-কিছুই তিনি ভাবতে পারেন না। কিন্তু নীতিতে আটকালেও পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে স্ত্রীর ইচ্ছেটা আভাসে ইঙ্গিতে শেষ পর্যন্ত সমর্থনই করলেন বরং। আর সেই অনুমোদনের আভাসটুকু পেয়েই সুনির্মলের মা একেবারে উঠে-প'ড়ে লেগে গেলেন কাজে। কিন্তু এ-বিষয়ে সুনির্মলের সঙ্গেও তো তাঁর কথা বলা দরকার।

মনোমতো মেয়ে মনে-মনে জানাই ছিলো তাঁর। মনে-মনে এও বিশ্বাস ছিলো, সুনির্মলের সেখানে আপত্তি করবার কোনো কারণ নেই, যদি-না আবার বিয়ে করতে তার রুচিতে আটকায়। এই স্ত্রী নিয়ে সে সুখী হবে, এই তার যোগ্য সঙ্গী। এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলে নিজেদের অপরিণামদর্শিতার ফলে যে-দুঃখ তাঁরা ডেকে এনেছেন, ছেলের জীবনে সে-ক্ষতির শতগুণ পূরণ ক'রে দিতে পারবেন হিরণ্ময়ী।

অত আগেই বলা-কওয়ার দরকার কী? বিবেচনা করলেন মনে-মনে, তার চেয়ে ভালো ভাবে একটু আলাপ-সালাপ করুক না ওরা। পরস্পরকে পরস্পর জেনে নিক ভালো ক'রে। মেয়েটিরও তো একটা দিক আছে? সেই-বা কেন একজন বিবাহিত ছেলেকে চট ক'রে বিয়ে করতে চাইবে, যদি-না তার যথেষ্ট জোরালো কারণ থাকে। দূরের তো কেউ নয় যে ঘন-ঘন দেখাশুনোয় একটা মস্ত অসুবিধে হ'তে পারে। সুনির্মলের পিসতুতো বোনের ননদ।

সুনন্দ, অর্থাৎ সুনির্মলের এই পিসতুতো ভগ্নিপতির বদ্‌লির চাকরি। ঘুরে-ঘুরে মুন্সেফি করে সে। আজ এখানে কাল সেখানে ক'রেই তাদের দিন কাটে। মা বাপ নেই, ছেলেপুলে নেই, এই একমাত্র বোনই দখল ক'রে আছে স্বামী-স্ত্রীর আদরের জায়গা। সেও ঘোরে দাদা-বৌদির সঙ্গে-সঙ্গে। দশ বছর বাদে আবার ঘুরে ফিরে কলকাতা। 'মামীমা, পৃথিবীটা গোল।' দেখা হ'তেই সুনির্মলের বোন পায়ের ধুলো নিতে-নিতে হেসে বলেছিলো কথাটা। আর তিনি তাকিয়েছিলেন তার ননদের উনিশ বছরের পরিপূর্ণ যৌবনদীপ্ত মুখের দিকে। উনিশ না কুড়ি? এই তো একফোঁটা ছিলো সেদিন, রোগা, কালো, ছোটো এইটুকু একটা গুড়গুড়ি। এত বড়ো হয়েছে? এত সুন্দর হয়েছে? ময়লা মেয়ে সুন্দর হয় না এমন মিথ্যে আর যেন কেউ মুখে না আনে শকুন্তলাকে

দেখবার পরে। লাবণ্যের আধার। চলনে-বলনে, হাসিতে-গল্পতে লাবণ্য যেন শতধারে ঝ'রে পড়ছে, দেখতে পেলেন হিরণ্ময়ী।

ঠিক! কয়েক দিন পরে মনে-মনে বললেন তিনি, ঠিক সময়েই ঠিক মানুষটি এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর কাছে। এখন শুধু যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া।

সুনির্মলও ছেলেবেলায় অনেক দেখেছে বৈকি। কিন্তু বড়ো হ'য়ে এই প্রথম। হিরণ্ময়ী একদিন বিকেলে বাড়ি নিয়ে এসে আলাপ করিয়ে দিলেন ছেলের সঙ্গে, এক সঙ্গে ব'সে বিকেলের চা খেতে-খেতে সুনির্মল অবাক হ'য়ে ভাবলো, ছোটো মেয়েরা বড়ো হ'য়ে সবাই-ই এ-রকম বদ্‌লে যায় নাকি? ভাসা-ভাসা চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। আস্তে-আস্তে জ'মে উঠলো চায়ের আসর। ঘরে সন্ধ্যা নামলো ঘন হ'য়ে, হিরণ্ময়ী তাদের নিয়ে ছাদে এলেন খোলা হাওয়ায়, টবের বাগানে। এ-সময়টা এখানে ভারি সুন্দর, জমাট হাওয়ায় পাখার তলায় ব'সে কী লাভ? এলোমেলো হাওয়া দিলো, টবের রজনীগন্ধা আর বেলফুল গন্ধ ছড়িয়ে দিলো বাতাসে।

চমৎকার কাটলো সন্ধ্যেটা। একটু রাত হ'লো, একটুখানি চাঁদ উঠলো আকাশে। একটার-পর-একটা গান ক'রে সকলের মনে একটি অনির্বচনীয় সুখের রেশ রেখে বিদায় নিলো শকুন্তলা।

ট্র্যামে তুলে দিতে গিয়ে সুনির্মল বললো, 'আবার এসো।'

'পরীক্ষা যে। পড়তে হয় না?'

'ভারি পরীক্ষা। ও-রকম পরীক্ষার সময় আমরা অনেক আড্ডা দিয়ে বেড়িয়েছি।'

'ভালো ছাত্রদের কথা আলাদা।'

'তোমার চেয়ে তো আর বেশি নই। অত লম্বা-চওড়া নম্বর আমি জীবনেও পাইনি।'

'তা কী আর! আমি বুঝি কিছু জানি নে।'

'তুমি কিছু জানো না।'

ট্র্যাম এলো।

'এসো কিন্তু।'

'আমার আসার চাইতে আপনার যাওয়া কিন্তু আরো—' কথা ডুবে গেল, হাওয়ার ঝাপটা লাগলো মুখে, ট্র্যাম চ'লে গেল হুস্ ক'রে হাউই-এর মতো।

৫

বেড়াতে এসে একদিন সুনির্মলের পিসতুতো বোন বিনু বললো, 'মামীমা, কুন্তী বলে কি জানো? তোমার গায়ে নাকি মা-মা গন্ধ, আর মা-মা চেহারা। সত্যিই কিন্তু যা-ই বলো!'

'আহা রে!' হিরণ্ময়ী স্নেহে গ'লে গেলেন।

'আমি তো বলিই, সুনুদাটা অমন সাত-তাড়াতাড়ি বিয়ে ক'রে না-বসলে ঘরের মেয়ে চমৎকার ঘরে থাকতো আমাদের।'

হিরণ্ময়ী দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'সুনুকে তো আমি আবার বিয়ে দেবো।'

'আবার?'

'দেবো না? এ-ভাবেই ওর জীবন কাটুক এটাই কি বলিস্ তোরা?'

'কেন, বৌদি কি আর আসবেই না?'

'না।'

'তোমরাও আনবে না?'

'আমরা আনাবার কে ? ওর বাপ দেবে না। তা ছাড়া এনেই বা কী হবে ? সবই তো জানিস— ঐ মানুষটার সঙ্গে কি কেউ ঘর করতে পারে ?'

'অসম্ভব।'

'তবে ?'

মামী-ভাগ্নি দু-জনেই এর 'পরে চুপচাপ ব'সে রইলো খানিকক্ষণ। হিরণ্ময়ী এবার সংকোচ ভেঙে প্রস্তাবটা তুললেন, 'বিনু, দে না তোর ননদকে আমার কাছে, আমার ঘরে। আমি তাকে বুকে ক'রে রাখবো, আমার ঘর ভ'রে যাবে।'

'সে তো ওর ভাগ্য মামীমা। কিন্তু—'

'কিন্তু করিস নে। সুনির্মলের এই প্রথম বিয়ে ব'লেই মনে কর্ না কেন ? আর-কেউ না বোঝে, তুই তো সব বুঝিস। সুনন্দকে রাজি করা তুই।'

'উনি হয়তো সহজেই রাজি হবেন। সুমুদাকে ওঁর ভীষণ পছন্দ। পরশুই বলছিলেন, সুনির্মলবাবুর আবার বিয়ে করা উচিত। এ কি একটা স্ত্রী ? হাফ-উইট !'

'তবে এটা ক'রে দে তুই।' ভাগ্নির হাত চেপে ধরলেন তিনি।

বিনু বললো, 'সুমুদার কি পছন্দ হবে ? কালো মেয়ে।'

'কালো মেয়ে ? এমন সুন্দর মেয়েকে কেউ কালো বলে ?'

'কালো না ? আর-কখনো না উঠুক, বিয়ের সময় তো উঠবেই কথাটা। পাবনা থাকতে যে-বছর আই. এ. পাস করলো মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট হ'য়ে, চমৎকার একটা সম্বন্ধ এসেছিলো। নিজে থেকেই প্রস্তাব করেছিলো পাত্রপক্ষ। অনেকটা এগিয়েছিলো, বলতে গেলে প্রায় হয়-হয়, হঠাৎ ছেলের মা এসে নিজে মেয়ে দেখলেন, সঙ্গে-সঙ্গে

নাকচ ক'রে দিলেন সব! কী? না, কালো। শেষে কি কালো জিরের বংশ হবে?'

'ভারি তো ইয়ে। অত দূর তবে এগুলেনই বা কেন?'

'কী জানি। আমরাও সে-কথাই বলাবলি করলাম। আর কুন্তীর কী রাগ!'

'তুই আমাকেই দে ওকে। ওকে দেখে অবধি আমার মন ভ'রে গেছে স্নেহে। ছেলেবেলায়ও মেয়েটাকে বড়ো ভালো লাগতো আমার।'

'আচ্ছা, আমি বলবো ওকে।'

ভাগ্নিকে দরজা পর্যন্ত বিদায় দিয়ে একা ঘরে কতো কথাই ভাবলেন হিরণ্ময়ী, কতো ইচ্ছাই আবার কচি-কচি ডালপাতা নিয়ে মাথা নাড়লো তার ঠিক নেই। চারটে বাজলো, একটা আকুল মন নিয়ে রান্নাঘরে এলেন খাবার তৈরি করতে। বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে সকলের।

ভেতরে-ভেতরে এর পরে সবই একরকম স্থির ক'রে ফেললেন তিনি। রাজেনবাবুকেও বললেন। কিন্তু বলি-বলি ক'রে কেবল ছেলের কাছেই উত্থাপন করতে পারলেন না কথাটা। লজ্জা করে বৈকি। আবার! একবার ব'লেই কি তাকে যথেষ্ট বিড়ম্বিত করেননি? দেখছে, শুনছে, মেলামেশা করছে, এমনও তো হ'তে পারে যে সে নিজে থেকেই স্থির করলো একদিন, নিজে থেকেই একদিন বললো হিরণ্ময়ীকে। তা কেন হচ্ছে না? অধীর হ'য়ে ভাবলেন হিরণ্ময়ী। তবে কি এ-বিষয়ে কিছু ভাবছেই না ও? তাই-বা বলেন কী ক'রে? কুন্তীর উপর কি ওর কোনো ঔৎসুক্য নেই? কুন্তীকে দেখলে কি ওর মুখে আলো ফুটে উঠতে দেখেননি তিনি? তা হ'লে কি সেটা তাঁর নিজের মনের বাসনারই প্রতিচ্ছবি?

বিনু বুদ্ধি দিলো, চুপচাপ থাকো। কিচ্ছু ভেবো না। আমি জানি

ওরা দু-জনেই দু-জনকে পছন্দ করে। হাজার হোক এক-বৌ বেঁচে থাকতে আরেক বৌ ঘরে আনবে সেটা তো ওর পক্ষে একটা মর্মান্তিক লজ্জা। সে-লজ্জা কাটাতে সময় লাগবে বৈকি একটু। অস্থির হ'য়ো না, অপেক্ষা করো। তারপর সুনির্মলের ঘরে গিয়ে বললো, 'একটা ছবি দেখাও না সুমুদা, চাকরি-বাকরি করো, না-দেখাও একটা সিনেমা, না-দাও ভালো ক'রে একটা ভোজপার্টি। কী তুমি?'

'ভোজপার্টির কর্তা তো আমি নই। সেজন্যে মাকে বলতে পারো। ছবিটা অবিশ্যি আমি দেখাতে পারি।'

'তাই দেখাও।'

'কী দেখবে বলো।'

'যা তোমার খুশি।'

'তবে চলো না রোববারই যাই। লাইট হাউসে চমৎকার একটা ফিল্ম এসেছে।'

'বেশ।'

'বলো কে-কে যাবে।'

'কে-কে গেলে তুমি খুশী হও?'

'আমি তো তুমি গেলেই খুশী।'

'সত্যি?'

'মিথ্যে বলেছি নাকি?'

'তা হ'লে তোমার আমারই এনো।'

'সুনন্দ যাবে না?'

'জিগ্যেস ক'রে দেখতে পারো।'

'আর শকুন্তলা?'

বিনুর চোখে হাসি ঝিলিক দিলো, 'না, ও যাবে না।'

'কেন ?'

'ওর পরীক্ষা আর পাঁচ ছ-মাস বাদে, এখন ছবি-টবি থাক।'

'সারাদিন পড়লেই একটা মস্ত-কিছু হ'য়ে যাবে বললো কে তোমাকে ?'

'বা রে, পরীক্ষার আগে পড়বে না ?'

'পড়ুক না, তাই ব'লে সারাক্ষণ ?'

'বেশ, তুমি ব'লে দেখো ?'

'আমি বলতে-টলতে পারবো না। কাল আপিস থেকে ফেরবার পথে চারটে টিকিট কিনে আনবো— ব্যস্। যে যাও যাবে, না-যাও না-যাবে।'

'মিছিমিছি একটা টিকিট নষ্ট হবে আর কি।' একটু হাসলো বিনু।

'হ'লে হবে, কী আর করা।'

'তবু তোমাকে কিনতেই হবে ?'

'একটা ভদ্রতা আছে তো ?'

'শুধুই ভদ্রতা ?'

'না, শুধুই ভদ্রতা কেন ? ও গেলে খুশীই হবো।'

'আর না-গেলে সব ইচ্ছে চুকে যাবে, না ?' বিনু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো ভাইয়ের মুখ। ঠাট্টার ফলটা কী হয় জানতে কৌতূহল বোধ করলো।

কথা যে ঘুরে-ফিরে কোন পথে আসছে তা কি সুনির্মল এইমাত্রই বুঝলো ? মা-র ইচ্ছে, বোনের ইচ্ছে, বাবার সমর্থন, সবই সে জানে। কেউ না-বললেও জানে। আর তার নিজের ইচ্ছে ? ছিঃ। একটু গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'ইচ্ছে নিশ্চয়ই চুকে যাবে না। কিন্তু গেলে আরো ভালো লাগতো। থাকগে, আমি কাল তিনটে টিকিটই আনবো।'

'না বাপু, না। চারটেই এনো। ও-রকম হাফ-হার্টেড হ'য়ে কোনো

কাজ আমার ভালো লাগে না!' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বিন্নু। হঠাৎ মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে গেল স্থনির্মলের।

৬

বিকেল নামলো গড়ের মাঠে, মাথার উপর রাশি-রাশি পাখিরা উড়াল দিলো নীড়ের আশায়। রাস্তায় রাশি-রাশি মানুষের মিছিল বেরুলো। ডালহৌসি-পাড়ায় আপিস ছুটি হ'লো। স্থনির্মল সেখান থেকে বেরিয়ে হেঁটে-হেঁটে এসপ্লানেড পর্যন্ত এসে রাস্তা পার হ'লো। একেবারে সোজা থামলো এসে লাইট হাউসে। টিকিট-ঘরের সামনে একটু ভিড়। দাঁড়াতে হ'লো খানিকক্ষণ। আর সেই সময়টুকু ভ'রে সে ভাবতে লাগলো— তিনটে টিকিটই নেবে নাকি সত্যি? না চারটে? মনটা অবিশ্যি চারটের দিকেই ঝুঁকলো, কিন্তু বিবেক বাধা দিলো। কেবল বিবেকই নয়, কেমন একটা লজ্জাও অনুভব করলো মনে-মনে। বিনুকে সে তিনটের কথাই বলেছে, তিনটেই নেওয়া উচিত। এমন স্থযোগ সে কোনোরকমেই তাদের দেবে না যাতে সকলের মনে এই ধারণা জন্মায় যে শকুন্তলার উপর তার কোনো দুর্বলতা আছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তিনটেই নিলো। তারপর বুকপকেটে মান্থ্‌লি টিকিটের ভাঁজে রেখে হন্‌হন্‌ ক'রে হেঁটে বীরের মতো বড়ো রাস্তায় এসে দাঁড়ালো বিমর্ষমুখে। অসংখ্য যানবাহনের স্রোত ব'য়ে চলেছে, অসংখ্য মানুষের মিছিলে চৌরঙ্গি সমাকীর্ণ। আবার রাস্তা পার হ'তে হবে? স্থনির্মল ঘাম মুছলো কপালের, তারপর বাস-স্টপেই দাঁড়িয়ে থাকলো চুপচাপ। সব উৎসাহে এই মুহূর্তে যেন জল ঢেলে দিয়েছে কে। আপিসে ব'সে, আপিস থেকে বেরিয়ে, এমন কি লাইট হাউসের টিকিটের ঘুলঘুলির কাছে দাঁড়িয়ে পর্যন্তও তো অনেক উৎসাহ ছিলো, হঠাৎ কী হ'লো? আজ শনিবারের বিকেল,

কাল রবিবার, রবিবারের দুপুরে শহরের সবচেয়ে ভালো ঘরে, ভালো আসনে ব'সে একটি বিখ্যাত ছবি দেখবে এই আশাতেও কোনো উত্তেজনা নেই কেন ? উল্টোদিকের মাঠের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে রইলো, মনের কাছে এ-প্রশ্নের কৈফিয়ৎ দিতে আজ পারে না সুনির্মল।

কপাল ভালো। তক্ষুনি প্রকাণ্ড দোতলা বাস্ এসে থামলো পায়ের কাছে। সব ভাবনার ছুটি। শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে নানা কসরৎ খেলিয়ে কোনোরকমে উঠে পড়লো ভিড়ের মধ্যে, তারপর টাল সামলে যখন দাঁড়াতে পারলো পেতলের রডটা ধ'রে, একেবারে সামনের লেডিজ-সিটে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে গেল।

'তুমি !'

চোখে-চোখে চেয়ে হাসলো শকুন্তলা।

'তুমি দশ-নম্বরে যাও না ?'

'টু বি-তেও যাই।'

'তাই নাকি ? ভাগ্যিস বাস্‌টায় উঠেছিলাম।'

'খুব ভাগ্য বুঝি ?'

'ওরে বাবা, এও যদি ভাগ্য না হয় তবে আর ভাগ্য কাকে বলে ? আগে যদি এই সম্ভাবনার কথা জানতুম তবে কি কোনোদিন ট্র্যামে ফিরি !'

শকুন্তলা সহাস্যে মাথা নাড়লো।

ভিড়ে, ধাক্কায়, ওঠা-নামার ঘটায় বোনের ননদের সঙ্গে রহস্যালাপে বাধা পড়লো এবার। সুনির্মলকে অনেকখানি এগিয়ে যেতে হ'লো জনস্রোতের চাপে। কিন্তু আবার যখন সুযোগ হ'লো, ভালো ক'রেই হ'লো। এলগিন রোডের মোড়ে এসে নেমে গেলেন শকুন্তলার পাশের ফিরিঙ্গি মহিলাটি। সুনির্মলের জায়গা হ'লো। জানালার দিকে যথাসম্ভব

নিজেকে সরিয়ে নিলো শকুন্তলা, আর স্থনির্মলও একটু যেন সংকোচ বোধ করলো মনে-মনে। দূরে দাঁড়িয়ে যতটা সহজে বাক্যালাপ চালাচ্ছিলো, পাশাপাশি ব'সে তার স্রোতে বাধা পড়লো একটু-সময়ের জন্য।

'শনিবারের বিকেলটা আপনাদের পক্ষে খুব সুখের, না?' গুমোটটা শকুন্তলাই ভাঙলো প্রথমে।

একটু হেসে স্থনির্মল জবাব দিলো, 'অন্তত আজকেরটা যে খুব সুখের সেটা নিঃসংশয়ে বলতে পারি।'

'কেন?'

'আজকের আবহাওয়া খুব স্বাস্থ্যকর, আজকের আকাশ অতিশয় নীল, গড়ের মাঠের হাওয়া আজ প্রাণ-জুড়োনো— আজকে একটা কবিতা লেখবার মতো দিন।'

'লিখলেই হয়।'

'লিখবো। কিন্তু তুমি আর যাও না কেন সে-কৈফিয়তটা আগে নিয়ে নিই।'

'কোথায়?'

'আমাদের ওখানে?'

'আমাদের ওখানে কে যায়?'

'যেতে বলেই বা কে?'

'বলিনি?' বড়ো-বড়ো কালো চোখে ভুরু বাঁকিয়ে তাকালো শকুন্তলা, আর মান্‌থ্‌লির ভাঁজে লাইট হাউসের টিকিট তিনটি খচ্‌খচ্‌ ক'রে উঠলো স্থনির্মলের বুকের মধ্যে। বুকটা কাঁপলো। বাস্‌ থেমেছে চক্রবেড়ের স্টপে, হঠাৎ ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো সে, 'এই বাঁধো, বাঁধো।' শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এসো শিগ্‌গির, নামো।'

অবাক হ'য়ে গেল কুন্তী, 'নামবো? এখানে কেন?'

'দরকার আছে, এসো না।' প্রায় জোর ক'রেই সে নামিয়ে নিলো শকুন্তলাকে, আর নেমেই পেয়ে গেল একটা উল্টোদিকের ট্র্যাম, একেবারে ফাঁকা, চমৎকার।

'কী? ব্যাপারটা কী?' গুছিয়ে ব'সে ভুরু কুঁচকোলো শকুন্তলা।

'গুরুতর।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ লাইট হাউসে যাচ্ছি টিকিট কিনতে।'

'টিকিট?'

'কাল যাবে না ছবি দেখতে? বিন্নু বলেনি?'

'ও।'

'অবিশ্যি পড়াশুনোর দোহাই দিয়ে অপ্রিয় সঙ্গটা বর্জনও করতে পারো ইচ্ছে থাকলে।'

'তা হ'লে আমার টিকিটটা যেন কেনা না হয়।'

'আমার কেনার ভাগ আমি তো কিনি, তারপর তোমার ইচ্ছে হয় যাবে, নয়তো ছিঁড়ে ফেলবে।'

'টিকিট তো কেনাই হ'য়ে গেছে, দিন-ছিঁড়ি—' চোখে-মুখে হাসির ঝিলিক উঠলো শকুন্তলার।

'কে বললো কেনা হয়েছে?'

'কে আবার বলবে, নিজেই তো দেখলাম।'

'কী দেখলে?'

'কোনো আপিস-ফের্তা ভদ্রলোককে শনিবারের বিকেলে যদি উল্টো-দিকের ফুটপাত থেকে বাসে উঠতে দেখা যায় তা হ'লে কারণটা অনুমান করা বোধ হয় খুব শক্ত নয়।'

'খুব শক্ত।'

'বেশ, তা হ'লে ওখান থেকে কেন উঠেছিলেন তাই বলুন।'

'কী আশ্চর্য! এও বোঝো না? তোমার জন্য।'

'ধ্যেৎ।'

'ধ্যেৎ কী! সত্যি কথা বললেই তোমরা বিশ্বাস করো না।'

একটু হাসলো কুন্তী, 'তাই যদি হয়, আমি বলি কী, এত কষ্ট ক'রে চৌরঙ্গিতে এসে রাস্তা পার হ'য়ে ট্র্যাম ছেড়ে বাসে ওঠবার দরকার কী? তার চেয়ে বালিগঞ্জের বাসে চ'ড়ে টালিগঞ্জের অধিবাসীটি যদি মাঝে-মাঝে দয়া ক'রে একটু সান্ধ্যভ্রমণে যান ওদিকে, তা হ'লে তো এর চেয়ে বেশি সহজ হয়।'

'ঠাট্টা কোরো না কুন্তী, শেষে কিন্তু সত্যি-সত্যিই পালে বাঘ পড়বে।'

'পড়ুক না।'

'যদি রোজ যাই?'

'রোজ খুশী।'

'ভেবে দেখো।'

'দেখেছি।'

'দেখেছো?'

সুনির্মলের গলার স্বরে হঠাৎ কুন্তী তার মুখের দিকে তাকালো, তাকিয়েই থম্‌কে গেল। কী ভেবে আরক্ত হ'য়ে উঠলো মুখ।

টিকিট কিনে ফেরার পথে হাঁটতে-হাঁটতে সুনির্মল বললো, 'চা খাবে?'

একটু গম্ভীর হ'য়ে গেছে শকুন্তলা। মাথা নিচু ক'রে বললো, 'না।'

'কেন?'

'এমনিতেই ঢের দেরি হ'লো, বৌদি ভাববেন।'

'বৌদির ভাবনাটাই তুমি সবচেয়ে বড়ো ক'রে দেখলে? আমার কথাটা ভাবছো না?'

'আপনার কথা আবার কী ভাববো?'

'আমার মৃত্যুর কথা!'

'মৃত্যু?'

কাছেই ফেরাজিনির সিঁড়ি, সেখানে পা রেখে হেসে ফেললো স্থনির্মল, 'কুন্তী, এর পরও যদি চা না-খেয়েই ফিরে যেতে বলো, আমি নির্ঘাত মারা যাবো। পথেঘাটে এ-রকম হত্যাকাণ্ড হ'লে কি তোমারই খুব ভালো লাগবে?'

ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টির মতো আরাম ছিটিয়ে এবার ঝিরঝিরিয়ে হেসে উঠলো শকুন্তলা, ঘরের মধ্যে ঢুকতে-ঢুকতে বললো, 'আপনি ভারি ইয়ে—'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হ'লো সেদিন। শকুন্তলাকে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে, দেরির জন্য বিনুর কাছে ধানাই-পানাই গেয়ে তবে তো বাড়ি ফিরলো সুনির্মল। এদিকে হিরণ্ময়ী ঘর-বার করছেন তাঁর বুড়ো-খোকার জন্য। রাজেনবাবু হাত-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে এই আসছি ব'লে একবার জামাটা গায়ে দিয়ে রাস্তার মোড়ে যাচ্ছেন আবার তখুনি ফিরে আসছেন। আপিস থেকে সোজা বাড়ি আসাই তাদের চিরাচরিত অভ্যাস ; রাজেনবাবুরও, তাঁর পুত্রেরও। হিরণ্ময়ীর উৎকণ্ঠিত স্বভাবের জন্যই বোধ হয় এই নিয়মে আবদ্ধ তা'রা। একদিন তার ব্যতিক্রম হ'লেই আর ভাবনার অন্ত থাকে না। এই স্বভাবের জন্য স্বামীর কাছে ছেলেদের কাছে বকুনিও কম খান না, তবু ঐ বদভ্যাস ছাড়তে পারেন না তিনি। হয়তো বদভ্যাসের জন্যই স্বামী-সন্তানদেরও বাড়ির আকর্ষণটা একটু বেশি। স্নেহে, মমতায়, ভালোবাসায় ভরপুর হৃদয় নিয়ে যেখানে একজন মানুষ সততই অপেক্ষা ক'রে আছেন, সততই যেখানে নিজের সমস্ত সত্তা বিসর্জন দিয়ে মনপ্রাণ সমর্পণ ক'রে আছেন তাঁদের সুখ-সুবিধে, আনন্দ-আহ্লাদের জোগান দেবার জন্য সেখানে আর কার না আসক্তি থাকে ?

ঠিক ন-টার সময় সুনির্মল এসে পৌঁছলো। হিরণ্ময়ী দৌড়লেন চায়ের জল চাপাতে, অস্থির গলায় বললেন, 'কী আশ্চর্য! এত দেরি করলি কেন ?' আড়চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বারান্দা থেকে পাইচারি থামিয়ে ঘরে গেলেন রাজেনবাবু। শান্ত হ'য়ে এতক্ষণে তাঁর ক্লান্তিনিবারক চেয়ারটিতে গা এলিয়ে চুরুটে টান দিলেন। সুনির্মল হেসে তার বলিষ্ঠ হাতে মাকে জড়িয়ে ধরলো,'আচ্ছা, তুমি কী বলো তো মা ? একদিন একটু দেরি হ'লেই যদি এ-রকম করো তা হ'লে তো ভারি মুস্কিল।'

ভেতর থেকে রাজেনবাবুর গলা ভেসে এলো, 'তাই তো! তুমি চিরদিনই একরকম।'

'আর তুমি! তোমার রকমটাই বা কী-রকম শুনি?' হিরণ্ময়ী মৃদু হেসে দরজার চৌকাঠে দাঁড়ালেন, 'গায়ে পঞ্চাশ বার শার্ট লটকে কি আমি গিয়ে রাস্তায় মোড় ঘুরে আসছিলাম, না আরেকজন?'

'আমি দেশলাই আনতে গিয়েছিলাম।'

'দেশলাই! দেশলাই ঘরে ছিলো না, না? বেশ তো, একবার না-হয় তাই গিয়েছিলে, আর তিনবার?'

রাজেনবাবু জবাব দিলেন না। কড়া চুরুটের ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন করতে লাগলেন নিঃশব্দে। সুনির্মল বললো, 'বিনুর বাড়ি গিয়েছিলাম, তাই দেরি হ'য়ে গেল।'

'বিনুর বাড়ি? কেন রে?' চোখ চকচকে হ'য়ে উঠলো হিরণ্ময়ীর।

'কাল ওরা সবাই সিনেমায় যাচ্ছে সেই টিকিট-ফিকিট— আর বিনু তো জানোই— গেলে সহজে ছাড়তে চায় নাকি?' সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে-উঠতে বললো, 'চা কিন্তু খাবো না মা, খেয়ে এসেছি।'

মা আশ্বস্ত হ'য়ে এতক্ষণে সারাদিনের সব ভালোমন্দ, সুখদুঃখের কথা বলতে বসলেন স্বামীর সঙ্গে। বিশ্রম্ভালাপ।

২

সেইরাত্রে চুপচাপ শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুম এলো না সুনির্মলের। মাথার কাছের খোলা জানালায় মস্ত কালো আকাশটি এসে গম্ভীর হ'য়ে থমকালো। ছিট্‌ছিট্‌ সোনার তারা। ঢাকাই জামদানি। সারা পাড়া নিঃঝুম, রাস্তার টিমটিমে গ্যাসের আলো আর আকাশের আলোয় মাখামাখি ঝাপসা রাত। শরৎকাল, একটু-একটু ঠাণ্ডা আরাম, মায়ের হাতের স্পর্শের

আতো। সিল্কের কাঁথাটি টেনে নিলো গায়ের উপর। মন স্মৃতিতে হাবুডুবু খেতে-খেতে কতো কথাই ভাবলো তারপর।

গভীরভাবে কুন্তীর বিষয়েই চিন্তা করতে লাগলো সে। মনস্থির করা বড়ো শক্ত। কিন্তু শক্তই-বা কেন, তা-ও ভেবে পেলো না। প্রমীলা তার কে? প্রমীলাকে সে ছুঁয়েও দেখেনি কোনোদিন, ছুঁতে ইচ্ছে করেনি। স্ত্রী-পুরুষের যে একটা প্রবৃত্তিজাত স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে তা-ও সে অনুভব করেনি প্রমীলার জন্য। তবে আর কিসে বাধা? কিসের বিবেক? তবে কি লজ্জা? লজ্জাই-বা কেন? প্রমীলাকে সে তাড়িয়ে দেয়নি, পরিত্যাগ করেনি, বিয়ে করেছে ব'লে যথাযোগ্য কর্তব্যের একতিল ত্রুটি করেনি কখনো—চেষ্টা করেছে, করুণা করেছে, সহ্য করেছে। কিন্তু তবু সে চ'লে গেছে এ-বাড়ি ছেড়ে, স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে। তার পরেও আবার তার চিন্তা? তার উপর কর্তব্য? তার জন্য সারাজীবন অপেক্ষা করা?

অবিশ্যি প্রমীলা যে নিজে থেকেই গেছে সেটার জন্যে ভাগ্যকে সুনির্মল আজও ধন্যবাদ দেয়। যদি থাকতো কী উপায় হ'তো? কী করতে পারতো সে?

ভাবতেই যেন মন শিহরিত হ'য়ে ওঠে। বিয়ে! এর নাম বিয়ে! না, বিয়ে তার হয়নি। লোকজন সাক্ষী আছে? থাকুক। লোকজনেরা কী জানে? কতটুকু জানে? বিয়ে করলেই যে মানুষ বিবাহিত হয় এ-ধারণা তাদের ভুল। মন্ত্র-পড়াটাই জীবনের সব নয় যে, আজীবন শুধু সেই কারণেই একটা যূপকাষ্ঠে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে ব'সে থাকতে হবে। লোকলজ্জা? সামাজিকতা? কুরুচির ভয়? কী! কী জন্য তবে এমন একটা প্রেমহীন, সুখহীন ব্যর্থ বিরস জীবন সে বহন করবে কোনো-একদিন অদৃষ্টের বিড়ম্বনাবশত, কোনো-একটি অজানা অচেনা অযোগ্য

মেয়েকে বিয়ের মর্যাদা দিয়েছিলো ব'লে। না, না, কক্ষনো না, প্রমীলাকে সেই সম্মান সে কখনোই দেবে না, দিতেই পারে না। স্ত্রী! স্ত্রী হওয়া কি এতই সোজা? এই মানুষটাকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করতে পারে কেউ? যদি কেউ পারেও, সুনির্মল পারে না।

বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে খোলা ছাতে পাইচারি করতে লাগলো জোরে-জোরে। বাথরুমে গিয়ে চাপড়া-চাপড়া জল দিলো মুখে-চোখে, আস্তে-আস্তে কখন ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো মাথা, ঘুম জড়িয়ে এলো চোখে, বিছানায় গা এলিয়েই নিঃঝুম। এক টানে সকাল হ'য়ে গেল।

বেলা আটটার সময় মাথার কাছের জানালাটা বন্ধ ক'রে দিতে-দিতে হিরণ্ময়ী বললেন, 'ছ্যাখো ছেলের কাণ্ড! ওরে উঠবিনে? রোদ্দুরে যে ভেসে গেছে ঘর, মাথাটা তো পুড়ে গেল।'

পুবের জানালা। সকাল হ'তে না হ'তেই তার তাপ। রাস্তার দেবদারু গাছের ছায়া পড়েছে লাল মেঝেতে। থরথর ক'রে কাঁপছে পাতাগুলো। চিকিরমিকির আলোয় বোনা পাটি। পাছে এই আলো এসে তার সকালবেলাকার আচ্ছন্ন নিদ্রা-সুখের ব্যাঘাত ঘটায় এজন্যে সুনির্মল রাত্তিরেই জানালার একটা পাট বন্ধ ক'রে দিয়ে ঘুমোয়। কাল ভুলে গিয়েছিলো। হিরণ্ময়ীর হাতের ঠেলায় চোখ মেলে তাকাতেই ভীষণ গরম লাগলো তার। গা, গলা ঘেমে জল। উঠে বসলো তাড়াতাড়ি, আর উঠেই একটা অনির্বচনীয় সুখে ভালো লাগায় হৃদয়টা ভ'রে গেল হঠাৎ।

কাল হিরণ্ময়ীর জন্যও টিকিট কেটে এনেছিলো সুনির্মল। দুই ভাইয়ের জন্যও। কেননা পরে যখন কুন্তীকে নিয়ে আবার গিয়েছিলো টিকিট

সিনেতে তখন কেবলমাত্র একটা টিকিট চাওয়া, তার সামনে দস্তুরমতো লজ্জার ব্যাপার মনে হ'লো। তা ছাড়া, আগের সিনেটে টিকিটের সঙ্গে পাশাপাশি আর-একটি আসন যোগাড় করাও শক্ত, অতএব আরো-তিনটে টিকিট কেনাই তার চেয়ে ঢের ভালো। এ-উপলক্ষে তবু মাকে নিয়ে একটা আনন্দ করা হবে, আর মা-ই যদি আসেন তা হ'লে বেচারা অভি, সীমন্তই বা বাদ পড়ে কেন? আলাদা বসার সমস্যারও একটা সমাধান হয়। চারজনের মধ্যে একজনের আলাদা বসা অসম্ভব, কিন্তু সাতজনের মধ্যে ভাগাভাগি চলতে পারে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে হাসিমুখে সুনির্মল বললো, 'আজ যে ছবি দেখতে যাবে মনে আছে তো?'

হিরণ্ময়ীও হাসলেন, 'তোরই এত বেশি আছে দেখছি যে আমি, অভি, সীমন্ত, আমাদেব তিনজনের পক্ষেও তা যথেষ্ট।'

একটু অপ্রস্তুত বোধ করলো সুনির্মল কিন্তু সহজ হ'য়ে বললো, 'কোথাও যেতে হ'লে তোমার তো সংসার গুছোতেই একদিন, দুটো চাকর, তবু তোমার সময় নেই।'

সময় নেই ঠিকই। চাকর থাকলেই যদি চলতো তবে আর স্ত্রীলোক-বর্জিত পুরুষদের ঘর-সংসার এমন হতচ্ছাড়া চেহারার হ'য়ে থাকে কেন? মনে পড়লো সেবার শীতকালে হিরণ্ময়ীর বাবা অসুখে পড়লেন, আর টেলিগ্রাম পেয়েই তিনি যেমন-তেমন ফেলে চ'লে গেলেন শুধু মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে, বাপকেও চিরজন্মের মতো বিদায় দিয়ে এলেন একমাসের মধ্যে, এখানে এসেও দেখলেন পুরুষ চারটি (বাপ আর তাঁর তিন ছেলে) বেঁচে-বর্তে আছেন বটে, কিন্তু গেছে অনেক-কিছু। এর মধ্যে চাকর বদল হয়েছে একবার, ঝি-টি অসুখের অছিলায় বেশ মোটারকম সুখের বন্দোবস্ত নিয়ে স'রে পড়েছে তাড়াতাড়ি। হোটেলের চপ-কাটলেট খেয়ে ছেলেরা

ফুর্তিতে আছে মন্দ-না, বেচারা রাজেনবাবুর শুকনো রুটি চিবোতে-চিবোতে একেবারে চরম দশা। খরচার জন্য নিয়ম-মাফিক যে-টাকাটা তিনি রেখে গিয়েছিলেন স্বামীর হাতে, তাতে একমাস তো দূরের কথা, পনেরো দিনই চলেনি, তার দ্বিগুণ টাকা খরচ ক'রেও খাওয়া-পরার এই দুর্দশা।

দুই চক্ষুকে হিরণ্ময়ী চার চক্ষু ক'রে আছেন সর্বদা, দুই হাতকে দশ হাত, তবু তিনি পেরে ওঠেন না এদের সঙ্গে, আর ওঁরা তো কোন্ ছার।

স্নানের আগেই ছোকরা-চাকর তারককে দিয়ে ঘর-দোর মুছিয়ে তক্তকে ক'রে রাখলেন। ঘরে-ঘরে বিছানা পেতে ঢেকে রাখলেন পরিপাটি ক'রে, সকালবেলাকার কাচা কাপড় ছাত থেকে তুলে যার-যার ঘরে তার-তারটা রেখে দিলেন কুঁচিয়ে। স্নান ক'রে খেয়ে শুলেন না একটু। খাবার তৈরি করতে গেলেন উনুনের আঁচে। আসতে-আসতে তো সেই সন্ধ্যে, এসেই তো তাঁর তিন পুত্র 'চা চা' রবে পাড়া মাৎ করবে, আর কুঁড়ের সর্দার রামচরণ উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে কেবলি দেরি করবে কাজে, পদে-পদে ভুল হবে তার। আহা! ছেলেমানুষ সব, খিদে পাবে কতো, তখন কি আর খাবার তৈরির আশায় বসিয়ে রাখতে পারেন? জামাই-মেয়ে আসবে সঙ্গে, কুন্তী আসবে, একটু ভালোরকমও তো আয়োজন চাই? তা ছাড়া, রাজেনবাবু থাকছেন, তাঁরও তো ব্যবস্থা আছে!

মাছের চপ ভাজলেন থালা-ভর্তি, ছানা কেটে রেখেছিলেন সকাল-বেলাতেই, ছুরি দিয়ে বরফি কেটে ঘিয়ে ভেজে চিনির রসে ফেললেন, আস্ত আলু সেদ্ধ ক'রে পেঁয়াজে কষিয়ে রেখে দিলেন নুন মিষ্টি দই দিয়ে। লুচিটা অবিশ্যি তখন-তখনই ভেজে দিতে হবে গরম-গরম। বেলা দুটোর মধ্যে সব সেরে, রামচরণকে পঞ্চাশ বার সব বুঝিয়ে লাজিমুখে

বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। তাড়াতাড়ি মাথা আঁচড়ে শাড়ি প'ড়ে পাঁচ মিনিটে প্রস্তুত।

টুকটুকে ক'রে সিঁদুর পরছিলেন সুনির্মলের ঘরের বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, সুনির্মল তাকিয়ে রইলো মা-র মুখের দিকে। এইমাত্রই তার হঠাৎ যেন উপলব্ধি হ'লো সিঁদুর-পরা মেয়েদের মতো সুন্দর আর কিছু নেই এই পৃথিবীতে। হিরণ্ময়ীর ছোট্টো শাদা কপাল ঝলমলিয়ে উঠলো সাধব্যের লাল স্বাক্ষরে।

কতো বছর ধ'রে এই স্বাক্ষর বহন ক'রে আসছেন তিনি, তাঁর সুখের প্রতীক, সৌভাগ্যের প্রতীক। আরো কতো বছর ধারণ করবেন, 'যেন আমৃত্যুই মা-র কপালে এই চিহ্ন থাকে,' মনে-মনে বললো সুনির্মল।

আর সঙ্গে-সঙ্গে আরো-একটি মেয়েকে মনে পড়লো তার। যার কপাল মা-র মতো শাদা নয়, শ্যামল, এবং যে-কপালে এখনো সিঁদুর ওঠেনি, মা-র মতো যার সিঁথির দু-পাশের চুল পাতলা হ'য়ে আসেনি, অমাবস্যার অন্ধকারের মতো ঘন, হয়তো সেও আর-কয়েকদিন পরে ঠিক এইখানে, এই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ঈষৎ আনত হ'য়ে আঙুলের ডগায় গোল ক'রে টিপটি বসিয়ে কপাল রাঙাবে, চিরুনির মাথায় সিঁদুর লাগিয়ে লম্বা ক'রে হাতির দাঁতের মতো শাদা আর সরু কুমারী-সিঁথিতে টেনে দেবে সেই রঙিন রেখা।

আজকাল সিঁদুর পরে না কেন মেয়েরা? ভাবলো সুনির্মল। অমন সুন্দর একটা অলংকারকে তা'রা কী অপরাধে বর্জন করলো? দাসীত্ব? কিন্তু রানীত্বই বা নয় কেন? আসলে তো সত্যিই সেটা রানীরই নিশানা? তা'রা যে সাম্রাজ্য পেয়েছে, অনুগত দাস পেয়েছে, তার জন্যে তাদের আলাদা সম্মান প্রাপ্য হয়েছে এখন, এই জগৎ-সংসারে তারই তো সাক্ষী এই শাদা শাঁখা আর লাল সিঁদুর। বোকা! বোকা!

লম্বা নিটোল হাতে ঝিরিঝিরি জলতরঙ্গ চুড়ির পেছনে কী সুন্দর শাদা শাঁখা মা-র হাতে। পুরোনো ফ্যাশানের মোটা পাটিহার স্নেহশীতল বুকের উপর ঝকঝক করছে। উল্টে মাথা আঁচড়েছেন, বয়সের তুলনায় অনেক বেশি চুলে হাত জড়িয়ে খোঁপা করেছেন মস্ত, পৃথিবীর সব সুন্দর মেয়ের, সব সুখী মেয়ের প্রতীক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন সুনির্মলের চোখের সামনে। আশ্চর্য! বয়স তো কম হ'লো না, এতগুলো সন্তানের জন্ম দিলেন, মানুষ করলেন! আর শুধু কি সন্তান? তার মা-র কাছে কে না এসেছে, কে না থেকেছে, থেকে ভালোবেসেছে, সেবা-যত্ন ভোগ করেছে? তাঁর আন্তরিকতায়, তাঁর সৌজন্যে কে না সুখী হয়েছে? কিন্তু এত ক'রে, এত খেটে, এই বয়সেও কী সুন্দর চেহারা। একটু হেলেনি, একটু কুঁচকোয়নি কোথাও, এতটুকুও বুড়ো-বুড়ো হননি তিনি। না চেহারায়, না চরিত্রে।

বিছানার উপর আড় হ'য়ে শুয়ে সিগারেট খেতে-খেতে মন কোথায় উধাও হ'য়ে যায় সুনির্মলের। মাকে দেখতে-দেখতে আর কা'কে যেন তাঁর মধ্যে মিশিয়ে ফ্যালে বারে-বারে। মায়ের লম্বা নিটোল কিন্তু বয়স্ক হাত কখন যেন উনিশ-কুড়ি বছরের একটি সতেজ হাতে মিলিয়ে যায়, পাতলা চুল ঘন হয়, শাদা রং শাপ্‌লাফুলের ডাঁটার মতো শ্যামলে কোমলে জড়াজড়ি হ'য়ে থাকে।

নিচে ট্যাক্‌সির হর্ন শোনা গেল। চকিত হ'য়ে মুখ ফেরালেন হিরণ্ময়ী। 'আরে, তুই এখনো শুয়ে আছিস কী, যা যা, নিচে যা শিগ্‌গির।' এগিয়ে গিয়ে ব্রাকেট থেকে পাঞ্জাবিটা ছুঁড়ে দিলেন ছেলের দিকে, 'বদ্‌লে নে জামাটা। ব্যাগটা নিস।'

তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে জামাটা বদ্‌লে নিলো সুনির্মল। কী আশ্চর্য! এর মধ্যেই সময় হ'য়ে গেল? এক-পলক তাকালো ঘড়ির দিকে, তারপর পায়ে জুতো গলিয়ে নামলো খাট থেকে।

'শোন্, অভিকে বল্, চট ক'রে আরেকটা ট্যাক্সি নিয়ে আসুক মোড় থেকে, একটায় তো আর হবে না।' ঝুপ্‌ঝাপ্ একটু ঠিক করলেন টেবিলটা, জানালা ক'টা বন্ধ ক'রে দিলেন, অভ্যস্ত হাতে বিছানাটা টান ক'রে তালা হাতে বেরিয়ে এলেন তিনি। সুনির্মল নিচে নেমে গেছে ততক্ষণে।

একতলা দোতলা মিলিয়ে পাঁচটি ঘর এই বাড়িতে। উপরে দুটি, নিচে তিনটি। হিরণ্ময়ী নিচের ঘরেই থাকেন, কেননা, নিচেই রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। রাস্তার সামনের ঘরটি বসবার-ঘর হিসেবে সাজানো, মাঝখানের বড়ো ঘরটিতে হিরণ্ময়ী থাকেন আর এ-পাশের প্রায় রান্নাঘর ঘেঁষে ঘরটিতে খাবার টেবিল পাতা। শোবার ঘরটি ভালো, সব-ঘরের চেয়ে বড়োও, জানালাও বেশি। সামনে বারান্দা আছে, পেছনে একটুখানি মাটি গলিতে, লম্বা পেঁপে গাছ উঠেছে একটি, একটি বাতাবি লেবুর চারা। হিরণ্ময়ী আবার যত্ন ক'রে ডাঁটা বুনেছেন বীজ ছিটিয়ে। সামনের বারান্দা দিয়ে দু-সিঁড়ি নেমে একটু উঠোন, উঠোনের ঐ-কোণে প্রশস্ত রান্নাঘর।

বলাই বাহুল্য, এই রান্নাঘরের কাছে না থাকলে তাঁর চলে না। সুনির্মলের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এজন্যেই একতলায় আছেন তিনি। অবিশ্যি তার ঘরের পেছনের বাগানটুকুতেও তাঁর কম আকর্ষণ নেই। একতলা দোতলা করা সত্যিই কষ্টকর ভেবে সুনির্মলও শেষে জেদ করেনি আর। বসবার ঘরের আর হিরণ্ময়ীর ঘরের মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে, দোতলায় সামনের ঘরটিতে সুনির্মল থাকে, আর সিঁড়ি ডিঙিয়ে এ-পাশের ছোটো ঘরে অভি, সীমন্ত। বাকিটা সব ছাত। মেয়ে যদ্দিন ছিলো, মা-র কাছে মা-র ঘরেই থেকেছে। এখন সে-জায়গা শূন্য। আর সেই শূন্যতা সহ্য করতে মেয়ে বিয়ে দিয়ে প্রায় পাগল হ'য়ে গিয়েছিলেন হিরণ্ময়ী।

নিচে থেকে বিনু চ্যাঁচালো, 'ও মামীমা, তোমার হ'লো?'

হিরণ্ময়ী হাসিমুখে নেমে এলেন। 'কেন, দেরি করেছি নাকি ?'

'তোমার মামীকে নিয়ে বেরুনো—' ঘরে ব'সেই মন্তব্য ছাড়লেন রাজেনবাবু। সুনির্মল সায় দিলো, 'সে-বার মনে নেই রাঁচিতে ?'

হিরণ্ময়ী কী জবাব দিতে গিয়েই হঠাৎ ছুটলেন আবার উপরে।

'আবার কী বাকি রইলো তোমার ?'

'এই আসছি, আসছি।' —বড়ি রোদে দিয়েছেন ছাতে, তুলতেই তাঁর মনে নেই এতক্ষণ।

গাড়ি এসেছে। অভি, সীমন্ত হাঁক ছাড়লো, 'শিগ্‌গির এসো না, করছো কী ?'

আই. এ. পাস করবার পরে অভিকে একটা ঘড়ি কিনে উপহার দিয়েছে সুনির্মল, অভি এখনো সেই রিস্টওয়াচটির বিষয়ে সর্বদাই সচেতন, ঘন-ঘন তার দিকেই তার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলো, বিনুকে আসতে দেখেই ব'লে উঠলো, 'ঈশ্! বিনুদি, তোমরা মেয়েরা হোপলেস সত্যি—'

'নে নে, চুপ কর!' তুই দাবড়া দিয়ে মামীকে নিয়ে গাড়িতে উঠলো বিনু। ননদকে বললো, 'তুই তোর দাদার গাড়িতে যা কুন্তী।'

সুনন্দ বললো, 'আমাদের কিন্তু চাপাচাপি ক'রে একটা গাড়িতেই ধ'রে যেতো, মিছিমিছি—'

'এতগুলো লোক একটা গাড়িতে ধরে কখনো ? তোমার জামাই-এর কথা শোনো মামীমা!'

'ভালোই তো বলেছে, না-ই বা ধরবে কেন ? ক'জন আর আমরা ?'

'ক'জন! এক ডজনের কাছাকাছি তো নিশ্চয়ই। এই সুনুদা, যাও না ও-গাড়িতে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?'

কুন্তীর সঙ্গে চকিতে চোখোচোখি হ'য়ে গেল সুনির্মলের। হাতল ঘুরিয়ে গাড়িতে উঠলো সে।

বিন্থদের গাড়ি আগে ছাড়লো, পেছন-পেছন ওদের গাড়ি। তারপর গলির মুখটি ছাড়তে-না-ছাড়তেই কখন যেন একটা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হ'য়ে গেল দুই গাড়ির মধ্যে। ঐ-গাড়ি থেকে বিন্থরা মুখ বাড়িয়েছে, এ-গাড়িতে কুন্তী। পুরুষ দু-জন চেষ্টা ক'রে উদাসীন।

কিন্তু কতক্ষণ! একবার এগিয়ে গিয়েছিলো তারা অনেকখানি, আবার পেছনে প'ড়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে, ও-গাড়ি থেকে তুমুল হাসির রোল উঠলো একটি; অভি, সীমন্ত দুয়ো দিলো কুন্তীদের, বিন্থ চোখ মটকালো এতখানি মুখ বার ক'রে। কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে গেল শকুন্তলার মুখ, স্থনির্মল হেসে বললো, 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। এ সর্দারজি, জল্‌দি চলিয়ে না, বকশিশ মিলেগা।'

'হাঁ বাবুজি, হাঁ'। এত বড়ো প্রকাণ্ড শিখ দাড়ির ফাঁকে ছেলেমান্থষের মতো হাসলো। বোঝা গেল, সেও প্রতিযোগী হয়েছে, বাবু না বললেও আগে যাবার চেষ্টাই সে করছে প্রাণপণে।

এবার জিত্‌লো কুন্তীরা, স্থনন্দ আর স্থনির্মল মুখ বার ক'রে হাসলো বিন্থদের দিকে তাকিয়ে। জায়গা বদল ক'রে কুন্তী এসে জানালার ধারে বসলো।

বড়োরা ছোটো হ'য়ে গেছে— প্রৌঢ়া হিরণ্ময়ী স্থদ্ধু আজ তাঁর ছেলে-মেয়ের বয়সী। দুই গাড়ি বোঝাই উজ্জ্বল প্রাণে যেন আনন্দের বান ডেকেছে। দুই গাড়ির দুটি চালকও সে-ছোঁয়া থেকে বাঁচেনি। সমস্তটা রাস্তা ঠিক এই রকম হাসি-কোলাহলের রোল তুলে হারতে-হারতে জিত্‌তে-জিত্‌তে অবশেষে পৌঁছুলো তা'রা লাইট হাউসে। সেখানে গিয়ে চেষ্টা ক'রে অন্যদের সঙ্গে আসন বদল করলো স্থনির্মল। সাতজনেই ভাগ্যক্রমে একসঙ্গে বসতে পারলো। পাশাপাশি।

ভালো। সব ভালো। সব চাইতে ভালো বুঝি আজকের এই

দিনটি। সব চাইতে সুখের, সবচেয়ে আনন্দের। কেবল হিরণ্ময়ীর মনটা হঠাৎ এক-সময়ে কেমন জানি ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো রাজেনবাবুর জন্য। আহা! উনি যদি আসতেন। কোথায় যায় মানুষটা? কী আনন্দেই বা যোগ দেয়। একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লেন মুহূর্তের জন্য।

৩

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে প্রায় অন্ধকার। হিরণ্ময়ী আর দাঁড়ালেন না। শাড়ি ছেড়েই ছুটলেন চায়ের তদারকে। বললেন, 'তোরা উপরে যা বিনু, পাটি পেতে ছাতে ব'স্ গিয়ে, আমি এক্ষুনি আসছি।'

'এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন বলো তো? রামচরণই তো আছে, ও কি চা-টাও ক'রে দিতে পারবে না?'

'তা পারবে না কেন, গরম-গরম ক'খানা লুচি আমিই তাড়াতাড়ি ভেজে আনি।'

শকুন্তলা এলো— 'মামীমা, আমি চা করবো। আমি ভীষণ ভালো চা করি।'

হিরণ্ময়ী হাতের আলিঙ্গনে সাপ্‌টে সস্নেহে মাথায় চুমু খেলেন তাকে। তারপর ময়দা মাখ্‌তে বসলেন।

'হ্যাঁরে—' ছোকরা-চাকরটা দাঁড়িয়ে ছিলো দরজা ধ'রে, তাকে জিগ্যেস করলেন, 'বাবুকে ঘরে দেখছিনে, কোথায় গেছেন রে?'

'জানিনে তো মা।'

রামচরণ উনুনে হাওয়া দিতে-দিতে বললো, 'বাবু তো মা আপনাদের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় বেরিয়েছেন।'

'আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'কী বললেন বেরুবার সময়ে ?'

'বললেন, চুরুট আনতে যাচ্ছি, দরজাটা বন্ধ করো।'

'তারপর ?'

'তারপর তো এখনো ফেরেননি।'

চুরুট আনতে হাজরা রোডে যেতে হয় সপ্তাহে একবার ক'রে। রাজেনবাবুর এক বন্ধুর বর্মা-চুরুটের দোকান আছে সেখানে, রাজেনবাবুর ধারণা সেই দোকান ছাড়া অন্য কোথাও এত ভালো জিনিস আর পাওয়া যায় না, অমন সুগন্ধই হয় না আর-কারো চুরুটের। হিরণ্ময়ী বলেন বন্ধুপ্রীতি। সুনির্মল প্রত্যেক শনিবার আপিস থেকে ফেরবার রাস্তায় নেমে নিয়ে আসে এক-বাক্স ক'রে। আগে-আগে রাজেনবাবুই নামতেন, সুনির্মল এখন আর দেয় না তাঁকে, কেননা, রাজেনবাবুর নামতে-উঠতে যে কষ্ট, যে ক্লান্তি, সুনির্মলের তো আর তা হয় না। উনি বুড়োমানুষ কেন যান ? কিন্তু কাল একদম ভুলে গিয়েছিলো সে-কথা।

হিরণ্ময়ীর হাত ময়দার উপর থামলো। তিনি মাথা নাড়লেন কপাল কুঁচকিয়ে, 'চুরুট আনতে গিয়ে তো এত দেরি হবার কথা নয়, রামচরণ। তুমি ঠিক শুনেছিলে তো ?'

'হ্যাঁ মা, বাবু ঠিক এ-কথাই ব'লে বেরিয়েছেন।'

বিনু বললো, 'মামা তো সাধারণত কোথাও যান-টান না, আর গেলেও তোমাকে তো বলেন—'

'উঁহু, আমাকে তো কিছু বলেননি আগে।'

'তবে ?'

'তাই তো ভাবছি।' হিরণ্ময়ীর শান্ত মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়লো।

'কী মা ?' এগিয়ে এলো সুনির্মল।

হিরণ্ময়ী বললেন, 'তোর বাবা নাকি সেই দুপুরে আমরা বেরুবার

সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় চুরুট আনতে বেরিয়েছেন, এখনো না-ফেরার কারণ কি বল্‌ তো?'

জিব কাটলো সুনির্মল, 'ঈশ্‌! সত্যি তো, কাল তো বাবার চুরুট আনা হয়নি। সকালেও মনে পড়লো না। কিন্তু এতক্ষণে তাঁর ফেরা উচিত ছিলো। হাজরা রোডে যেতে-আসতে আর কতোক্ষণ লাগে?'

'তবে?'

সুনির্মল তাড়াতাড়ি বাইরে রাস্তার কাছে এসে দাঁড়ালো। কী ভেবে হঠাৎ লুচি-টুচি ফেলে হিরণ্ময়ীও এসে দাঁড়ালেন ছেলের পেছনে। মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে সুনির্মল বুঝলো তাঁর মনের কথা। একটু হেসে বললো, 'ভাবছো কেন? নিশ্চয়ই কোনো বন্ধুবান্ধবের বাড়ি গেছেন, রোববার তো? এক্ষুনি আসবেন।'

হিরণ্ময়ী ছটফট ক'রে উঠলেন, 'আমার কেমন করছে মনটা।'

'এই তো তোমার রোগ। সবটা নিয়ে এমন করো যে— কাল আমার দেরি হ'লো না? তাও তো তুমি এ-রকমই করেছিলে।'

'নারে, এমন করিনি।'

'এ-কথা তো বরাবরই বলো।'

'তুই বরং দোকানে চ'লে যা একবার। একটা ট্যাক্‌সি নিয়েই যা—'

সুনন্দ এলো, 'আপনি ভাবছেন কেন মামীমা, উনি ঠিক এসে পড়বেন এখুনি।'

'তা তো পড়বেনই।' একটু হাসলেন হিরণ্ময়ী— 'তবু কী জানি কেন ভালো লাগছে না আমার।'

'সে তো ঠিকই, একটু তো ভাবনা হয়ই। সেই কখন গেছেন, আর এখন তো—'

সুনন্দ ঘড়ি দেখলো, 'সাড়ে সাত।'

এতক্ষণকার একটানা আনন্দের উদ্দাম স্রোতে কে যেন অগস্ত্যের গণ্ডূষ পাতলো। সময় কাটতে লাগলো টিকটিকির বুকের মতো কেঁপে-কেঁপে, দণ্ড পল গুনে-গুনে। রামচরণই যা পারলো পরিবেশন করলো চা আর খাবার, কেউ খেলো, কেউ খেলো না। সুনন্দ আর সুনির্মল দু-বার ঘুরে এলো হাজরা রোড; অভি, সীমন্ত গেল সম্ভাবিত সব বাড়িতে খোঁজ নিতে, ফিরে এলো ম্লান মুখে। রাত ন-টা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে ফিরে গেল বিনুরা।

রাত এগারোটায় খবর পাওয়া গেল রাস্তায় অ্যাকসিডেণ্ট্ হ'য়ে হাসপাতালে আছেন রাজেনবাবু। গাড়ি চাপা পড়েননি। পাশের রাস্তা থেকে লম্বা-লম্বা লোহার শিক নিয়ে ট্রাক আসছিলো একটা, কী ক'রে সংঘর্ষ হ'য়ে সেই শিক ট্রামের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে কেবল মাত্র রাজেনবাবুকেই না, একসঙ্গে তিনজন লোককে গেঁথে ফেলেছে। রাজেনবাবুর কানের ভেতর দিয়ে ঢুকে গাল ফুটো ক'রে বেরিয়ে গেছে এ-পাশ ও-পাশ।

একটা চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন হিরণ্ময়ী। অভি, সীমন্ত ফুঁপিয়ে উঠলো সরু-মোটা গলায়, সুনির্মল দেয়াল ধ'রে নিজেকে সামলে নিলো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পৃথিবীর রং বদ্‌লে গেল।

ঠাণ্ডা-মেঝের উপর জ্বলন্ত বুকটা চেপে হিরণ্ময়ী ভাবলেন, একজন মানুষের হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হ'লে আরেকজন মানুষ বেঁচে থাকে কেমন ক'রে যদি তা'রা অভিন্নহৃদয়ই হয়। কালো-কালো রক্তশোষা বাদুড়ের লক্ষ-লক্ষ ডানা আঁটসাঁট নখে আঁকড়ে ধরলো হৃৎপিণ্ডটা। অন্য সব চিন্তা মুছে গেল হৃদয় থেকে, সব স্বাদ, সব সাধ মুহূর্তে চুকে গেল, শাদা কাপড়ের আঁচলে শাদা সিঁথি ঢেকে স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়ে রইলেন। সুনির্মল নিঃশব্দে ব'সে রইলো কাছে, তাকিয়ে রইলো মা-র স্বর্ণশঙ্খহীন দুটি হাতের দিকে, চিরদিনের টুকটুকে সিঁথির শাদা মরুভূমিতে, কপালের ছোটো একটি শাদা গোল দাগের দিকে। বছরের পর বছর সিঁদুর প'রে-প'রে এই রকম ছোট্টো একটি চাঁদ জন্মেছে সেখানে। চোখ জ্বালা ক'রে ওঠে, বাবার শোক দ্বিগুণিত হ'য়ে হাতুড়ির আঘাত দেয় বুকের পাঁজরে।

আশ্চর্য! এর মধ্যে হঠাৎ একদিন প্রমীলা এসে উপস্থিত। কে তাকে খবর দিয়েছে কে জানে, নিজে থেকেই এসেছে সে, স্বয়ং তার বাবাই তাকে নিয়ে এসেছেন সঙ্গে ক'রে।

কারোরই মনে ছিলো না তার কথা, প্রমীলা নামে কারো সঙ্গে যে একটা ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিলো একদিন তাদের, এ-সত্য-টুকুও যেন মুছে গিয়েছিলো মন থেকে। কিন্তু তবু সে এলো। এসেই চোখে আঁচল চাপা দিয়ে শাশুড়ির পায়ের উপর মাথা রাখলো, আর যজ্ঞেশ্বর গলায় চাদর পাকিয়ে অর্ধেক আনত হ'য়ে বৈষ্ণব ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছলেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা শূন্য দৃষ্টি নিয়ে, শূন্য মনে লক্ষ্মীর মতো টুকটুকে

হিরণ্ময়ী শাদা ধব্‌ধবে কপাল আর শাদা কাপড় নিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন অবনত, দুঃখিত দুটি মানুষের দিকে। তারপর সহসা আকুল আগ্রহে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন বৌকে। তাই তো! তাই তো! যেন হঠাৎ মনে পড়লো কথাটা, রাজেনবাবুই না একদিন নির্বাচন করেছিলেন এই মেয়েটিকে। কতো শখ ক'রে কতো ভালোবেসে ঘরে এনেছিলেন। কতো সাধ, কতো আকাঙ্ক্ষার প্রতিমা তাঁর এই বৌ। তবে এই বৌকে তিনি আজ ফেলবেন কেমন ক'রে? এই তো আজ সে ফিরে এসেছে, নিজে থেকেই চ'লে এসেছে দুঃখের দিনে, এই তো পায়ের উপর এখনো তার চোখের জলের সিক্ত ফোঁটা।

তবে নাকি ওর বুদ্ধি নেই, জ্ঞান নেই, হৃদয় নেই? আর তাই নিয়ে কতো দুঃখ, কতো গঞ্জনা দিয়েছেন তিনি স্বামীকে? নির্বোধের মতো শাদা রং দেখে নিয়ে এসেছেন ব'লে কতো অভিযোগই করেছেন। চুপচাপ চেয়ারে ব'সে চুরুট টানতেন, জবাব দিতেন না, কখনো-সখনো কিছু বলতে চেষ্টা করলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন হিরণ্ময়ী। এ-বিষয়ে তাঁর ধৈর্য ছিলো না। সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে ছেলের জীবনটা মাটি করলেন ব'লে এমন একটা দুঃখ অনুভব করতেন মনে-মনে যে স্বামীর উপর ভীষণ অভিমান হ'তো তাঁর। আর তাই নিয়ে কতো লজ্জা, কতো দুঃখ তিনি পেয়ে গেছেন এই শেষের ক'টা বছর।

মনের তলায় কোথায় যে কার কী দুর্বলতা থাকে কে জানে। সহসা একটা কথা মনে হ'য়ে যেন আঁতকে উঠলেন হিরণ্ময়ী। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন প্রমীলার নিচু-করা মাথার লাল সিঁথির দিকে। তবে কি সেই অপরাধেই ঈশ্বর তাঁকে এই সাজা দিলেন? এক মেয়ের স্বামীকে অন্য মেয়ের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাতেই কি এমন দুর্ঘটনা ঘটলো? বৈধব্যের যন্ত্রণা কি তারই ফল? বুক-ফাটা আর্তনাদে হা-হা ক'রে কেঁদে

উঠলেন তিনি। সব ধৈর্য, সব শালীনতা ছাপিয়ে সে-কান্নার রোল ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে।

কান্না শুনে কোরা-চাদর গায়ে কোরা-ধুতি পরনে খালি পায়ে বড়ো চুলে স্থনির্মল দোতলা থেকে নেমে এলো সিঁড়ি বেয়ে। দরজায় দাঁড়িয়ে বড়ো-বড়ো চোখে তাকালো মা-র দিকে, তাকালো শ্বশুর আর শ্বশুরের কন্যার দিকে, ভুরুতে কম্পন উঠলো একটি তারপর, আবার উঠে গেল দোতলায়। অভি, সীমন্ত চোখোচোখি করলো। চার বছর আগে এক-জনের বয়স ছিলো এগারো, আরেকজনের পনেরো। এখন এগারো পনেরো হয়েছে, পনেরো উনিশ হয়েছে। সেই বয়সের সেই স্মৃতি দু-জনের মনেই দু-রকম আলোড়ন তুললো। ফিস্‌ফিসিয়ে বললো, 'বৌদি।' রামচরণও এসে দাঁড়ালো দরজার কোণে, ছোট্টো চাকর অনভিজ্ঞ তারকের কানে-কানে বললো, 'বড়ো দাদাবাবুর বৌ।'

সন্ধ্যাবেলা বিন্থ এলো। একটুখানি থমকে গেল যেন প্রমীলাকে দেখে, তারপরেই আলাপ করলো স্বাভাবিক হ'য়ে। বৌদির বাবা ব'লে যজ্ঞেশ্বরের ফাটল-ধরা পায়ে প্রণামও করলো হাত বুলিয়ে। আড়ালে গিয়ে হাতটা ধুয়ে ফেললো সাবান দিয়ে। ধুতেই হ'লো, কেননা যজ্ঞেশ্বরের পায়ের হাঁ-করা ফাটলে যেন চিট্‌চিটে কী ছিলো, মনে হ'লো বিন্থর। রক্ত-পুঁজ নাকি? এত ঘা কেন ভদ্রলোকের পায়ে ছোটোলোকের মতো? তারপর উপরে এলো।

স্থনির্মল কী লিখছিলো টেবিলের উপর নিচু হ'য়ে, মৃদু হেসে বললো, 'এসো।'

খাটের উপর পা ঝুলিয়ে একটু চুপচাপ ব'সে রইলো বিন্থ। তারপর বললো, 'ওঁরা কখন এলেন?'

'কারা? ও।'

'বৌদিকে এই আমি প্রথম দেখছি।'

'তাই নাকি ?'

'বিয়ের সময় তো আমি আসতে পারিনি। মামীমার চিঠিতে অবিশ্যি সবই জেনেছিলাম।'

'হুঁ।'

'কে নিয়ে এলো ওদের ? তুমি ?'

'না।'

'তবে ?'

'নিজে থেকেই এসেছে।'

'নিজে থেকেই ?' একটা যেন দীর্ঘশ্বাস চাপলো বিনু। একটু পরে বললো, 'বাড়ির বৌ এ-সময়েও যদি না আসবে তবে আর আসবে কখন।'

'তাই তো।'

'খবর পাঠিয়েছিলে বুঝি ?'

'না।'

'কোথায় খবর পেলো ?'

'জানিনে।'

এর পরে কারোরই যেন আর কথা রইলো না। সুনির্মল চুপচাপ একবার বন্ধ করতে লাগলো কলমের ক্যাপটা, আবার খুলতে লাগলো। বিনুও বালিশের ওয়াড় খুঁটলো একটু, আঙুলের আংটি খুললো দু-বার, কান চুলকোলো, মাথা চুলকোলো, তারপর বললো, 'নিচে যাই এবার।'

বিনু উঠে গেলে সুনির্মলও উঠলো, ঘরের এই প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্তে গেল একবার, আবার ফিরে এলো, আবার গেল, আবার এলো, থমকে দাঁড়ালো একটু, ছাতে এসে পাইচারি করলো খানিক, তারপর নিচে নেমে এসে সোজা বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

২

রাত্তিরে এ-ক'দিন মা-র ঘরে, মা-র পাশেই কম্বলের বিছানায় শুচ্ছিলো সুনির্মল। বাবার অশৌচ সে পুরোমাত্রাতেই পালন করছিলো। এ নিয়ে মনে যে তার কোনো সংস্কার ছিলো তা নয়, গতানুগতিক করবার কাজ ক'রে যাচ্ছি তাও নয়, সকলে করে অতএব আমারও করা উচিত, তাও নয়; শাস্ত্রসম্মত নিয়ম পালন করলে পিতার কোনো সদ্‌গতি হবে স্বর্গে বা নরকে সে-কথাও সে ভাবেনি। এ-ভাবেই যেন তার শোকটা একটু প্রশমিত হবার উপায় খুঁজছিলো। এই শারীরিক কষ্ট বহনেই যেন অনেকটা লাঘব হচ্ছিলো তার মনের কষ্ট। সে পুরুষ মানুষ, জোরে-জোরে কান্না তার আসে না; উপরন্তু সে-ই তো এখন এ-বাড়ির কর্তা, রক্ষণাবেক্ষণে তারই এখন তার পিতার মর্যাদা, অতএব মন খারাপ ক'রে একটু শুয়েও থাকতে পারে না চুপচাপ। উঠতে হয়, হাঁটতে হয়, খাটতে হয়, দেখতে হয়, এমন কি বাড়ির এই দমবন্ধ-করা শোকার্ত আবহাওয়াকে একটু লঘু করবার জন্য হাসতেও হয় মুখের পেশী নাড়িয়ে। সময় কই তার শোক করবার? সে শোকার্ত হ'লে ভাই দুটি কী করবে? মা শান্ত হবেন কেমন ক'রে? কিন্তু দুঃখের বাষ্প তো আর জ'মে থাকতে পারে না মনের মধ্যে, বেরুবার রন্ধ্র চাই তার। সুনির্মলের বোধ হয় এই ছিলো শোকের রন্ধ্র। হয়তো এই নিয়মপালনের নিষ্পেষণটাই তার সান্ত্বনা।

ফলমূল সেদিন রাত্রে প্রমীলাই কেটে দিলো। যজ্ঞেশ্বর ব'সে থেকে তদারক করলেন, 'এটা খাও, ওটা খাও।' প্রমীলাকে নির্দেশ দিলেন নানারকম। তারপর শুতে গেলেন উপরের ঘরে। প্রমীলাও কাজ সেরে উঠে গেল তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে।

অভি, সীমন্ত আজ এ-ঘরে শোবে, কেননা যজ্ঞেশ্বর তাদের ঘরে। সুনির্মল ঘরের চারদিকে তাকালো, 'আমার কম্বল কই মা ?'

'উপরে নিয়ে গেছে প্রমীলা।'

'উপরে ? উপরে কেন ?'

'তুই আজ উপরের ঘরেই শুবি। ওরা তো শুচ্ছে এখানে।'

'আমি আজ উপরে শোব ?'

'তা ছাড়া আর জায়গা কই বাবা ? তোর ঘরের মেঝেতে তোকে বিছানা পেতে দিতে বলেছি। তাই ভালো। হাজার হোক এখানে এই একতলার মেঝেতে রোজ-রোজ একটা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে শেষে একদিন একটা ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা লেগে অসুখ বাধাবি।'

'হঠাৎ কি আজই তোমার মনে পড়লো সে-কথা ?'

একটু চুপ ক'রে রইলেন হিরণ্ময়ী। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'যা, শো গিয়ে। এতদিন বাদে ওরা এলো, একটা কথাবার্তাও তো আছে ?'

সুনির্মল স্তব্ধ হ'লো। গুম্ হ'য়ে রইলো অনেকক্ষণ, তারপর আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। দোতলায় উঠে এলো সে, কিন্তু ঘরে ঢুকলো না, এলো ছাতে। অভি, সীমন্তর ঘরে আলো জ্বলছে, টেব্‌ল-ল্যাম্পের সবুজ শেড্ ঢাকা মৃদু ঝাপসা আলো। একটু-একটু কথা ভেসে আসছে কানে, কখনো যজ্ঞেশ্বরের, কখনো প্রমীলার। বাপে-মেয়েতে কথা বলছে আস্তে-আস্তে। সেদিক থেকে স'রে এসে এদিকের কোণে বসলো সুনির্মল, একটা সিগারেট ধরালো।

৩

হাতের উপর মাথা রেখে ছাতের সেই খসখসে মেঝেতেই লম্বা হ'য়ে সুনির্মল ঘুমিয়ে পড়েছিলো বোধ হয়। একটা ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল।

মাথার কাছে ব'সে প্রমীলা ঠেলছে তাকে, 'এ কী! এখানে শুয়েছো কেন। ঘরে চলো।' প্রমীলার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তকাল চুপ ক'রে রইলো সুনির্মল, তারপর বললো, 'না।'

'না মানে? ঠাণ্ডা লাগবে না?'

'না।'

'তা হ'লে এখানেই কম্বলটা বালিসটা নিয়ে আসি।'

'না।'

'না, না, না!' বিরক্ত হ'য়ে উঠলো প্রমীলা। তারপরেই আবার সামলে নিয়ে অন্য গলায় বললো, 'তা হ'লে আমিও এখানেই শুই।'

'তুমি কেন এখানে শোবে?'

'তুমি শুয়েছো আর আমি শুতে পারবো না?' একটু যেন আবদার-আবদার শোনালো গলাটা। তারপর উঠে গেল ঘরের মধ্যে, আবার একটু পরেই ফিরে এলো একটা পাটি আর বালিশ নিয়ে।

সুনির্মলের গা ঘেঁষে শুয়ে বললো, 'এতদিন পরে এলাম, আর একটা কথাও বলছো না?'

সুনির্মল স'রে গেল একটু, জবাব দিলো না।

'বাপ মরলে কি বৌ-র সঙ্গে কথা বলতেও বারণ?'

'অশৌচ হ'লে একসঙ্গে শোয়া অন্তত বারণ, তা তোমার জানা উচিত ছিলো।'

'ইঃ! সে-বারণ যেন কেউ-ই মানে। আমার ঠাকুমা মরলো না দেশের বাড়িতে? খবর পেয়ে বাবা তো দড়া গলায় দিলেন, খড়ের গাদার উপর কম্বল বিছিয়ে আলাদা বিছানা পাতলেন, আমি মা-র সঙ্গে কোণের ঘরে গিয়ে শুলাম। ও মা, রাত্তিরে এক ঘুম দিয়ে উঠে দেখি কী,

বাবা তো শুয়ে আছেন মা-র পাশে। ও-রকম দেখিয়ে-দেখিয়ে সকলেই আলগা থাকে, রাত হ'লেই একসঙ্গে শোয়।'

দাঁতে কাঁকর পড়লো। শিহরিত হ'য়ে উঠে বসলো সুনির্মল। বললো, 'ঘুমুতে দাও।'

'চার বছর তো নিশ্চিন্দি হ'য়ে ঘুমুলে, এখন না-হয় একটু জেগেই থাকো।' স্বামীর কাছে নিবিড় হ'য়ে এলো সে, একখানা হাত ছড়িয়ে দিলো কোলের উপর। সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো স'রে বসলো সুনির্মল, 'ও কী?'

প্রমীলাও তীরের মতো উঠে ব'সে স'রে এলো কাছে, 'কী, তা কি তোমার জানা নেই?'

'ঘরে গিয়ে শোও।'

'কেন, এখানে বাধা কী?'

'আমাকে ঘুমুতে দাও।'

'আমি থাকলে ঘুমের ব্যাঘাত হয় নাকি তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'সন্ন্যেসী হয়েছো নাকি?'

'বাজে কথা থাক্, তুমি যাও।'

'যদি না যাই?'

'আমাকেই যেতে হবে।'

'এত!'

সুনির্মল উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালো, তারপর আলসের কাছে এসে ধোঁয়া ছাড়লো।

'শোনো—' সবেগে এগিয়ে এলো প্রমীলা, 'আমি তোমার স্ত্রী, মনে রেখো।'

'মনে আছে।'

'ভেবো না কিছু জানিনে, কিছু বুঝিনে, কিছুই আমার কানে যায়নি।'

সুনির্মল চুপ।

'দিদিমা সব বলেছেন গিয়ে। ভেবেছিলে চুপে-চুপে, ডুবে-ডুবে জল খাবে আর একাদশীর বাপেও জানতে পারবে না সে-কথা, না?'

ধোঁয়ার কুয়াশা তুলতে লাগলো সুনির্মল।

'কী? কথা বলছো না কেন?'

'কী বলবো?'

'হৃদয়েশ্বরীর নামটা কি শুনি?'

'ভদ্রভাবে কথা বলো।'

'ওরে আমার ভদ্র রে— ভদ্দরনোকের এঁটো পাত রে। বিয়ে-করা বৌ ফেলে যে-মিন্‌সে আরেকটা মাগীর পিছে-পিছে—'

ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে কোথা থেকে যে যজ্ঞেশ্বর বেরিয়ে এলেন কে জানে। ছায়া হ'য়ে তিনি কি এতক্ষণ মেয়ে-জামাই-এর কথা শুনছিলেন উঁকি মেরে চুপি-চুপি?

'এই যে বাবা, ঘুম হচ্ছিলো না, পাইচারি করছিলাম ছাতে।' মেয়ের কাছে এসে: 'ও-সব হচ্ছে কী, পেমি, শুনি? কী যা-তা বলছিস দেবতার মতো মানুষটাকে। আর বোলো না আমার মামীর কাণ্ড। কোথা থেকে কী সব বাজে কথা শোনে আর লাগায় গিয়ে ওখানে। অমন কান-ভাঙানি দু-জন হয় না। একদিন গিয়ে কী যে সব ফুসমন্তর কানে দিলো, সেই থেকে ওর যেন মাথা খারাপ হ'য়ে আছে। আর তা তো হবেই, কী বলো, অ্যাঁ? বলে কিনা রাজেনবাবু আবার বিয়ে দিচ্ছেন তাঁর ছেলেকে!' হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন তিনি: 'আমিও বলেছি, আর যার সম্বন্ধে যা-ই বলো, আমার বেয়াই

সম্বন্ধে টুঁ শব্দটি কোরো না। তোমার চেয়ে তাঁকে আমি ভালো জানি।'

স্থনির্মল আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা শুনলো।

'আয়, আয়, ঘরে আয়।' মেয়ের হাত ধ'রে টানলেন যজ্ঞেশ্বর, 'ওর মন মেজাজ ভালো না, কেবল মিছিমিছি বিরক্ত করা। নাও বাবাজি, শান্ত হ'য়ে ঘুমোও তুমি। কম্বলটা কই? কম্বলটা এনে পেতে দে দেখি তাড়াতাড়ি।'

মন্ত্র-পড়া সাপের মতো ধীরে-ধীরে বাপের সঙ্গে হেঁটে গেল প্রমীলা।

৪

যজ্ঞেশ্বর বললেন, 'তা হ'লে কি আমি এই শিখিয়ে-পড়িয়ে আনলাম? এসেই তুই ঝগড়া বাধালি?'

'বাধাবো না? ও কি-রকম করলো আমার সঙ্গে তা তো তুমি ছাখোনি?'

'দেখেছি, সবই দেখেছি, কিন্তু তুমি যদি এ-রকম ঝগচটা হও তা হ'লে প'ড়ে থাকো এখানে, আমি চল্লাম।'

ফোঁস-ফোঁস ক'রে কেঁদে উঠলো প্রমীলা, 'আমি কি ঝগড়া করেছি নাকি? ও-ই তো প্রথমে—'

'সে-সব আমি শুনতে চাইনে, মোটমাট তোমাকে এর চেয়ে আরো অনেক বেশি বুঝে-স্থঝে চলতে হবে, অনেক বেশি শান্ত হ'তে হবে। শোনো—'

নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলেন তিনি। মন দিয়ে সব শুনলো প্রমীলা, সব বুঝলো, সব হৃদয়ঙ্গম করলো। বাপের কথা কবেই-বা সে শোনেনি, বোঝেনি? ছোট্টো থেকে সে তো তাঁকেই বুঝে-বুঝে এত বড়ো হ'লো;

তাঁর সংসারেই তো হাত পাকিয়ে এলো এই চার বছর। বাপের উপর এক-কাঠি হ'য়ে চোদ্দ ভরির হার গড়ালো, মকরমুখ বালা গড়ালো, নিজের আলাদা ট্রাঙ্কের তলায় পাত-পাত ক'রে সাজিয়ে রাখলো সাতশো টাকার নোট। কারবার কি শুধু তার বাবাই করতে জানেন? টাকা জমানোতে কি একমাত্র তার বাবারই অদ্বিতীয় প্রতিভা?

কই, তাঁর মা-মরা ভাগ্নেটিকে কি তিনি এতদিন তাড়াতে পেরেছিলেন বাড়ি থেকে? মানদা ঠান্‌দি কি সে-বাড়ি ছাড়তো যদি-না প্রমীলা এ চার বছর থাকতো গিয়ে তার বাপের ঘরে? ঠিকই, যজ্ঞেশ্বরও যা পারেনি, প্রমীলা তা পেরেছে। এই মানদা বুড়িই একদিন সেই ঝড়-বাদলের অন্ধকার রাত্রে প্রমীলাকে পৃথিবীর আলোতে টেনে এনেছিলো, এই বৃদ্ধা আত্মীয়াটিই সেদিন নাড়ি কেটে দু-ভাগ ক'রে দিয়েছিলো তাদের মা আর মেয়েকে। কোলে-কাঁখে ক'রে মায়ের মতো ভালোবেসে মানুষ করেছিলো। সারা গায়ে বারো-মাস কেমন ঘা থাকতো প্রমীলার, পুঁজে থিক্‌থিক্ করতো, আর যন্ত্রণায় অহোরাত্র কাঁদতো সে। সুধাময়ী শান্ত করতে পারতেন না, সারারাত সারাদিন এক ঠায় কোলে নিয়ে ব'সে থাকতে-থাকতে ক্লান্ত হ'য়ে ফেলে দিতেন বিছানায়; বিরক্তিতে, অবসাদে, দুঃখে মেয়ের মৃত্যু কামনা করতেন মা হ'য়ে, আর তখন এই বৃদ্ধাই তাকে সাপ্‌টে বুকে তুলে নিতো, নিজের ঘরে নিয়ে এসে হাঁটুতে শুইয়ে শান্ত করতো ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে, নিজের শুক্‌নো স্তন গুঁজে দিতো মুখে। না-ঘুমিয়ে জেগে থাকতো সারারাত।

তাতে কী? গণ্ডেপিণ্ডে গিলবে ব'সে-ব'সে আর এটুকুও করবে না? মা বলেছিলেন, 'এখন এই অসহায় বুড়োমানুষটা এই দুরন্ত মাঘের শীতে কোথায় যাবে? কে আছে তার?' মাকে মুখ নেড়ে-নেড়ে দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছিলো প্রমীলা। মা মানুষটা যেন কেমন! টাকাকড়ির

উপর একটু যদি মমতা থাকতো! তা হ'লে কি বছরের পর বছর এই পুষ্যিগুলোকে খাওয়ায় বসিয়ে-বসিয়ে? মা-র জন্যেই তো এগুলো আছে, তা নইলে বাবার কি ইচ্ছে করে এ-ভাবে পয়সাগুলো জলে ফেলতে? কপাল চাপড়ায় মনে-মনে, 'ঈশ্, আরো দশ বছর আগে কেন জন্মালাম না আমি, তা হ'লে তো সেই দশটা বছরের ভাত-কাপড়টাও বাঁচাতে পারতাম! মা এ-সবের কী বুঝবেন? টাকা কি তাঁর বাবার? বাবার মৃত্যুর পরে এ-টাকার মালিক কি তিনি হবেন? যদ্দিন যজ্ঞেশ্বর জীবিত আছেন তদ্দিনই সব ধানাই-পানাই। তারপর? তারপর তো ঐটুকু নেড়েচেড়েই বাঁচতে হবে প্রমীলাকে।

পিসতুতো ভাইকে তার মা-র গয়নার হিসেব কী সুন্দর ভাবেই দিয়েছিলো। যজ্ঞেশ্বর পর্যন্ত থ' হ'য়ে গিয়েছিলেন মেয়ের অত চমৎকার পাটোয়ারি বুদ্ধিতে। চাল, ডাল, তেল, নুন, কয়লা, কাপড়, জামা, জুতো, সেলেট, পেনসিল, ইশ্কুলের হাফ-ফ্রির মাইনে, অসুখ-বিসুখ, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর হিসেব করলে কতো দাঁড়ায়? ঐ ক'ভরি সোনা কি তার পরেও ব'সে থাকে সিন্দুকে? বরং হিসেব ক'রে দেখা গেল জমার চাইতে খরচের পাল্লাই ওজনে ভারি। টিনের রং-চটা স্যুটকেসটির মধ্যে দুটো ছেঁড়া প্যাণ্ট আর দুটো হাফসার্ট গুঁজে দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে-দিতে ক্রন্দনরত রাখালকে এ-কথা বলতেও ভুললো না প্রমীলা, 'যদি মানুষ হোস, যদি বাপের ব্যাটা হোস, তবে বাকি টাকাটা এসে শোধ ক'রে দিস চাকরি-বাকরি ক'রে।' সুধাময়ীর শরীরে মনে আর বাকি কিছুই ছিলো না, তবু তাই নিয়েই সেদিন আহত সাপের মতো গর্জালেন অনেকক্ষণ, তারপর বিছানায় শুয়ে-শুয়ে বালিশ ভিজোলেন। যজ্ঞেশ্বর ঘন গোঁফের আড়ালে হাসলেন মেয়ের ক্ষমতা দেখে।

এর পরেও যদি কেউ বলতে চায় যে প্রমীলা বোকা, হাবা, তা হ'লে তাদেরই বুদ্ধি নেই ধ'রে নিতে হবে। কাজেই, সেই বুদ্ধিমতী প্রমীলা তার বুদ্ধিমান বাবার কথা বুঝতে পারবে না তা কি হয়? শ্বশুরের মৃত্যুর খবর পেয়ে বরং তার বাবা বলবার আগে তারই মনে হয়েছিলো এখানে চ'লে আসবার কথাটা। যজ্ঞেশ্বরের মামী, যিনি বরের মাসী আর কনের পিসী, তিনিই দিয়েছিলেন খবরটা। শুধু তাই নয়, যে-কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ জানে না সে-কথাও তিনি হিরণ্ময়ীর পেট থেকে টেনে বার ক'রে একখানায় দশখানা বানিয়ে যজ্ঞেশ্বরের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন কয়েকদিন আগে।

'ও জগু, শুনেছো?' কলকাতা থেকে বাসে চ'ড়ে গিয়ে, পুরো এক ঘটি জল খেয়ে ঠোঁটে জিব বুলিয়ে বললেন তিনি।

'কী!'

'ব্যাটার যে আবার বিয়ে দিচ্ছে ওরা।'

সামনে কাঠের বাক্সের উপর বালি-কাগজের কালিতে হিসেব লিখতে-লিখতে চোখ তুললেন জগু, 'কার ব্যাটার?'

'তোমার জামাই-এর কথা বলছি গো।'

'দিক।'

'দিক মানে? মেয়ের তো আর তুমি অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে পারবে না।'

'বিয়ের দরকার কী? আমার ঘরে কি খাবার অভাব?' হাতের কাজ বন্ধ রেখে কোঁচার খুঁটে ঘাম মুছে বললো, 'ওই শাউড়ি মাগি যদ্দিন বেঁচে আছে তদ্দিন আর আমার মেয়ে যাবে না ওখানে। জামাই যদি আলাদা হয় তার মায়ের সঙ্গে, যদি টাকাকড়ি এনে আমার মেয়ের হাতেই দেয় তবেই—'

'তুমিও যেমন!' মামী গালে হাত দিয়ে চোখ টান করলেন, 'মা তো নয় যেন ডাইনি।' কেমন ক'রে যে অত বড়ো ছেলেটাকে আগলে রাখে, দেখে বাপু তাজ্জব ব'নে যাই। তুকতাক জানে নাকি মাগি? সোয়ামিটাও তো একটা ভেড়ার অধম। ছিঃ—'

প্রমীলা এসে দাঁড়ালো, 'কার সোয়ামি, দিদিমা?'

'তোর শাশুড়ির সোয়ামি লো, আর এদিকে ঐ শাদা ফ্যাটফেটে রং নিয়ে, এক-গা মাংস নিয়ে তুই তো কিছুই করতে পারলি নে।'

মুখ বাঁকালো প্রমীলা, 'আমি তা চাইলে তো।'

'তবে থাক্ গোমর ক'রে ব'সে, ওদিকে বর তো আবার বিয়ে করছে আর-এক ছুঁড়িকে।'

'কী!'

'কী আবার। পুরুষ মানুষের মন, যে পাত্রে যেমন। এবার যা ধড়ফড়িয়ে ধর গে, আট্‌কা গিয়ে সোয়ামিকে। মেয়েমানুষের আবার পুরুষ মজাতে কী লাগে লো?'

'ব্‌ব—য়ে—য়ে গেছে।' অদ্ভুত উচ্চারণে, অসহ্য রাগে ব'য়ে গেছে শব্দটি তুবড়ির মতো ছুটিয়ে দুম্‌দুম্ ক'রে চ'লে গেল প্রমীলা সেখান থেকে। কিন্তু তক্ষুনি ফিরে এলো আবার, ঠোঁট উল্‌টিয়ে বললো, 'বিয়ে করা অত সোজা নয়, বুঝলে? অত সোজা নয়।'

মাথা নাড়লেন যজ্ঞেশ্বর, 'ঘুঘু দেখেছে বাছাধনেরা, ফাঁদ তো আর গ্যাখেনি! সেটাও বুঝি দেখবার ইচ্ছে হয়েছে।' কাঠের বাক্স গুটিয়ে হিসেবপত্র বন্ধ করলেন তিনি। প্রমীলাও চ'লে গেল নিজের ঘরে। কিন্তু খবরটা যতই অবহেলার যোগ্য হোক না কেন, বাপ বা মেয়ে কেউ সারাদিনেও সেটা ঝেড়ে ফেলতে পারলো না মন থেকে। যজ্ঞেশ্বরের দুপুরের ঘুমে ব্যাঘাত হ'লো, আর প্রমীলার রাত্তিরের ঘুমে।

আশ্চর্য! কোথায় যে এই বিষ লুকিয়ে ছিলো কে জানে। ভীষণ একটা ঈর্ষাবোধে সেদিন সারাক্ষণ ছটফট করলো প্রমীলা। অন্য কোনো একটি কল্পিত স্ত্রীলোককে সামনে দাঁড় করিয়ে অকথ্য কুকথ্য ভাষায় নিঃশব্দে গালিগালাজ করলো, মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে পিঠ ভাঙলো, স্বামীর শয্যায় শুতে দেখে তার নাক কান ছিঁড়লো, আঁচড়ে-কামড়ে খুব্‌লিয়ে চোখের ডিম উপড়ে ফেললো। তবু তার ক্রোধ শান্ত হ'লো না, শেষে অন্ধকারে উঠে ব'সে দাঁত দিয়ে সত্যিই বিছানা বালিশ ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করতে লাগলো।

৫

কী করবেন, কী করবেন ভাবছিলেনই যজ্ঞেশ্বর। এর মধ্যেই আর-এক চমক-প্রদ খবর নিয়ে এসে হাজির হ'লেন মামী। কী, না পরশুদিন রাজেনবাবু মারা গেছেন। সবিস্তারে সব ঘটনারই তিনি বিবৃতি দিলেন। এ-কথাও বললেন, এ-রকম যে একটা-কিছু হবেই তা তো তাঁর আগেই জানা ছিলো। নিরপরাধে যেমন একটা মেয়ের সর্বনাশ করতে গিয়েছিলো হিরণ্ময়ী, তার সাজাও পেলো হাতে-হাতে। মেয়েমানুষের বুক থেকে তার স্বামী কেড়ে নেয়ার মতো আর কী পাপ আছে সংসারে? সেটা আর যে-ই সহ্য করুক, ঈশ্বর আছেন না মাথার উপরে? তিনি সবই দেখতে পান।

তবে আর বাধা কিসের? যজ্ঞেশ্বর তৎক্ষণাৎ মন স্থির ক'রে ফেললেন। মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, 'মামী, একটা বড়োই দুঃসংবাদ দিলে তুমি। আমি কালই পেমিকে নিয়ে যাবো ওদের ওখানে। ওরা যা-ই করুক, আমি কি এই বিপদে অভিমান নিয়ে ব'সে থাকতে পারি?'

'সে তো ঠিকই। হরি-ই-ঈ বলো মন!' মামী মুখের গহ্বর দেখিয়ে হাই তুলতে-তুলতে তুড়ি দিলেন।

'তা রেখে-টেখে গেছে তো কিছু?' যজ্ঞেশ্বরের গলা যথাসম্ভব উদাস— 'না কি একেবারে অনাথ ক'রে গেছে বিধবাটাকে?'

'রাখবে না কেন? যথেষ্টই রেখেছে। রাজেন চৌধুরী কি একটা ফ্যাল্না মানুষ ছিলো নাকি? তবে শোনো— ঘরের তো আমি সবই জানি। আর সম্পর্কও আমার কিছু আজকের না। বাসনকোসন গয়না-গাঁটি—'

এক ঘণ্টা ব'সে-ব'সে মামী ওদের চৌধুরী-পরিবারের উষ্টিগুষ্টির ফিরিস্তি দিলেন, ধনদৌলতের হিসেব দিলেন, কে কার ব্যাটা, কে কার নাতি, সব তালিকা তাঁর কণ্ঠস্থ। আর যজ্ঞেশ্বর জলটুকু বাদ দিয়ে চোখ বুজে-বুজে দুধটুকু মর্মে গ্রহণ ক'রে সেদিনের মতো বিদায় দিলেন মামীকে। চোখ বড়ো ক'রে প্রমীলাও শুনলো সব। শুধু শশুরকুলের ইতিবৃত্তই শুনলো না, দরজা ভেজিয়ে বাপের কাছেও অনেক-কিছু শুনতে হ'লো তার পরে।

হিরণ্ময়ীর কপাল যে এত শিগ্‌গিরই ভাঙবে কে জানতো সে-কথা?

প্রমীলার ভাগ্যই আলাদা।

যার ঘোড়া তারই তো রাশ। এখন আর হিরণ্ময়ী কে? যে-সংসারের কর্ণধার স্থনির্মল সে-সংসার তো অবশ্যই প্রমীলার। নিজের স্ত্রী ফেলে কে কবে পরের স্ত্রীকে কর্তা হ'য়ে কর্ত্রীর আসন দেয়? তবে এদের কথা আলাদা। হয়তো তার গর্দভচন্দ্র জামাতাটি এখনো সেই মৃত রাজেনের স্ত্রীর মুঠোতেই দিয়ে রাখবে সব। তাই সাত-তাড়াতাড়ি বেশি-কিছু ভাবনা-চিন্তার অবকাশ না নিয়েই কর্ণধারের কর্ণধারণ করবার জন্য লম্বকর্ণর মতোই বুদ্ধিহীন স্বামীর বুদ্ধিকে সঠিক পথে চালাতে মেয়েকে নিয়ে চ'লে এসেছিলেন যজ্ঞেশ্বর। স্থনির্মলের বিয়ের কথাটা শুনে অবধি অশান্তি বোধ করছিলেন মনে-মনে। সত্যি হোক মিথ্যে হোক খবর যখন একটা রটে তার কিছু-কিছু তো বটেই? চার বছর আগে যে-মন নিয়ে, যে-জেদ নিয়ে তিনি একদিন সকলের নাকের ডগায় তুড়ি মেরে মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন, চার বছরের প্রলেপে সে-ভালোবাসার স্রোতে ভাঁটা পড়েছে। বাপেরবাড়ি আছে, থাক। তাই ব'লে শ্বশুরবাড়ি যাবার রাস্তায় কাঁটা পড়ুক এটা কিছুতেই মনঃপূত হ'লো না। ইচ্ছেমতো যাবে আসবে, থাকবে কি থাকবে না। কিন্তু অধিকার তো তারই ষোলো আনা থাকা উচিত।

যজ্ঞেশ্বর প্রথমে এটাই ভেবেছিলেন যে স্ত্রীকে ফেলে বেশিদিন টিকতে পারবে না স্থনির্মল। সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, তার শরীরের লোভ তো আছেই, উপরন্তু একমাত্র কন্যার পৈতৃক বিত্তের মোহই কি খুব কম? আসতেই হবে। অকৃতদারের মতো শূন্য বিছানায় আর কতোদিন রাত কাটাবে বাছাধন? কিন্তু দিনের পর দিন গেল, না বিত্তের টানে, না স্ত্রী-দেহের লোভে, কিছুতেই যখন জামাই-এর টিকিটি আর দেখতে

পেলেন না, একটু যেন কেমন-কেমনই বোধ করছিলেন ভেতরে-ভেতরে। অমন তুরন্ত দজ্জাল বদ্ শাশুড়ির ঘর করতে কিছুতেই দেবেন না ব'লে যে-প্রতিজ্ঞায় অনেকদিন পর্যন্ত অটল ছিলেন, ইদানীং মনে হচ্ছিলো সে-প্রতিজ্ঞাটার ছিলেটায় যেন ঢিল পড়েছে। কেননা কিছুকাল যাবত কন্যার প্রতি ততটা স্নেহ আর অনুভব করছিলেন না মনের মধ্যে। সেই শিশু প্রমীলা, অসহায় প্রমীলা, পিতার প্রতিমূর্তি প্রমীলা ক্রমে যেন আরেকজন প্রমীলাতে পরিণত হ'য়ে উঠছিলো। কেননা প্রমীলা বড়ো হয়েছে, কূটনীতিতে পিতাকে ধ'রে ফেলেছে, গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজা করতে শিখে ফেলেছে। এ-সংসারে ব'সে, এ-সংসার থেকেই শুষে-শুষে গঠন করছে নিজের রাজত্ব। একলার রাজত্ব। তাই কিছুদিন যাবত মেয়েকে তাঁর এ-সংসারের পক্ষে একটু যেন ভার-ভারই ঠেকছিলো। মনের তলাকার কোন্ কোণ থেকে কে জানে এ-কথাটাই বারে-বারে উঠে আসছিলো তাঁর যে, বিয়ে হ'লেই তো মেয়ে পর, তার স্বার্থ আর তার বাবার স্বার্থ কোনোরকমেই আর একসূত্রে গাঁথা হ'তে পারে না। তবে কেন তাকে বসিয়ে-বসিয়ে বৃথাই আর ভাত-কাপড় দিয়ে পোষা। রাখালকে ভাত-কাপড় দিতে যে-কষ্ট হচ্ছিলো সেই কষ্টই যেন একটু কম তীব্র হ'য়ে যন্ত্রণা দিচ্ছিলো বুকের তলায়। তার ভাত-কাপড়ের পালা তো তিনি কবেই সাঙ্গ ক'রে দিয়েছেন, তার জন্যে এখন আর যজ্ঞেশ্বরের দায় কিসের, দায়ী এখন তার স্বামী। সুনির্মল। সে যদি তার বৌয়ের খরচ না দেয় তা হ'লে খোরপোশের জন্যে মামলা পর্যন্ত করতে পারে সে। মেয়ের সঙ্গে এ নিয়ে যে দু-চারদিন বেশ দু-এক হাত ছোটোলোকোমি হ'য়ে যায়নি তা-ও নয়। সুধাময়ী হায়-হায় ক'রে এসে বাপ-মেয়ের ঝগড়া থামিয়েছেন, ছি-ছি করেছেন, কপালে করাঘাত ক'রে ধিক্কার দিয়েছেন নিজের অদৃষ্টকে। প্রমীলার কান্নাকাটি চিৎকারে পাড়া-প্রতিবেশী জড়ো হয়েছে এসে।

ঠিক এমন দিনেই ঈশ্বর রাস্তা দেখালেন তাঁকে। এতদিন যে-দেমাক ক'রে মেয়েকে পাঠাননি, সেই দেমাক তাঁর ভাঙতে হ'লো না, কোনো অপ্রিয় কাজ করতে হ'লো না, নিজে থেকেই কেমন সব আপনা-আপনি ঠিকঠাক হ'য়ে চ'লে এলো হাতের মুঠোয়। এখন বোকা মেয়েটা তীরে এসে নৌকো না ডোবায়, ঝগড়াঝাঁটি ক'রে আবার না হাজির হয় গিয়ে তাঁর দমদমের বাড়িতে। নিজের সংসার নিজের স্বার্থ এখনো যদি না বুঝে নিতে পারে তবে আর পারবে কবে?

আর সেই কারণেই কিছুদিন পর্যন্ত এখানে থেকে যাওয়াটাই মনে-মনে সমীচীন মনে করছিলেন যজ্ঞেশ্বর। একটু স্থিতি হোক মেয়েটার, একটু অধিকারে আসুক সংসারের খুঁটিনাটি। শক্ত ক'রে হাল ধ'রে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার মতো সাহস হোক মনে, তারপর যাবেন তিনি। জামাই-এর মতিগতি ভালো না, বশ করতে হবে হিরণ্ময়ীকে; সাপ নাচাবার মন্ত্র আয়ত্ত করতে হবে তাঁর কাছ থেকে। তাই হিরণ্ময়ী যখন শ্রাদ্ধ পর্যন্তই থেকে যাবার একটা আমন্ত্রণ জানালেন এবং প্রমীলার মাকেও নিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন, বিনীত অনুনয়ে তৎক্ষণাৎ যুক্ত হস্তে আবক্ষ আনত হ'লেন যজ্ঞেশ্বর। নিশ্চয়ই। এখন তো তাঁর যাবার কথাই ওঠে না। এই অভিভাবকহীন কয়েকটি শিশুকে ফেলে, এমন শোকাতুরা হিরণ্ময়ীকে একা রেখে, পিতৃতুল্য তিনি, তিনি কি যেতে পারেন? ওরা শান্ত হোক, একটু প্রশমিত হোক হিরণ্ময়ীর শোকের তীব্রতা, তবে তো তাঁর ছুটি। তা ছাড়া অত বড়ো একটা কাজের ভারই বা কে বহন করবে যদি তিনিই না দাঁড়ান সুনির্মলের পেছনে? ছেলেমানুষ, কী জানে ও? কী করবে? কী পারবে? তবে প্রমীলার মাকে এনে হিরণ্ময়ীর মনোতুষ্টি করতে পারলেন না ব'লে আপসোস করলেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

সুধাময়ী যে কতো অযোগ্য— মনে-মনে ভাবলেন যজ্ঞেশ্বর— তা আর তিনি ছাড়া কে জানে? এখানে এসে সে কী বলতে কী বলবে, কী করতে কী করবে তার কি ঠিক আছে কিছু? ভেবেই আতঙ্কিত হ'লেন। হয়তো নিজের স্বামী আর নিজের মেয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাট করবে এদের সঙ্গে। ও-রকম একটা হতচ্ছাড়া মেয়েমানুষকে এনে কি গুটিয়ে-আনা জালটি শেষে হাত ফসকাবার অবকাশ দেবেন যজ্ঞেশ্বর? বললেন, 'উনি যদি ভালোই থাকবেন, আসবার উপযুক্তই থাকবেন তা হ'লে কি আর আমি আসি? একজন মেয়েমানুষের দুঃখ আরেকজন মেয়েমানুষেই ভালো বোঝে। কিন্তু কী করবো। আমার অদৃষ্টই মন্দ। এই সময়েই হঠাৎ আবার তাঁর শরীরটা খারাপ হ'য়ে পড়েছে একটু। বেশি-কিছু না, বরাবরই এই শীত পড়ি-পড়ি সময়টাতে ওঁর বাতের প্রকোপ হয় কি না?'

সব শুনে গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর করলো সুনির্মল।

২

চুকলো শ্রাদ্ধশান্তি। খুব একটা ঘটা করতে দিলেন না হিরণ্ময়ী। সুনির্মলও তা চাইলো না। এত বড়ো দুঃখের দিনে কোনো-একটা উৎসবের চেহারা ফুটুক বাড়িতে এটা তাদের মা-ছেলে দু-জনের পক্ষেই অসহ্য। খুব নীরবে, খুব গম্ভীর ভাবে, অতি অল্প লোক ডেকে সমাপ্ত হ'লো পারলৌকিক ক্রিয়া। একমাত্র মেয়ে রাজেনবাবুর, চোখের মণি, বুকের ধন, কিন্তু এমন দিনে ভাইদের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারলো না সে। থাকে বহু দূরে, সুদূর সিমলা পাহাড়ে, উপরন্তু আসন্নপ্রসবা, চিঠির পাতায় তার চোখের জল ছোঁয়া গেল।

তারপর এক সন্ধ্যায় যজ্ঞেশ্বর বললেন, 'এবার আমার যাবার পালা।'

প্রমীলা ঘরে এলো, শ্বশুরের মৃত পায়ের ছাপে মাথা ঠেকালো এসে। ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিলো চার পাশে। হিরণ্ময়ী মুখ নিচু ক'রে বসেছিলেন ঘরের এক কোণে, চোখ তুলে দেখলেন, আস্তে কাছে ডাকলেন তাকে, শেষে আঁচল থেকে চাবি খুলে সেই চাবি বৌয়ের আঁচলে বেঁধে দিলেন। দুই চোখে তাঁর ধারা নামলো। না, আর নয়, আর-কোনো বন্ধন নয় সংসারের। যার সংসার সে-ই এখন বুঝে নিক সব, সবই তো এখন তার। তবু যে সে এসেছে এই দুঃখের দিনে, দেখছে, শুনছে, করছে— তার মতিগতি ফিরিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর এই তো কতো ভাগ্য। যজ্ঞেশ্বর-বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই দুঃসময়ে নিজের কাজকর্ম ফেলে অসুস্থ স্ত্রী ফেলে আপনি আমার জন্য যা করলেন তার জন্য আমি চিরঋণী রইলাম।' যজ্ঞেশ্বর গ'লে গেলেন শোকের আবেগে। বলবেন কী? কথা বলতে যে তাঁর গলা বুজে আসে। আর তাঁর মেয়ে প্রমীলা সেই চাবিসুদ্ধু আঁচল গলায় জড়িয়ে প্রণাম করলো শাশুড়িকে।

তার দু-এক দিন পরে রাত্তিরে শুতে যাবার আগে মা-র কাছে এসে বসলো সুনির্মল। হিরণ্ময়ী শুয়েছিলেন, মুখ তুলতেই একটু ইতস্তত ক'রে সুনির্মল বললো, 'ভদ্রলোক তো শুনছি কাল যাচ্ছেন।'

'কোন্ ভদ্রলোক?'

'যজ্ঞেশ্বর কন্ট্রাকটরের কথা বলছি।'

'যজ্ঞেশ্বর কন্ট্রাকটর!' ভৎর্সনার দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে হিরণ্ময়ী বললেন, 'গুরুজন সম্বন্ধে এ-ভাবে কথা বলা তোর উচিত না, সুনু।'

'গুরুজন!'

'গুরুজন না?'

'তা' কী বলতে হবে তাকে?'

'সকলে যা বলে।'

'আমি যদি তা না বলি ?'

'অন্যায় হবে।'

'অন্যায় !' ঠোঁট বাঁকিয়ে একটা বিদ্রূপের হাসি বিচ্ছুরিত করলো স্থনির্মল, তারপর বললো, 'যাক সে-কথা। প্রমীলা নাকি থাকবে শুনছি ?'

'থাকবে না তো কোথায় যাবে ?'

'যেখানে যাবার।'

একটু বিরক্ত হ'লেন হিরণ্ময়ী, 'কী আবোল-তাবোল বকছিস। নিজের ঘর-সংসার ফেলে কি ওকে তুই চিরকালই বাপেরবাড়ি প'ড়ে থাকতে বলিস ?'

'তুমিও কি তাই বলো না ?'

'কক্ষনো না !' হিরণ্ময়ীর গলা ঈষৎ চ'ড়ে উঠলো, 'আমি তো তার হাতেই সব ভার তুলে দিয়েছি। এই ছাখ্—' কাঁধ থেকে তিনি শূন্য আঁচল তুলে দেখালেন, 'তুই মনে করিস না, স্থনু, ওটা আমার শুধু চাবি। ওটাই আমার যথাসর্বস্ব।'

'যথাসর্বস্ব মানে ? তোমার গয়নার বাক্স কোথায় ? সিন্দুকের চাবি ?'

'সব আমি বুঝিয়ে দিয়েছি তাকে। খোকা, আমার জীবনে আর কী আছে ? তোরা স্থখী হবি, এই তো একমাত্র আশা, তোরাই তো সব, তোদেরটাই তোদের দিয়ে দিলাম।' দুই চোখ চকচকে হ'য়ে উঠলো তাঁর। স্থনির্মল গুম হ'য়ে ব'সে রইলো। একটু পরে নিশ্বাস নিয়ে বললো, 'ভালো করোনি।'

'কেন ?'

'সে এখানে থাকতে পারে না।'

'তার মানে তুই ওকে তাড়িয়ে দিবি ?'

'কোনোদিন কি দিয়েছিলাম? তখন তো থাকেনি, এখন কেন এলো?'

'ছেলেমানুষ ছিলো, বুদ্ধি কম ছিলো, এখন বয়েসের সঙ্গে-সঙ্গে বুঝেছে সব, এসে হাল ধরেছে সংসারের।'

'হ্যাঁ, হাল ধরতেই ও এসেছে!'

'তাতে তোমার আপত্তি কী?'

অসহিষ্ণু হ'য়ে সুনির্মল বললো, 'শুধু আমার আপত্তির কথাই উঠছে না, মা, তোমার আপত্তিও উঠবে ক'দিন পরে। কিন্তু তখন কোনো উপায় থাকবে না।'

'আমার আপত্তি?' ব্যথিত গলায় হিরণ্ময়ী বললেন, 'আমি ওর সঙ্গে বনিবনাও ক'রে থাকতে পারবো না এ-কথাই কি বলতে চাস তুই?'

'ও যদি তোমাকে আর মান্য না করে?'

'তুই কি জানিস না যে ও আমাকে কী অসম্ভব ভয় করতো?'

'সেদিন তো আর নেই।'

'না, তখনকার চাইতে ও ভালো হয়েছে, বুদ্ধিসুদ্ধি হ'য়ে মানুষ হ'য়ে এসেছে। বুঝতে শিখেছে আমি ওর ভালো ছাড়া মন্দ করতে পারি না।'

'হুঁ।'

'তা তোমার কী ইচ্ছে?' একটু উষ্ণ হ'লেন হিরণ্ময়ী, 'তোমার বাবা যাকে এত সমাদরে ঘরে এনেছিলেন, বিনা অপরাধে আমি তাকে ফেলে দিই? না, সুনু, আমি তা পারবো না, পারবো না, আজ দেড় মাসও গত হয়নি তিনি গিয়েছেন—'

'থাক, মা।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঐ-প্রসঙ্গ চাপা দিতে চেষ্টা করলো সুনির্মল।

'আচ্ছা, তুই-ই বল,' সজল চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন হিরণ্ময়ী, 'তখন যদি ও এ-রকম থাকতো তা হ'লে কি আর আজকের দিনে এ-সব কথা উঠতো? আমি জানি ও তোর যোগ্য নয়, কিন্তু ওকে তুই যোগ্য ক'রে নে। ও এখন একেবারে বদ্‌লে গেছে।'

একটু হাসলো সুনির্মল।

'এ-কথাটা তুমি ভালো ক'রে জেনে রাখো মা, ও যদি না বদলাতো, আজকের দিনের মতো না হ'তো, তা হ'লেও ওকে সহ্য করা সম্ভব হ'তো। কিন্তু আজকের দিনে ও একান্ত অসহ্য।' উঠে দাঁড়ালো সে, তারপর মা-র তেলহীন রুক্ষ এলোমেলো জট-পাকানো চুলের উপর আস্তে হাত বুলিয়ে দিয়ে চ'লে যেতে-যেতে নরম গলায় বললো, 'সবাই কি মা তোমার মতো?'

সুনির্মল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে স্তব্ধ হ'য়ে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন হিরণ্ময়ী। শকুন্তলাকে মনে পড়লো তাঁর। ওর চোখ মুখ চুল নাক হাত পা, সব তিনি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ভাবতে লাগলেন। প্রমীলার উপর এই বিরূপ ভাব কি আগেও ছিলো সুনির্মলের? শকুন্তলাকে দেখার আগে? ভালো ক'রে মনে করতে চেষ্টা করলেন। না কি এ-জন্যেও হিরণ্ময়ীই দায়ী? ঐ মেয়েটিকে কে এনে তার চোখের সামনে তুলে ধরেছিলো? তিনিই তো। দিনের পর দিন কী ইচ্ছেশক্তি তিনি প্রয়োগ করেছিলেন? এই, এই ইচ্ছে। একমাত্র এই ইচ্ছে যে শকুন্তলাকে সাগ্রহে গ্রহণ করুক সুনির্মল। মা-র সেই ইচ্ছে পূর্ণ করবার সাধ যেদিন টলমল ক'রে উঠলো ছেলের বুকের মধ্যে, তক্ষুনি আবার অন্য পার্ট নিতে হ'লো তাঁকে। এ কী রকমের খেলা তাঁকে দিয়ে খেলাচ্ছেন বিধাতা? এ তিনি কী করছেন? মা হ'য়ে ছেলের জীবনে কী গভীর দুঃখ তিনি ডেকে আনছেন বারে-বারে? হে ঈশ্বর, কেন এমন হ'লো? কেন এমন হ'লো?

কিন্তু তিনি কী করবেন? তিনি কি জানতেন এমন দুর্ভাগ্যের অন্ধকার এমন অতর্কিতে ঘনিয়ে আসবে তাঁর ভরা জীবনের সুখে? জানতেন কি যে প্রমীলা এসে দাঁড়াবে তাঁর দরজায়? এমন ক্ষমাপ্রার্থী হ'য়ে? অবনত হ'য়ে? তবে তিনি কী করবেন? একজন মেয়ে হ'য়ে আর-একজন মেয়েকে কেমন ক'রে তাড়িয়ে দেবেন তার স্বামীর গৃহ থেকে, স্বামীর আশ্রয় থেকে? এ-পাপ তিনি কেমন ক'রে করবেন? স্বামী কী, স্বামী কতোখানি, তা তো আজ মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করছেন। প্রমীলা যত অযোগ্যই হোক, যত বোকাই হোক, তবু তো একদিন সুনির্মল তাকে সেই মর্যাদা দিয়েই এনেছিলো এই ঘরে? সুনির্মল আবার বিয়ে করলে ওর জীবনে কী থাকবে আর? অবমাননা আর লাঞ্ছনা ছাড়া কী জুটবে ওর? কেন বোঝে না সুনির্মল?

আর, শুধু কি সুনির্মল? বিনুও বুঝলো কই তাঁর কথা? বিনু রাগ করেছে, অভিমান করেছে, অসম্মানিত বোধ করেছে ওর ননদকে এ-ভাবে প্রত্যাখ্যান করবার জন্য। পাকে-প্রকারে সে তো বারে-বারে এ-কথাটা বলবার চেষ্টাই করেছে যে বৌয়ের প্রতি হিরণ্ময়ীর যদি এতটাই দরদ ছিলো যে দেখামাত্রই গ'লে যাবেন, ভুলে যাবেন, তবে কী দরকার ছিলো অতখানি অগ্রসর হবার? প্রমীলা আর কোনোদিন এ-সংসারে আসবে না, এলেও জায়গা পাবে না— এই নিঃসংশয় আশ্বাসেই না বিনু তার ননদের এত বড়ো সর্বনাশটা করতে পারলো, এমন অবাধে মেলামেশা করতে দিয়ে ওর মন ভেঙে দিলো। সেই ক্ষোভে এত বড়ো দুঃখের দিনেও তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে সে। আসে না, ভালো ক'রে কথা বলে না, কুন্তীটাকে পর্যন্ত একদিন আসতে দেয় না। আহা, কুন্তী। কুন্তীকে নিয়ে কি হিরণ্ময়ীরই কম সাধ ছিলো? কম আকাঙ্ক্ষা ছিলো! অমন সুন্দর, অমন মিষ্টি একটা মেয়ে কি তিনি আর দেখেছেন কোথাও? কী

করবে স্থনির্মল ? এ হচ্ছে বিধাতার নির্বন্ধ। এই বন্ধন ছিন্ন করবে এমন শক্তি কি মানুষের আছে ? তা নইলে কেন এমন হবে ? কেন ? কেন ? কেন ?

বুকের উপর করাঘাত করতে-করতে উপরের দিকে তিনি হিংস্রভাবে তাকালেন। দাঁতে দাঁত নিষ্পেষণ ক'রে কার কাছে যেন জবাবদিহি খুঁজলেন উত্তাল চোখে।

ততক্ষণে স্থনির্মল উঠে এসেছে দোতলায়। ধীরে-ধীরে, শিথিল পায়ে। প্রায় টলতে-টলতে। ক্লান্তি। অসম্ভব ক্লান্তি। নিজের শরীরের ভারটা বহন করাও কতো ক্লেশকর।

অনেক ঘুরেছে সারা দুপুর, সারা বিকেল। আজ শনিবার। পিতার মৃত্যুর পর থেকে এই একেকটি শনিবার একেকটি তপ্ত শলাকা নিয়ে আসে স্থনির্মলের জীবনে। এই শনিবারকে সে সহ্য করতে পারে না। যদি-না উন্মাদ হ'য়ে যায় আমৃত্যু এই বারটি মনে থাকবে তার। এই শনিবারে সে আপিসে টিঁকতে পারে না, ঘরে ফিরতে পারে না। আজও যখন অসময়ে আপিস থেকে বেরিয়ে কী করি কী করি ভাবছিলো, ভাবতে-ভাবতে প্রচণ্ড রোদ্দুরে অহেতুক ঘুরে বেড়াচ্ছিলো কার্জন পার্কের এ-মাথা ও-মাথা, এসপ্ল্যানেডের স্টলে, হঠাৎ সব সংযম, সব বুদ্ধি, সব শক্তি কোথায় যে ভেসে গেল তার। একবার ভীষণ, ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করলো কুন্তীকে, কুন্তীর নরম মুখটা ছুঁতে ইচ্ছে করলো চোখ দিয়ে। এই একমাস পাঁচদিনের মধ্যে আর ছাখেনি তাকে। সে আসেনি। কেন আসেনি, কেন তাকে আসতে দেয়নি বিন্থ, সবই জানে। তবু, সব লজ্জা ভাসিয়ে, সব কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে, একবার, মাত্র একবার দেখবার জন্য অধীর হ'য়ে উঠলো প্রাণ। মনে হ'লো এই দেখা করাটাই যেন এখন

তার জীবনের, তার বেঁচে থাকবার একমাত্র লক্ষ্য। কিছুতেই, কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারলো না সে। তারপর কখন ট্র্যামে চড়লো, কখন নামলো, কখন টোকা দিলো নির্দিষ্ট বাড়িটির দরজায়, কিছুই যেন বুঝতে পারলো না। আর টোকা দিয়েই ধ্বক্ ক'রে উঠলো বুকের ভেতরটা।

নিঃঝুম দুপুর। চুপচাপ বাড়ি। সুনির্মলই তিন মাস আগে খুঁজে-খুঁজে বার ক'রে দিয়েছিলো এই নির্জন পাড়ায় সুন্দর বাড়িটি। সুনন্দরা যখন প্রথম আসবে ব'লে চিঠি লিখেছিলো একটা বাড়ি খুঁজে দেবার জন্য, গা করেনি সুনির্মল। ভাগ্নির জন্য অস্থির হ'য়ে রাজেনবাবু আর হিরণ্ময়ীই হাঁটাহাঁটি ক'রে পনেরো দিনের মধ্যে একটা ফ্ল্যাট ঠিক ক'রে বাড়ি এলেন। গঙ্গার ধারে, কালিঘাটের এক ঘিঞ্জি পাড়ায়। কিন্তু কী করা? অত অল্প সময়ে এর চেয়ে আর ভালো পাবেন কোথায়?

তারপর চার মাস পরে এই বাড়ি। মাথা ঝাঁকিয়ে কুন্তী বলেছিলো, 'ভারি কাজের মানুষ, একটা বাড়ি খুঁজে দিতে পারে না।' সেই ঘিঞ্জি বাড়ির ছোট্টো ঘরে ব'সে সুনির্মল বলেছিলো, 'বললেই পারি।' বিন্দু টি-পটে চায়ের পাতা দিতে-দিতে বললো, 'মাগো, কী মিথ্যুক তুমি! বলিনি? বাড়ির জন্য তিন-তিনখানা চিঠি লিখেছিলাম। মামীমা জবাব দিলেন, সুনুকে ব'লে-ব'লে হয়রান, সে বলে বাড়ি নেই কলকাতা শহরে। আর অভি, সীমন্ত যে-সব বাড়ির খোঁজ আনে সে-সব বাড়িতে পাতিয়ালা কিংবা বর্ধমান কিংবা কুচবিহার ইত্যাদিরাই থাকতে পারেন, অতএব তোমার মামা আর আমিই আজকাল বেরুচ্ছি খোঁজে।' সুনির্মল হাসতে লাগলো, 'দাও, চা দাও শিগ্গির। তোমাদের বাড়ি এলেই কেবল কাজের ফরমাশ। যেমন তুমি, তেমনি তোমার ননদটি। আর আমি আসবো না।'

'তার আগে অনুগ্রহ ক'রে বাড়িটা খুঁজে দেবেন।' শকুন্তলা হেসে তাড়াতাড়ি চিরুনি চালাতে লাগলো ঘন চুলে। বন্ধুর বাড়ি যাবে।

'আর তার আগে বন্ধুর বাড়ি যাওয়া স্থগিত রেখে মহিলাটি কি অতিথিকে একটু মান-মর্যাদা দেবেন?' সুনির্মল অন্য দিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীর-সম্ভীর হ'য়ে চেয়ারে হেলান দিলো। প্রায় মাননীয় অতিথির মতোই দেখালো তাকে। কুন্তীর গালে টোল পড়লো। তারপর রেখে দিলো চিরুনি।

ধড়াচুড়ো প'রে সুনন্দ ফিরলো কোর্ট থেকে। 'আরে, ব্যাপার কী! আপনি যে।'

'শনিবারও তোমাকে পাঁচটার সময় ফিরতে হয় নাকি, সুনন্দ?'

'তা ফিরবে না?' বিনু তেবচা চোখে স্বামীর দিকে দৃষ্টিবাণ হানলো, 'ওঁকে যে আজকাল কোর্ট একটা নতুন কাজে বহাল করেছে, সুনুদা।'

সুনন্দ গলার ফাঁস খুলতে-খুলতে হাসলো, কুন্তীও হেসে উঠলো। বোঝা গেল একটা পুরোনো রসিকতা আছে ওদের মধ্যে। সুনির্মল বললো, 'কী কাজ?'

'কোর্টের ধুলো ঝাঁট দেওয়া, দরজা জানালা বন্ধ করা, দরজায়-দরজায় তালাচাবি লাগানো—'

এবার সুনির্মলও হেসে উঠলো।

৩

আস্তে দরজা খুলে দিয়ে চুপচাপ কখন এসে থমকে দাঁড়িয়েছে শকুন্তলা, অন্য দিকে তাকিয়ে ভাবতে-ভাবতে খেয়ালই করেনি সুনির্মল। সহসা চকিত হ'য়ে চোখ ফেরালো। তারপর স্তব্ধ রইলো একটু-সময়।

শকুন্তলাও নিঃশব্দ রইলো খানিকক্ষণ, সহসা সুনির্মলের মুণ্ডিত

মাথার দিকে তাকিয়ে মনে প'ড়ে গেল রাজেনবাবুকে। অন্ত সব-কথা ছাপিয়ে মুহূর্তের জন্ত সেই মানুষটিই হৃদয়ের সমস্তটা অংশ আচ্ছন্ন ক'রে রইলো, কেমন ক'রে উঠলো বুকটা। একটু পরে মৃদু গলায় বললো, 'বৌদি বাড়ি নেই।'

'তুমি তো আছো।'

ঠাট্টার ছুতোয় সুনির্মল অনেক সত্য কথা ঠিক এমনি ক'রেই অনেক-বার বলেছে, আর তার জবাবও পেয়েছে তৎক্ষণাৎ। কিন্তু আজকের স্বরে ঠাট্টা ছিলো না, আনন্দ ছিলো না, হয়তো কেবল সত্যটাই ফুটে উঠেছিলো নগ্ন হ'য়ে। ও-পক্ষ থেকে জবাব এলো না কোনো। শকুন্তলাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে এসে বসলো সে। 'সুনন্দও ফেরেনি, না?'

'না।'

'এক-গ্লাশ জল দেবে?' রুমাল বার ক'রে কপালের ঘাম মুছলো, চুলের অভাবে তেতে-ওঠা মাথায় হাত বুলোলো, 'পাখাটা চালিয়ে দাও তো।'

পাখা চালিয়ে দিয়ে জল নিয়ে এলো শকুন্তলা।

কী গরম! কী অসহ্য তাপ দুপুরের! দরজা-বন্ধ ঠাণ্ডা ঘরে, ঠাণ্ডা হাওয়ায়, ঠাণ্ডা জলে, চন্দনের মতো শীতল মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে সেই তাপ যেন চোখের জল হ'য়ে গ'লে পড়তে চাইলো।

'কেমন আছো?'

'ভালো।'

'খুব পড়ছো?'

'না।'

'কেন?'

'মন লাগে না।'

একটু চুপচাপ।

হর্ন টিপে ট্যাক্‌সি চ'লে গেল একটা, কয়েকটা রিক্‌শ গেল, কান্নার মতো শোনা গেল ফেরিওলার ডাক। সুনির্মল আকুল চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলো শকুন্তলাকে।

'বোসো না।'

'ঠিক আছি।'

'তুমি কি আমাকে চ'লে যেতে বলছো?'

'বাঃ, তা কেন?'

'তবে দাঁড়িয়ে আছো কেন? তাড়াতাড়ি বিদায় দেবার জন্যেই তো?'

দেয়ালের ঠেসান থেকে স'রে এসে দূরে চেয়ারে বসলো শকুন্তলা।

'কুন্তী!'

'বলুন।'

'আমি এসেছি ব'লে রাগ করলে তুমি?'

'রাগ? রাগ কিসের।'

'আমার আসা উচিত হয়নি। আমি জানি। কিন্তু— কিন্তু—'

'ও-সব কেন বলছেন? আসবেন না কেন? বা রে—' একটু হেসে খুব সহজ ভঙ্গি করলো কুন্তী, কিন্তু গলা ধ'রে এলো তার।

'কতোদিন তোমাকে দেখি না, আজ মনে হ'লো—'

কুন্তী হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। 'চা খাবেন?'

'না।'

'কেন খাবেন না? আপিস থেকেই আসছেন তো?'

'তুমি বোসো।'

'অতিথিকে যথোচিত সৎকার না করলে অধর্ম হয় জানেন তো! বিশেষ কুটুম্ব মানুষ।' হাসলো সে।

'বোসো।'

আবার ব'সে পড়লো কুন্তী।

'সুনন্দ নাকি বদ্‌লি হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কবে যাচ্ছে?'

'এ-মাসেই।'

'বিনু?'

'বৌদিও যাচ্ছেন।'

'তুমি?'

'আমিও।'

'তুমিও!'

কুন্তী মাথা নিচু ক'রে রইলো, জবাব দিলো না।

'তোমার তো পরীক্ষা।'

'প্রাইভেট দেবো।'

'কেন, তুমি— তুমি কলকাতায় থাকো না!'

'আমি থাকবো? কোথায়?'

তাই তো! কোথায় থাকবে সে-কথা তো ভাবেনি সুনির্মল। বুকের নিশ্বাস দ্রুত হ'লো তার। তারপর চোখ তুললো।

আর সেই চোখে চোখ রেখে শকুন্তলার দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে এলো। যে-কথা গোপন করতে চেষ্টার তার অন্ত ছিলো না, যে-কথা এক যুগ কাটলেও সে ব'লে উঠতে পারতো না, যে-কথা ভাবতেও কান লাল হ'য়ে উঠতো, লক্ষ কথা বললেও যে-কথা ঠিক ক'রে বলতে পারতো না কোনোদিন, সেই সব কথা বলাবলি হ'য়ে গেল চারটি মিলিত চোখের মুহূর্তের দৃষ্টিক্ষেপে। তার চোখ থেকে টপ্‌টপ্‌ ক'রে জল গড়িয়ে পড়লো,

দুই হাতে মুখ ঢেকে ছুটে চ'লে গেল সে অন্য ঘরে। অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত পায়ে বেরিয়ে এলো সুনির্মল। তারপর রাস্তা।

হাঁটতে-হাঁটতে ধ'রে এসেছে পা, উঠেছে ট্র্যামে, কিংবা বাসে, ব'সে থেকেছে যতক্ষণ খুশি, তাবপর আবার নেমেছে, আবার উঠেছে। এই ক'রে-ক'রে গঙ্গার ঘাটে এলো সন্ধ্যাবেলা। দেখলো অন্ধকার আকাশের অসংখ্য তারা, জলের বুকে নৌকোগুলোর টিমটিম আলো। বাতাসে শীতের আভাস। ভালো লাগলো একটু। উটরাম ঘাটের দোতলায় এসে চা খেয়ে ঠাণ্ডা হ'লো মাথা, তারপর বাড়ি ফিরলো। আর বাড়ি ফিরেই নিবে-যাওয়া আগুনেব তেজ যেন দ্বিগুণ উত্তপ্ত হ'য়ে জ্ব'লে উঠলো বুকের ভেতরে যখন সে শুনলো কাল তার শ্বশুর যাচ্ছেন, কিন্তু শ্বশুরকন্যা থাকছেন কায়েমি হ'য়ে।

৪

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে সহসা রাগটা তার যেন মা-ব উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়লো। মা-র উপরেই অভিমান হ'লো। মা-ই যদি বৈরী তবে আর একা-একা কেমন ক'রে সে যুদ্ধ করবে এত বড়ো একটা শক্তির বিরুদ্ধে। সে যে ভদ্রলোক। প্রমীলা যে তার স্ত্রী। এই নিষ্ঠুর সত্যকে কেমন ক'রে অস্বীকার করবার মতো বল পাবে, ভরসা পাবে মা-র সহাযতা না থাকলে?

শেষের সিঁড়ি ক'টা উত্তেজনাতে খুব তাড়াতাড়ি অতিক্রম করলো। তারপর শোবার ঘরের দরজায় এসে থামলো একটু। দেখলো, পেছন ফিরে খাটের উপর ব'সে যজ্ঞেশ্বর যেন মেয়ের সঙ্গে কী-একটা গভীর পরামর্শে নিমগ্ন। তার পায়ের শব্দে দু-জনেই চমকে উঠলো। প্রমীলার

বাবা উঠে দাঁড়ালেন তাড়াতাড়ি, গায়ের এণ্ডি চাদরের তলায় (যে-চাদরটি তিনি শীতগ্রীষ্ম বারো-মাস ব্যবহার করেন) দুটো হাত মুড়ে নিলেন। সুনির্মলের মনে হ'লো, কী যেন একটা লুকোলেন সেই হাত ঢাকবার অছিলায়। 'এসো বাবাজী, এসো। কাল যাবো কিনা, তাই মা-র সঙ্গে দুটো কথা বলছিলাম। গোবিন্দ! গোবিন্দ। ক'টা দিন তোমাদের সঙ্গে কাটিয়ে কি আর যেতে মন সরে? ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে সুনির্মলকে কোনো কথা বলবার অবকাশ না-দিয়েই কেমন অস্থির হ'য়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। প্রমীলা ঝাড়া বিছানা আবারও ঝাড়তে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। একটু চুপ ক'রে থেকে সুনির্মল বললো, 'তা হ'লে তোমার বাবা কাল যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আর তুমি?'

'আমি কী?'

'তুমি যাচ্ছো না?'

'আমি কোথায় যাবো?'

'যেখানে যাবার?'

'সেখানে কি চিরকালই থাকবো নাকি?'

'কোথায় থাকবে?'

'আমার নিজের সংসারে।'

'তোমার নিজের সংসারে?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ।' মুচ্‌কি হাসলো প্রমীলা, 'স্ত্রীলোক বিয়ে হ'লে স্বামীর কাছেই থাকে। সেই তার ঘর, সেই তার সংসার।'

'হুঁ। এত কথা কার কাছে শিখলে? তোমার বাবার কাছে নাকি?'

'তা দিয়ে তোমার কী দরকার?'

'একটু আছে বৈ কি। এই পাঁচ বছর সে-শিক্ষাটা কোথায় ছিলো সেটা তো জানা দরকার?'

'আমার তখন বুদ্ধি ছিলো না, ছেলেমানুষ ছিলাম।'

'আর এখন বুঝি হঠাৎ বুদ্ধিমতী হ'য়ে উঠে বুঝতে পেরেছো অন্যদের লুটেপুটে খাবার সম্ভাবনাকে না ঠেকালে আর চলছে না, না?'

'আমার ঘর, আমার সংসার, পাওনা-গণ্ডাও আমারই। তা যদি বুঝে নিতেই আসি তা নিয়ে আবার এত কথা কিসের?'

'কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমাকেও তোমার বাবার সঙ্গে কাল এখান থেকে চ'লে যেতে হবে। একবার তো খুব জাঁক ক'রেই গিয়েছিলে, আমরা তো সেধে আনিনি—'

'ওগো তুমি কি সেজন্যে আজো রাগ ক'রে আছো?' হেসে গ'লে প'ড়ে গায়ে হাত দিলো প্রমীলা। সুনির্মল স'রে দাঁড়ালো।

প্রমীলা চোখ টান ক'রে প্রায় পাকা অভিনেত্রীর মতো যেন মুখস্থ পাঠ ব'লে গেল, 'তুমি স্বামী, ইহকালের পরকালের দেবতা, বলো দেখি তুমি রাগ করলে আমি দাঁড়াই কোথায়?'

সুনির্মল গলার টাই খুলে ব্রাকেটে লটকাতে-লটকাতে মুখ না ফিরিয়েই বললো, 'দাঁড়াবার জায়গা কোথায় তা আমি ব'লে দিতে পারবো না, সেটা তোমার বাবাকেই জিগ্যেস ক'রে দেখতে পারো। মোটমাট এখানে তোমার থাকা হবে না, হ'তে পারে না।'

'ও, থাকবার বুঝি অন্য লোক ঠিক আছে?' এবার ছিটকে মুখের সামনে এলো সে, 'বলো না, মন খুলে সে-কথাখানাই বলো না।'

সুনির্মল জবাব দিলো না। প্রমীলা হাত নাড়লো মুখের কাছে, চুকচুক করলো জিব দিয়ে, 'আহা-হা, বড়ো সাধে বাদ পড়লো গো, বাড়া ভাতে ছাই দিনু গো, ওগো আমার কী-হবে গো।'

সোজাসুজি তাকালো সুনির্মল, 'তোমার বাবা আমাকে দেখে ওরকম চোরের মতো পালিয়ে গেলেন কেন ?'

'পালিয়ে গেলেন ?' হঠাৎ থমকালো প্রমীলা, একটু যেন মিইয়ে এলো গলাটা, পরমুহূর্তেই সামলে নিলো, 'তার মানে ?'

'তার মানেটা আমি তোমাকেই জিগ্যেস করছি। ভেবেছিলাম তোমার বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আজ আমি শেষ কথা বলবো, কিন্তু—'

প্রমীলা বজ্জাত ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকালো, 'বাবা পালিয়ে গেলেন বলতে তুমি কী বোঝাতে চাও, শুনি ? আগে আমার সেই কথার জবাব দাও।'

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে স্থির চোখে অনেকক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সুনির্মল কঠিন গলায় বললো, 'আমি বলতে চাই তাঁর হাতে একটা এমন-কিছু ছিলো যেটা আমাকে দেখলে তাঁর লুকোতে হয়।'

'ওমা গো, কোথায় যাবো গো, কী মিথ্যেবাদী লোকের হাতে আমি পড়েছি গো, গুরুর গুরু মহাগুরু যে-বাপ তাকে নাকি জামাই হ'য়ে এই কথা বলে। ছি-ছি-ছি, আমার কেন গলায় দড়ি জোটে না, আমি কেন মরি না।' প্রায় আর্তনাদ ক'রে কেঁদে উঠলো প্রমীলা।

সুনির্মল বললো, 'চুপ।'

'চুপ তুমি করো, তোমার বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষ চুপ করুক। আমি আজ কিছুতেই চুপ করবো না।' বিলাপ ছেড়ে গর্জনে এলো, 'তোমার এত বড়ো আস্পর্ধা যে আমার বাবাকে তুমি চোর বলো ? তোমার মতো পঁচিশটা চাকর উনি পুষতে পারেন, জানো ?' কোমরে হাত দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো বলতে-বলতে, 'আর তুমি তাঁকে চোর বলো ? না, এর একটা হেস্তনেস্ত আমি করবোই করবো। বাবা, বাবা—' গলার স্বর চড়িয়ে ডাকতে-ডাকতে তীর বেগে দরজার দিকে এগিয়ে আসতেই

বাধা দিলো সুনির্মল, 'ছোটোলোকের মতো রাত-বারোটায় চ্যাচামেচি করলে ভালো হবে না ব'লে দিচ্ছি।'

'হ্যাঁ, আমি চ্যাঁচাবো, হাজার বার চ্যাঁচাবো, লক্ষ বার চ্যাঁচাবো, আমি কি ভয় করি কাউকে?'

'ভয়ের কথা নয়, ভদ্রতার কথা। এটা তোমাদের দমদমের বস্তি নয়, ভদ্রলোকের বাড়ি। এ-বাড়িতে কেউ কোনোদিন কথাও চেঁচিয়ে বলে না।'

'ওরে আমার ভদ্রলোক রে। তবু যদি খেমটি নাচিয়ে পাড়াসুদ্ধু লোকের থুতু না কুড়ুতে।' দুই পায়ের বুড়ো নখে ভর দিয়ে উঁচু হ'য়ে উঠলো সে, 'যে-লোক বিয়ে-করা বৌ বাপেরবাড়ি ফেলে রেখে মেয়ে-মানুষ নিয়ে ঢলাঢলি করে সে আবার ভদ্দর লোক! ওরে আমার! ঐ যে শোলোক আছে না, মাগ তাড়িয়ে মাগী চাই, মাগীর তুল্য মিঠা নাই। আসলে ভদ্দর লোকখানার মনের কথাটা তো এই? জানিনে? বুঝিনে?'

মাথার চুল টানলো সুনির্মল, অধীর হ'য়ে কানে আঙুল দিলো, তারপর সুইচ নিবিয়ে অন্ধকার ক'রে দিলো ঘর। তবু তো অন্ধকার। লজ্জায় ঘৃণায় তার মিশে যেতে ইচ্ছে করলো মাটির তলায়। দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রমীলার মুখ চেপে ধ'রে চাপা গর্জনে বললো, 'যদি চুপ না করো—'

এক ঝটকায় সেই হাত থাবড়া মেরে সরিয়ে দিলো প্রমীলা, 'কী করবে? মারবে? গলা টিপবে, বের ক'রে দেবে বাড়ি থেকে? বেশ তো, ভাখো না চেষ্টা ক'রে পারো কিনা।' তার নিশ্বাসপতনের সাঁই-সাঁই শব্দ সুনির্মলের বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটুতে লাগলো।

উল্টোদিকের দোতলা বাড়ির বারান্দায় ঝাপসা আলোয় মানুষের আভাস পাওয়া গেল একটুখানি। পাশের বাড়ির কোণের ঘরে একটা

আলো জ্ব'লে উঠলো খুট্‌ ক'রে। উদ্‌ভ্রান্ত সুনির্মল এবার দিশেহারা রাগে এক হ্যাঁচকা টানে প্রমীলাকে বিছানায় এনে ফেলে দিলো, পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে তার মুখে গুঁজে দিলো জোরে। একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ উঠলো কিছুক্ষণের জন্য, একটা চাপা গোঙানি, তারপর চুপ। গোঁ-গোঁ করতে-করতে ক্লান্ত জানোয়ারের মতো কী জানি কখন ঘুমিয়ে পড়লো প্রমীলা।

সুনির্মল হাত ঝাড়লো। মাথার এলোমেলো চুল উল্টে দিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে দেশলাই জ্বালিয়ে ছাতে এসে দাঁড়ালো চুপচাপ। তখনো তার পায়ের জুতো-মোজা, গায়ের সার্ট, কিছুই খোলা হয়নি। সেগুলো সুদ্ধুই কাটা গাছের মতো ধড়াস ক'রে লম্বা হ'য়ে পড়লো মাটিতে। তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে। এই অসংখ্য তারার মধ্যে তার বাবা আজ কোন্‌ তারা হ'য়ে ফুটে আছেন আকাশে? চেষ্টা করলো সেই তথ্য আবিষ্কার করতে। গালের দু-পাশ বেয়ে তপ্ত জলের ধারা নামলো। আবার তার অভিমান হ'লো হিরণ্ময়ীর উপরে। হিরণ্ময়ী যদি তার পক্ষে থাকতেন, তার দুঃখ বুঝতেন, তা হ'লে কি আজ এটা হ'তে পারতো? শুধু অভিমান নয়, বুকের মধ্যে যেন একটা প্রতিহিংসাও অনুভব করলো মা-র বিরুদ্ধে। হিরণ্ময়ী! হিরণ্ময়ীই তো তার এই অসহায় যন্ত্রণাময় অবস্থার জন্য আজ সর্বতোভাবে দায়ী।

৫

পরের দিন উষা-যাত্রা ক'রে চ'লে গেলেন যজ্ঞেশ্বর। তিনি দিনক্ষণ মানেন। এক মাস রইলেন, কাজেই যাবার আগে সুসময় দেখতে হয় বৈ কি। উষা-যাত্রায় কোনো দোষ বর্তায় না।

যাবার আগে ভোররাত্রিতে ফিসফিসিয়ে আরেক প্রস্থ উপদেশ

দিলেন মেয়েকে। বললেন, 'সামলে-সুম্‌লে চল্‌ একটু, একটু স'য়ে থাক্‌। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল কবে, এখনো রাতভোর যদি ঝগড়াঝাঁটি করবি তো শুবি কখন। আমি বাপ, আমি আর কতো তোকে ব'লে দেবো যদি তুই নিজে থেকে কিছু না বুঝিস। পুরুষমানুষ স্ত্রীর কাছে কী চায়? আমি তো রোজই দেখি, হয় ছাতে নয় মেঝেতে প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমুচ্ছে লোকটা। আরে বোকা! সবই তো তোর, কেবল এখন একটু চুপচাপ থাকা।'

প্রমীলা গাল ফুলোলো, 'তুমি তো ব'লেই খালাস। আমার সঙ্গে যে কেমন বিশ্রী ব্যবহার করে তা তো জানো না? না বাবা, এমন করলে এখানে থাকতে পারবো না আমি।'

'তা হ'লে কোথায় থাকবেন শুনি?' খিঁচিয়ে উঠলেন যজ্ঞেশ্বর, 'বিধবা মেয়ের মতো বারো-মাস বাপের ভাতই গিলবি কাঁড়ি-কাঁড়ি, না?'

এ-কথায় চোখে জল এলো প্রমীলার। যজ্ঞেশ্বরও অনুতপ্ত হ'লেন। আস্তে হাত রাখলেন মেয়ের মাথায়, 'তোর ভালোর জন্যই বলি। আপনার সংসার তুই আপনি বুঝে নিতে শেখ। একটু ধৈর্য ধ'রে থাক-না ক'দিন। একটা বাচ্চাকাচ্চা আসুক-না পেটে।'

যজ্ঞেশ্বর যখন গেলেন সবে ঘুম ভেঙেছে হিরণ্ময়ীর। দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে-আসতেই গাড়ি ছেড়ে গেল তাঁর। লজ্জিত হ'লেন হিরণ্ময়ী। কিন্তু এত সকালে, এত তাড়াতাড়ি, এমন ক'রে যে সকলের অলক্ষ্যে ভদ্রলোক চ'লে যাবেন তা কি তিনি জানতেন? প্রমীলা বললো, 'পাঁচটার ও-পিঠে গেলে ঊষা-যাত্রা ভঙ্গ হয় কিনা, তাই বাবা কারো সঙ্গে দেখাশুনো করতে পারলেন না।' হিরণ্ময়ী বললেন, 'ছি-ছি, আমার আগে-আগেই ওঠা উচিত ছিলো।'

এবার আঁচলে চাবি বেঁধে পুরো বেগে সংসার করতে লাগলো প্রমীলা। এই শোকার্ত শরীরে হিরণ্ময়ীকে কি কিছু করতে দিতে পারে সে? তবে তার পুত্রবধূত্ব রইলো কই? শাশুড়ির প্রতি কি এটুকু কর্তব্যও সে করবে না? হিরণ্ময়ীও স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে আপন দুঃখ নিয়ে আপনার মধ্যে নিমগ্ন হ'য়ে রইলেন। কালো-কালো বাদুড়ের ডানা পৃথিবীর অন্ধকার নিয়ে ঝুলে রইলো তাঁর চারদিকে। একটি মৃত মানুষের স্মৃতি ছাড়া আর সব শূন্য।

কিন্তু এর মধ্যেই একটা সাংঘাতিক চুরি ধরা পড়লো তাঁদের বাড়িতে। একদিন খবর এলো, একটি নাতি হয়েছে হিরণ্ময়ীর। মেয়ে আসন্নপ্রসবা হয়েছে পর থেকে মনে-মনে এ-নিয়েও একটা কম উদ্বেগে ছিলেন না তিনি। খবরটা পেয়ে কতোদিন পরে তাঁর বিষণ্ণ মুখে একটি মলিন হাসির আভা ফুটে উঠলো। কতো কাল পরে গুছিয়ে ব'সে দুপুরের নিরিবিলিতে একখানা মস্ত চিঠি লিখলেন মেয়েকে, তারপর প্রমীলার কাছ থেকে চাবি চেয়ে এনে সিন্দুক খুললেন। কতো সাধের প্রথম নাতি, ভারি হাতে সংবর্ধনা না জানালে কি চলে? দাদু বেঁচে থাকলে তো কতো ধুমধামই হ'তো আজ বাড়িতে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গয়নার বাক্স বার করতে গিয়েই ছাখেন সর্বনাশ। বাক্স তো নেই! চন্দন-কাঠের কাশ্মিরী-কাজ-করা জালি বাক্স। সিন্দুক খুললেই মন আকুল হ'য়ে উঠতো সেই গন্ধে। বিনুর বাবা মাইশোর থেকে উপহার এনে দিয়েছিলেন তাঁকে বিয়ের সময়। গন্ধটি এখনো লেগে আছে।

এলোমেলো হাতড়ালেন তিনি, তারপর বাইরে এসে দোতলার দিকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'বৌমা, ও বৌমা, শিগ্‌গির এসো তো একবার।'

চাবিটা শাশুড়িকে দেবার পর থেকেই প্রমীলা কেমন-যেন একটা

অস্বস্তির মধ্যে ছিলো। প্রতিদিনের অতি চমৎকার, অতি মস্থণ দিবা-নিদ্রাটিতে কেমন ব্যাঘাত অনুভব করছিলো মনে-মনে, শাশুড়ির ডাক শুনে আচমকা শিহরিত হ'য়ে উঠলো। একটু-সময় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো ঘরের মধ্যিখানে, তারপর আস্তে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। ঝুঁকে বললো, 'কেন মা ?'

'নিচে এসো, শিগ্‌গির এসো।'

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলো সে। ঘরের দরজায় এসে খোলা সিন্দুক আলমারির দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী হয়েছে ?'

'আমার গয়নার বাক্স কই ? সেই চন্দন-কাঠের বড়ো বাক্স ?'

'ওর ভেতরে নেই ?'

'কোথায় ? আমি তো কোথাও দেখছি নে।' কপাল তাঁর বিন্দুবিন্দু ঘামে ভিজে উঠলো, 'তুমি, তুমি তো কোথাও রাখোনি ?'

'না তো।'

'হায়! হায়। তবে কী হ'লো সেই বাক্স ?' মেঝের উপর আঁচল লুটিয়ে ব'সে পড়লেন তিনি। চোখ জলে ভ'রে উঠলো।

৬

রাজেনবাবুর চাকুরির টাকা প্রচুর খরচের খাতে ব'য়ে যেত ব'লে কিছু গোপন সঞ্চয় ছিলো হিরণ্ময়ীর। স্বামী-পুত্র দু-জনেই অপব্যয়ে উৎসুক। সহাস্যে তাদের সব-কিছুরই প্রশ্রয় দিতেন তিনি, কিন্তু তাদের হাতে হাত মিলোতেন না কখনো। মাইনে পেয়ে দু-জনেই এসে সব টাকা তুলে দিতো তাঁর হাতে, তিনি তার ভাগ-বাঁটোয়ারা যে-ভাবে খুশি করতেন, তাঁর উপরে হিসেব নেবার ছিলো না কেউ। একা রাজেন-বাবুই যথেষ্ট মাইনে পেতেন, তাতেই সচ্ছলভাবে সংসার চলতো, অন্তত

চালাতেন হিরণ্ময়ী। সুনির্মলের মাইনেটাতে প্রায় হাতই দিতেন না। লাইফ-ইনশিওর করিয়ে দিয়েছিলেন মোটারকমের। টুকটাক ঝি-চাকরের মাইনে, ছেলে-মেয়েদের জন্মদিনের উপহার, কোনো দরিদ্র আত্মীয়ের সাহায্য কিংবা দু-একটা শৌখিন খরচ ছাড়া সবই প্রায় জমতো গিয়ে ঐ ছোট্টো লোহার সিন্দুকের অন্ধকার গর্ভে। গয়নার বাক্সের সুবাস বিছানায় শুয়ে থাকতো তা'রা। ব্যাঙ্কে পাঠাতেন না, জানতেন, পাঠাতে গেলেই ছেলে আর ছেলের বাপ জেনে ফেলবে, আর জেনে ফেলার সঙ্গে-সঙ্গেই সে-টাকা কেমন ক'রে অন্তর্হিত হ'য়ে যাবে চোখের পলকে। কিছুতেই রোধ করতে পারবেন না হিরণ্ময়ী। পাঁচ-কোঠার বাড়ি ছেড়ে সাত-কোঠার বাড়িতে না গেলে শরীরে আরাম থাকবে না, এই মধ্যবিত্ত পাড়া ছেড়ে চৌরঙ্গির কাছাকাছি না গেলে মান থাকবে না, দু-জন চাকরে অকুলোন হবে, খাওয়া-দাওয়া পোশাক-পরিচ্ছদ সব-কিছুতেই আর অস্বাচ্ছন্দ্যের অবধি থাকবে না তাদের। অথচ এখন তো সুখেই আছে, কোনো অসন্তোষ নেই, কোনো খুঁতখুঁতানি নেই। দক্ষিণ-খোলা সুন্দর বাড়ি, বাপ-বেটা দু-জনেরই কতো পছন্দ এই বাড়ির আনাচ-কানাচ। চার বেলার খাওয়া-পরায় যথেষ্ট সচ্ছলতা, যথেষ্ট আরাম। হিরণ্ময়ী বাড়িটি রাখেন আয়নার মতো ক'রে, ঘরে-ঘরে রুচি-সম্পন্ন নিচু-নিচু যার-যার সুবিধেমতো তার-তার প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র। ছেলেরা সব ভালো-ভালো স্কুল-কলেজের ছাত্র, মেয়েটিকে ডায়োসেসনে পড়িয়েছেন, বড়ো ওস্তাদ রেখে গান শিখিয়েছেন। কী দুঃখ? গাড়ি বাড়ি অবশ্য নেই। তা হবে। তার জন্যেই তো এই পন্থায় টাকা জমানো। কেবল কি আজকের ভাবনাই আজ? কাল আছে না? কালকের সঞ্চয় না করলে কি চলে?

সুতো বেঁধে-বেঁধে সেই সব নীলচে-নীলচে নোট গুচ্ছ-গুচ্ছ ক'রে

রেখে দিতেন ওখানে। কেউ জানতো না সে-খবর, কেউ দেখতো না। কে দেখবে? এ-বাড়িতে কার অত খেয়াল? রুপোর চেন-বাঁধা চাবি হিরণ্ময়ীর আঁচলেই ঝুলে থাকতো সারাদিন। এই সিন্দুকে কোন্ চাবি ঢুকিয়ে কী কৌশলে খুলতে হয় তা পর্যন্ত জানতেন না রাজেনবাবু। সুনির্মলের তো কথাই নেই। এই লোহার আলমারী সিন্দুক তাদের পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত হ'য়ে এসেছে। দেশ থেকে কতো কাণ্ড ক'রে তিনি এটিকে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতার বাড়িতে। তাই নিয়ে কতো চ্যাঁচামেচি করেছিলেন রাজেনবাবু। হিরণ্ময়ী শোনেননি। শাশুড়ির সমর্থন ছিলো পেছনে, তবে আর তাঁর ছেলেকে ভয় কিসের?

চাবির এই এক-আঙুল মোটা রুপোর গোটও কি আজকের? কতো আঁচল ঘুরে তবে তো হিরণ্ময়ীর আঁচলে এসে পৌঁচেছে। চোদ্দ বছর বয়সে এসেছিলেন এই সংসারে, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হ'লো। এ কি একদিন দু-দিনের কথা? একদিন দু-দিনের স্মৃতি? কতো মানুষ দেখেছেন, কতো মানুষকে ভালোবেসেছেন, বিদায়ও দিয়েছেন কতো মানুষকে। শ্বশুর গেছেন, শাশুড়ি গেছেন, তাঁদের সবচাইতে বড়ো মেয়েটি, বিনুর মা, তিনি গেছেন। প্রত্যেকের মৃত্যুতে বুক ভ'রে গেছে কান্নায়। মনে হয়েছে, যিনি গেলেন কে আর পূরণ ক'রে দেবে তাঁর জায়গা? তা তো সত্যিই! কে কা'কে ভরাট করতে পারে? আস্তে-আস্তে তো সবই হ'লো। সুনু হ'লো, অভি হ'লো, মানু জন্মালো, সীমন্ত এলো। শিশুদের কাকলিতে ভ'রে গেল ঘর, মা হ'য়ে ঠাণ্ডা হ'লো বুক, গিন্নি হ'য়ে মুঠোয় এলো সব, তবু কি তিনি ভুলতে পারলেন শাশুড়িকে? ছেলেদের পিতৃত্ব কি বাপের বা শ্বশুরের পিতৃত্বের আস্বাদ দিতে পারলো? না, কেউ কাউকে ঢেকে দিতে পারে না, মুছে দিতে পারে না। প্রত্যেকে তার আলাদা-আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে আলাদা-আলাদা কক্ষে ব'সে থাকে চুপচাপ। কোনো-

একদিন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় ঠিক সে মাথা নেড়ে জানিয়ে দেবে—'আমি ছিলাম, আমি ছিলাম।' অমনি হৃদয়ের অসংখ্য দরজার কোন্ দরজাটা যেন খুলে যাবে, বেদনায় কেঁপে উঠবে স্নায়ুতন্ত্রী। স্মৃতি। স্মৃতি। স্মৃতি অক্ষয়।

তবুও, তবুও এমন একজন ছিলেন হিরণ্ময়ীর জীবনে, যাঁর জন্য কোনো অভাবকে তো অভাব মনে হয়নি কোনোদিন। যখন আঠারো বছর বয়সে মা মারা গেলেন, মনে হয়েছিলো বেঁচে থেকে কী লাভ? তারপর সেই মানুষের বুকে মাথা রেখে শোক যেন অর্ধেক উপশমিত হ'য়ে গেল সেই মুহূর্তে। তারপর প্রথম সন্তানটিও মারা গেল একদিন। চার বছরের এইটুকু মোটাসোটা ফুটফুটে মনটুলি। সুন্তু তখন এক বছরের। সেই দুর্বিষহ শোকও তো ঐ একই মানুষের বুকের ঠাণ্ডায় জুড়িয়ে গিয়েছিলো। কী শান্ত, কী সুন্দর, কী স্নেহে ভরা, প্রেমে ভরা, উত্তাপে ভরা মানুষটি। তিনি তাঁর স্বামী। তিনি রাজেনবাবু। শুধু স্বামী? স্বজন না? গুরু না? বাপ, ভাই, কী-না তিনি? এই বাড়িতে এত সুখ কার জন্য তিলে-তিলে সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন হিরণ্ময়ী? জীবন এত মধুর ছিলো কার জন্য? কে তাঁকে এই সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছে, ভবা-জীবনের আস্বাদ তিনি কার জন্যে পেয়েছিলেন? কার জন্য এই সংসারে এত তৃপ্তি? এত শান্তি?

সব শোক আজ ঐ একই সমুদ্রে লীন হ'লো হিরণ্ময়ীর মনে। মনে পড়লো কোনো-এক গোধূলি লগ্নের কথা, কোনো পূর্ণিমারাত্রির নিরালা ছাতের কোণ, গুরুজন এড়িয়ে সিঁড়ির তলা, পুকুর-ঘাট! আরো কতো এলোমেলো স্মৃতি— অন্ত আছে তার? প্রত্যেক বিয়ের তারিখে একটি ক'রে আংটি উপহার দিতেন রাজেনবাবু। ছেলেমেয়েরা বড়ো হ'য়ে যাবার পরে কেমন একটা লজ্জা সংকোচ দু-জনেই অনুভব করেছেন ধীরে-ধীরে। তবু সেই উপহারের অভ্যেসটি ছাড়তে পারেননি তিনি। গোপনে এনে

গোপনে রেখে দিতেন বালিশের তলায়। গোপনেই গ্রহণ ক'রে সেটিকে আবার আপ্লুত হৃদয়ে লোহার সিন্দুকে তুলে রাখতেন হিরণ্ময়ী। তারপর কোনো-একটা উপলক্ষে পুরোনো আংটি ছেড়ে সেটিকে আঙুলে পরতেন, কেউ লক্ষ্য করতো না, কেবল চুরুটে টান দিতে-দিতে আড়চোখে তাকিয়ে দেখতেন রাজেনবাবু।

একত্রিশ বছরের একত্রিশটি আংটিও ছিলো সেই গয়নার বাক্সে। শেষ আংটিটি এই তো সেদিন এনেছিলেন রাজেনবাবু, এই তো সেদিন আঙুলে পরেছিলেন হিরণ্ময়ী, আর এই তো সেদিন শেষ আংটিটি খুলে রেখে দিলেন সিন্দুকে। বিধবা হবার পরেও হাতে ছিলো, সুনির্মল খুলতে দেয়নি ঐ একমাত্র আভরণ। পরে খুলে প্রমীলাকে দিয়ে রেখে দিলেন তিনি সেই বাক্সে জমিয়ে। বড়ো-বড়ো চোখে প্রমীলা বললো, 'এত আংটি? কার?'

হিরণ্ময়ী জবাব দিলেন না। মুখ ফিরোলেন দেয়ালে।

সেই আংটির কথা ভেবেও আজ হুহু ক'রে উঠলো প্রাণটা। গয়নাব মূল্য কি শুধু তার মহার্ঘতায়? ঐ একত্রিশটি আংটির জায়গায় আজ একত্রিশ হাজার আংটি পেলেও কি এই অভাবের কোনো পরিপূরণ হয়? তাঁর বিয়ের সময় শাশুড়ি দিদিশাশুড়ি তো ছিলেনই, শাশুড়ির দিদিমা পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন বহাল তবিয়তে। জমিদার-বাড়ির মেয়ে, টকটকে রং, সাতনরি হার দিয়ে পুতি-বৌয়ের মুখ দেখেছিলেন। দিদিশাশুড়ি মকরমুখ বারো-ভরির বালা দিলেন আর শাশুড়ি বৌ বরণ করলেন সেই আকবরী আমলের দশটি মোহর-গাঁথা নেকলেস দিয়ে। জা, ননদ, মামীশাশুড়ি, মাসীশাশুড়ি— বাড়ি জমজমাট। সবাই ভারি-ভারি সোনা দিলো। অত বড়ো বাড়ির একমাত্র ছেলে রাজেনবাবু, বৌয়ের আর অন্ত নেই আদরের।

হীরার কণ্ঠী, পাথরের চুড়ি, যশোম, হাতপদ্ম, মাথার সিঁথি, ভারল ঝুমকো— কী তিনি পাননি সেই সময়ে? একটা জিনিসও ভাঙেননি, ব্যবহার ক'রে পুরোনো ক'রে ফেলেননি। গা মুড়ে সোনা দিয়েছিলেন বাবা মা। তার উপরে শ্বশুরবাড়ির অত গয়না। কিন্তু সর্বদা ব্যবহারের হার-চুড়ি ছাড়া ও-সব গয়নায় হাত ছোঁয়াননি বোধ হয় দশ বছর। বৌ-অবস্থায় শাশুড়ি মাঝে-মাঝে পরিয়ে এখানে-ওখানে বেড়াতে নিয়ে যেতেন, বিয়ে বাড়িতেই অবিশ্যি বেশির ভাগ। তিনি গেছেন পরে চুকেছে সে-সব।

মাঝে-মাঝে গয়নাগুলো গ্যাখেন তিনি অবসর সময়ে। মনে পড়ে সকলকে। তাঁদের চেহারা চলন-বলন ব্যবহার সব ভেসে ওঠে চোখে। ভালো লাগে। যাঁরা নেই, তাঁরা ছিলেন— এ-কথা ভাবতে বড়ো ভালো লাগে। এজন্য, দরকার হ'লে, নতুন সোনা কিনে গয়না তৈরি করিয়েছেন তবু একটি জিনিস ভাঙেননি। আর কারুকলার দিক থেকে দেখতে গেলেও অত সুন্দর গয়না আজকাল তৈরি করতে পারে নাকি স্যাকরারা? এই তো সুনুর বিয়ে হ'লো, দিলেন তার বৌকে কিছু গয়না, কানের ঝাপটা-টা মানুর ভারি পছন্দ ছিলো, তাকে দিলেন সেটা। এর পরে অভি আছে, সীমন্ত আছে। সবাইকে তো দিতে হবে। ওগুলো তো ওদের আশীর্বাদ। ওগুলো ওদের ভালোবাসার জনের চিহ্ন। পূর্বপুরুষের সাক্ষী। মূল্যেও নয় জৌলুসেও নয়, সোনার ওজনেও নয়, শুধু স্মৃতি, স্মৃতিতেই সে-সব জিনিস মূল্যবান। আর এ কি একদিন দু-দিনের স্মৃতি? একদিন দু-দিনের কথা?

মাটিতে ব'সে খাটে মাথা গুঁজে ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে উঠলেন হিরণ্ময়ী। শুধু রাজেনবাবুই তাঁকে ছেড়ে গেলেন না, সকলকেই নিয়ে গেলেন সঙ্গে ক'রে। তবে এই কি তোমার ভালোবাসা?

৭

যথারীতি রাত ন'টায় আপিস থেকে ফিরে সোজা মা-র ঘরে ঢুকলো সুনির্মল। হিরণ্ময়ী শাদা কাগজের মতো নিষ্প্রাণ ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে ব'সে আছেন দেয়ালে ঠেসান দিয়ে। ঘরের ছোটো নীল আলোটা ছায়া ফেলেছে তাঁর মুখে। মৃত মুখ। হঠাৎ যেন চমকে উঠলো সে।

'সুনু, সব্বোনাশ হয়েছে—' কিছু জিগ্যেস করবার আগেই কেঁদে ফেললেন তিনি ছেলেকে দেখে।

সুনির্মল শঙ্কিত হ'লো— 'কী! কী হয়েছে?' বোনের কথাটাই তার মনে পড়লো আগে। তার শরীর ভালো ছিলো না আসন্নপ্রসবা হ'য়ে থেকে।

'গেছে, আমার সব গেছে।'

'কী? কী মা?' তার গলায়ও কান্না ফুটে উঠলো।

'লোহার সিন্দুক থেকে সর্বস্ব গেছে আমার।'

'চুরি? চুরি হয়েছে?'

'গয়নার বাক্সটা কোথাও নেই। সোনা-দানা, আমার সারা জীবনের সব সঞ্চয়, সব স্মৃতি—' গলা বন্ধ হ'য়ে এলো তাঁর।

বোনের বদলে গয়নার বাক্স চুরি হওয়াটা অনেক নগণ্য হ'লেও সেটাও কম শোকাবহ মনে হ'লো না সুনির্মলের কাছে। সে জানতো ঐ চন্দন-কাঠের বাক্সটির উপর তার মা-র অদ্ভুত একটা মমতা ছিলো, মোহ ছিলো। কতোদিন, কতো অবসরের মুহূর্তে সেটাকে তিনি খুলেছেন, দেখেছেন, ছুঁয়েছেন, যেন হারানো ভালোবাসার জনদের ফিরে পেয়েছেন ঐ এক-একটি গয়নায় হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে। ছেলেবেলায় মা-র পিঠে ঠেস দিয়ে ব'সে সে দেখেছে তাকিয়ে-তাকিয়ে। হিরণ্ময়ী হেসে আদর করেছেন, 'কী দেখছিস? ঠাকুমাকে? ন-পিসীকে? দাদা-

মণিকে ? আচ্ছা, তা হ'লে হাত দে, হাত দিলেই দেখবি কেমন ন'ড়ে ওঠে, কেমন টের পাওয়া যায় তাঁদের হাতের ছোঁয়া।' দুপুরের নিরালা ঘরে গায়ে গা লাগিয়ে ব'সেও ছমছম ক'রে উঠেছে বুক! আর তারপর বড়ো হ'তে-হ'তে ভয় দূর হ'য়ে কখন যে সে-জায়গায় তারও একটি মমত্ববোধ জেগেছে ঐ বাক্সটির উপর কে জানে। বুড়োছেলে, কতোদিন মা-র সঙ্গে আবদার করেছে সিন্দুক থেকে বাক্সটা খুলে দেখাবার জন্য। কল্পনায় কোন অতীতকে দেখতে পেয়েছে চোখের সামনে। মন উধাও হ'য়ে গেছে।

ব্যাকুল গলায় সুনির্মল বললো, 'কেমন ক'রে চুরি হ'লো? লোহার সিন্দুক থেকে কে নেবে? কে খুলতে পারে ওটা?'

এই ছোটো, কালো আলমারি সিন্দুকটি খোলবার যে একটা বিশেষ কায়দা ছিলো এবং এ-বাড়িতে হিরণ্ময়ী ছাড়া আর কারোরই যে জানা ছিলো না সে-কৌশল সে-কথা সুনির্মল জানতো। হিরণ্ময়ী কপালে করাঘাত করলেন, 'বরাত! সুনু, সবই আমার বরাত। বোধ হয় কাজের দিনই এ-কাণ্ডটি হয়েছে। কতো নতুন চাকর-বাকর এসেছিলো।'

'কী আশ্চর্য! চাকর-বাকর তোমার সিন্দুক খুলবে কেমন ক'রে?'

'হয়তো খোলা ছিলো। বৌমা ছেলেমানুষ, কখন হয়তো মনের ভুলে বন্ধ না ক'রেই—'

'বৌমা! প্রমীলা! প্রমীলা ওটাতে হাত দিতে গিয়েছিলো কেন? কে তাকে খুলতে বলেছিলো? কে তাকে খুলতে শেখালো?'

'দরকার-মতো তো ও-ই খোলে, ও-ই বন্ধ করে। কাজের দিন সব ভারই তো ওর উপর ছিলো। তোর বাবার শেষ মাইনের টাকাটাও সেদিন আমি ওকেই তুলে রাখতে দিয়েছিলাম।'

সুনির্মলের মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠলো।

'কখন হয়তো খুলে রেখে একটু এদিক-ওদিক গেছে—'

'হুঁ।'

'এখন, এখন আমি কী করি বল্ ?'

'করবার কিছুই নেই।' ভুরু কুঁচকে সহজ গলায় জবাব দিলো স্থনির্মল, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এদিকে প্রমীলা সারাদিন কেঁদে-কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেললো, ব'সে থাকলো শাশুড়ির কাছে। এবার আস্তে-আস্তে আঁচল থেকে চাবি খুলে হিরণ্ময়ীর পায়ের উপর রেখে দিলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে হিরণ্ময়ী বললেন, 'চাবি দিয়ে আর আমি কী করবো ? তুমি কেঁদো না, তোমার তো কোনো দোষ নেই। আমারই অদৃষ্ট।'

কালস্রোত সব-কিছুই ধুয়ে দেয়। কোনো গ্লানিই জ'মে থাকতে দেয় না, স্থায়ী হ'তে দেয় না। আস্তে-আস্তে সেই কালের প্রলেপ হিরণ্ময়ীর মনেও ছাপ ফেললো বৈ কি। শোকের পাগল-করা অবস্থাটা ধীরে-ধীরে কাটিয়ে উঠলেন তিনি। সত্যি বলতে, হয়তো সংসারের হাল-চাল লক্ষ্য ক'রে উঠতেই হ'লো তাঁকে। মন শক্ত ক'রে তাকালেন চারদিকে। তাকিয়েই আঁতকে উঠলেন। কিছু কি না-বুঝেছিলেন এই ক'মাসে? কিন্তু এতখানি বোঝেননি।

গয়নার বাক্স বা স্বামীশোক যতই অসহ্য হোক না কেন এ-অবস্থা যে তার চাইতে আরো অনেক অনেক বেশি যন্ত্রণাময়, আরো অনেক বেশি অসহনীয় সেটা অনুভব করতে এক মুহূর্তও দেরি হ'লো না। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, গয়নার বাক্সের মতো এ-সংসার থেকে তাঁর কর্তৃত্বও অপহৃত হয়েছে। এখানে, এই সংসারে হিরণ্ময়ী ব'লে আর কেউ নেই। বাক্স কে অপহরণ করেছিলো তা অবিশ্যি তিনি জানেন না কিন্তু তাঁকে বিচ্যুত করবার জন্ম যে প্রমীলাই বদ্ধপরিকর এটা প্রত্যক্ষ করলেন।

সংসারের সকল ভার তিনি স্বেচ্ছায় প্রমীলার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এমন কি দৈনিক খরচের দায়িত্বটিও হাতে রাখেননি। সুনির্মল মাইনে পেয়ে তাঁর হাতে এনে দিতো, তিনি দিয়ে দিতেন প্রমীলার হাতে। তিনি যে কেবল শোকের তীব্রতার জন্যই উদাসীন হ'য়ে সব ছেড়েছিলেন তাও নয়। করুক, নিজের সংসার নিজে বুঝে নিক, আন্দাজ-আক্কেল হোক, তাতে মায়া হবে, মমতা হবে, মন বসবে, সুখী করতে পারবে স্বামীকে, বুদ্ধিরও বিকাশ হবে সঙ্গে-সঙ্গে। কিন্তু তার ফল যে এই হবে স্বপ্নেও মনে আসেনি তাঁর।

এ নিয়ে প্রথম-প্রথম গোলমাল করেছে স্থনির্মল, বারে-বারে মা-র কাছে এনেই ফেলে রেখেছে ব্যাগ, বারে-বারেই ফিরিয়ে দিয়েছেন হিরণ্ময়ী। পিঠে হাত রেখে বুঝিয়েছেন ছেলেকে, এখনো কি তিনিই সব করবেন, করতে পারেন ? না-হয় ক'দিন এই সংসারের ঝামেলা থেকে স্থনির্মল রেহাই-ই দিলো তাঁকে। কয়েকদিন বিশ্রাম। এর পরে স্থনির্মল চুপ ক'রে গেছে, গুম হ'য়ে গেছে। প্রমীলার ব্যবস্থায় অস্থবিধে বোধ করেছে কিন্তু তা নিয়ে আর একটা কথাও বলেনি। মা যদি ছেড়ে দিতেই চান সব, তবে কী দরকার আর তাঁকে টানাটানি ক'রে। রাগ হয়েছে, দুঃখ হয়েছে, আর তারই প্রতিশোধস্বরূপ ধীরে-ধীরে সমস্ত সম্বন্ধ ছেড়ে দিয়েছে সে এ-বাড়ির সঙ্গে। অবিশ্যি নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক ক'রে নিতে, প্রমীলার সব কর্তৃত্ব মেনে নিতে অনেক আগুন জ্বলেছে তার মনে, দরজা-বন্ধ ঘরে অনেক কাদা ছিটাছিটি হয়েছে। তারপর আস্তে-আস্তে কখন জুড়িয়ে গেছে সেই তাপ। ভালো-মন্দ একাকার হ'য়ে গেছে জীবনে। শুধু একটা কেলেঙ্কারীর আতঙ্কেই সদাত্রস্ত হ'য়ে থেকেছে মন।

ঘুম ভেঙে উঠে কতগুলি অবশ্য করণীয় ক্রিয়াতে যতটুকু সময় লাগে তার বাইরে একদণ্ড সে টিকতে পারতো না বাড়িতে। সকাল আটটার মধ্যে পোশাক চড়িয়ে আপিসের জন্য প্রস্তুত। আর ফিরতে-ফিরতে রাত ন-টা। এটাই প্রমীলার পক্ষে সব চাইতে স্থখের হ'লো, স্থবিধের হ'লো। সারাক্ষণ সব দিকে নজর দিয়ে, মা-র পক্ষ হ'য়ে ভাইদের পক্ষ নিয়ে স্থনির্মল যদি ক্রমাগত লড়াই করতো, উদাসীন হ'য়ে নিজেকে এমন ক'রে সরিয়ে না নিতো তা হ'লে এত শিগ্‌গির এত দুর্ধর্ষ হ'য়ে ওঠা হয়তো তার সম্ভব হ'তো না। হয়তো এতখানি দুর্ব্যবহার করতে একটু অন্তত ভয় পেতো।

একে তো প্রমীলার এই সব ছোটোলোকোমি বুঝতেই অনেকটা সময় কেটে গিয়েছিলো হিরণ্ময়ীর, তার উপরে বুঝবার পরেও সে-বিষয়ে কথা বলতে এত সংকোচ হচ্ছিলো তাঁর যে অনেকদিন পর্যন্ত সহ্য করা ছাড়া অন্য উপায়ও খুঁজে পাচ্ছিলেন না কোনো। মনে-মনে রীতিমতো ছেলের উপরই রাগ হ'তো তাঁর। ভাবতেন, এ-সব নিয়ে সুনির্মলেরই তো কথা বলা উচিত স্ত্রীর সঙ্গে। তার প্রশ্রয়েই তো প্রমীলা এমন নির্লজ্জের মতো ব্যবহার করতে সাহস পাচ্ছে। বাপ নেই ব'লে সে কি তার মাকে একটু দেখবে না? মানুষ করবে না ভাইদের? শাসন করবে না স্ত্রীকে? তারপর একদিন মরীয়া হ'য়ে নিজেই মুখোমুখি দাঁড়ালেন, 'এ কী খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা বৌমা! অত বড়ো-বড়ো ছেলেদের পাতে এমন যা-তা দাও কী ক'রে?'

ক'দিন ধ'রে দিনে মাত্র একবার একবেলা ছুটি মাপা আতপের ভাত আর কাঁচকলা সেদ্ধ খেয়ে-খেয়ে খিদে নামক জন্তুটা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আরো দু-একবার পাক দিয়ে উঠছিলো তাঁর শূন্য জঠরে। ঘটি-ঘটি জল খেয়ে সেটাকে শান্ত রাখতে পারলেও ছেলেদের নালিশে তিনি কান না দিয়ে আর পারলেন না।

ভ্রু-ভঙ্গি ক'রে প্রমীলা জবাব দিলো, 'অত সকালে হ'য়ে ওঠে না, আমি কী করবো!'

'যাতে হ'য়ে ওঠে সেটাই দেখবে। আর ওরা তো এমন-কিছু সকালেও যায় না। অভির তো একেক দিন একেক সময়ে কলেজ, আর সীমন্তও দশটার আগে কোনোদিন যায় না।'

'পারি না যে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।'

কথার ভঙ্গিতে উত্তপ্ত হ'লেন হিরণ্ময়ী, 'দেখছি ব'লেই তো বলতে হ'লো। বেশ তো, যদি না-ই পারো তা হ'লে কাল থেকে খরচের

টাকা আমার ঘরে আমার হাতবাক্সেই রেখে দিয়ো। আমিই দেখবো সব।'

ঘাড় বেঁকিয়ে শাশুড়ির মুখের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে একটু-সময় তাকিয়ে রইলো প্রমীলা, তারপর জবাব দিলো, 'আপনি দেখলেই কি একখানা টাকা ভেঙে দু-খানা হ'য়ে যাবে! সাধ্যের অতিরিক্ত তো আর কিছু করতে পারবো না।'

'তুমি! তুমি করতে পারা না-পারার কে?' হিরণ্ময়ী একেবারে তাজ্জব হ'য়ে গেলেন কথা শুনে, 'আর সাধ্য অসাধ্যেরই বা জানো কী তুমি? ক'দিন তুমি এসেছো এ-বাড়িতে? আমি অনেকদিন চুপ ক'রে ছিলাম, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, এত ছোটো অন্তঃকরণ তোমার যে ছেলে দুটোর জন্য বিকেলে পর্যন্ত একটা খাওয়ার ব্যবস্থা করো না।'

'খায় না? ওরা বিকেলে খায় না?'

'কী খায়?'

'প্রত্যেকদিন চা খায়।'

'চা! চা আবার একটা খাবার! আর, কী চা তুমি দাও! এক টি-পট জলে এক-চামচে চা দিয়ে, একফোঁটা চিনি আর একফোঁটা দুধ মিশোলেই চা হয়? না কি সারাদিনের খিদে তাতে মেটে? ছাখো প্রমীলা, ছেলে আমার এত অযোগ্য নয় যে তার দুটি নাবালক ভাইয়েরও ভরণ-পোষণ করতে পারে না। এরকম খাওয়া ওরা কোনোদিন ভাবেনি, ভাবতে পারেনি।'

'কোনোদিন তো আর চিরদিন হয় না!'

'কী!'

'বাপের উপর যা চলে ভাইয়ের উপর তা চলে না।'

'কী? কী বললে?' জ্ব'লে উঠলেন হিরণ্ময়ী, 'তোমার আস্পর্ধা দেখছি—'

তাঁর কথা শোনবার জন্য প্রমীলা অপেক্ষা করলো না। সিঁড়ি বেয়ে সোজা দোতলায় উঠে গেল।

প্রথমটায় স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন হিরণ্ময়ী, তার পরে দ্রুত পায়ে, দ্রুত গতিতে, একটা আগুনের শিখার মতো তিনিও উঠে এলেন দোতলায়। এত! এতখানি! এতদূর গড়িয়েছে! ছেলের ঘরের সামনে এসে গলার মধ্যে সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে ডাক দিলেন, 'বৌমা।'

চুড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল, জবাব এলো না। এক-পা এগিয়ে তিনি আবার ডাকলেন। এবার ভেতর থেকে জবাব এলো, 'বলুন।'

'এদিকে এসো।'

কাঁধের উপর আঁচল তুলে দিতে-দিতে প্রমীলা এগিয়ে এলো দরজার দিকে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে হিরণ্ময়ী বললেন, 'আমার কথা না শুনেই যে তুমি উঠে এলে?'

শাশুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন কোনো অতীতের ভয় নেমে এলো প্রমীলার চোখে। মুহূর্তকাল চুপ ক'রে রইলো সে।

'বলো, বলো, কিসের জোরে তোমার এত বড়ো স্পর্ধা সম্ভব হ'লো? কোন্ সাহসে তুমি আমাকে অমান্য করতে সাহস পাও?' হিরণ্ময়ীর গলা তারের যন্ত্রের মতো কেঁপে-কেঁপে উঠলো।

'সাহসের কথা নয়—' প্রমীলা ততক্ষণে প্রস্তুত ক'রে নিয়েছে নিজেকে। এইরকম একটা বিরোধের মুখোমুখিই দাঁড়াতে চাইছিলো সে ক'দিন থেকে।

শুধু চাইছিলো না, ছটফট করছিলো। হিরণ্ময়ীর দু-দুটো জোয়ান ছেলে যে তার স্বামীর অন্নে পুষ্ট হচ্ছে এটা আর সইতে পারছিলো না সে।

আর, একটা বিধবাই কি কম আপদ নাকি ? যত কমই খাক, খায় তো। তাকে তো শুতেও দিতে হয় একটা ঘরে ? জায়গা জুড়ে থাকে না ? সুযোগ পেয়ে বরং খুশীই হ'লো। চোখ টান ক'রে বললো, 'যা ঠিক তাই বলেছি, এর বেশি আমি পারবো না।'

'কী পারবে না ?'

'এর বেশি খরচ করবার সাধ্য আমার নেই।'

'খরচ করবার কর্তা কি তুমি ? আমি তোমাকে মান দিয়েছি, মর্যাদা দিয়েছি, তবে-না তুমি ঠাঁই পেয়েছো এ-সংসারে। আমি যা বলবো তা-ই তুমি করবে, তা-ই তুমি করতে বাধ্য।'

ঈষৎ হাসি খেলে গেল প্রমীলার মুখে। দু-হাত উপরের দিকে তুলে আড়মোড় ভেঙে নিতান্ত উদাস গলায় বললো, 'কেন মিছিমিছি চ্যাঁচামেচি করছেন ! আমি যাই কাপড় কেচে আসি, বেলা গেল।' পা বাড়ালো সে। গ'র্জে উঠলেন হিরণ্ময়ী, 'দাঁড়াও ! শোনো, কাল থেকে আর এ-বাড়িতে তোমার জায়গা হবে না। আমি এক্ষুনি তোমাকে তোমার বাপেরবাড়ি পাঠিয়ে দিতাম চাকরকে দিয়ে, কিন্তু স্বমুর সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'পাঠিয়ে দিলেই কি আমি যেতাম ?'

'যেতে না ? নিশ্চয়ই যেতে। যেতে তুমি বাধ্য।'

'আমার বাড়ি, আমার ঘর, টাকাকড়ি সমস্তই আমার। আর আমিই যেতে বাধ্য ? বা ! আপনি কি মনে করেন চিরদিনই ছেলেকে তুক ক'রে, তার পয়সা-কড়ি হাত ক'রে, বোকা পেয়ে তার স্ত্রীকেই আবার এ-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে সব একা খাবেন ! না, সে-দিন আর নেই।'

প্রমীলার কথা শুনে হিরণ্ময়ী স্তম্ভিত হ'য়ে থেমে গেলেন।

'আপনার পাঠাবার কোনো কথাই ওঠে না। কথাটা এই যে

আপনাদের নিয়ে এখন আমি কী করবো। আমরা দুটি মানুষ, এইটুকু খাবারে, এইটুকু বাড়িতেই চ'লে যায়। খরচ তো আপনাদের, আপনাদের জন্যই তো আমি ফতুর হ'য়ে গেলাম। তার উপর যদি দুটো বুড়োধাড়ি খোকাকে তিনবেলা দুধভাত খাওয়াতে হয় তা হ'লে আমি নাচার। অত অঢেল অর্থ আমার নেই, এ আপনি জেনে রাখুন।'

'বৌমা!'

দর্পভরে পা ফেলে ঘরে ঢুকে গিয়ে শাশুড়ির মুখের উপর শব্দ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো প্রমীলা। আর বন্ধ-দরজার বাইরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন হিরণ্ময়ী।

২

সারা অপরাহ্ণ, সারা বিকেল আর সমস্তটা সন্ধ্যা একটা ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো স্থাণু হ'য়ে কাটলো তাঁর। ছেলেরা ইস্কুল কলেজ থেকে ফিরলো, খেলো কি খেলো না, কাপড়-জামা ছাড়লো কি ছাড়লো না, মা-র দিকে এক-পলক তাকালো কি তাকালো না, আবার বেরিয়ে গেল কোথায়। দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে শুকনো চোখে ব'সে থাকা হিরণ্ময়ীকে দেখে তাদের মনে হ'লো না নতুন-কিছু হয়েছে। বাবার মৃত্যুর পরে মাকে তো তারা এই অবস্থায় দেখতেই প্রায় অভ্যস্ত। তারই মধ্যে কখনো-সখনো ওঠেন হাঁটেন কথা বলেন, আবার থেকে-থেকে এ-রকমই চুপ হ'য়ে যান। মাকেও বাবার সঙ্গে-সঙ্গে হারিয়ে ফেলেছে তা'রা।

অনেক রাত্তিরে সুনির্মল ফিরলো। সারা বাড়ি নিঝুম হয়েছে ততক্ষণে। টের পেয়ে মাটিতে আঁচল বিছিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে থাকা বিনিদ্র হিরণ্ময়ী ন'ড়ে চ'ড়ে উঠলেন একবার, তারপর কী ভেবে আবার স্থির হ'লেন। হঠাৎ তাঁর আহত দর্প ফণা তুলে উঠলো।

ছি, এ নিয়ে না-কি তিনি নালিশ জানাবেন ছেলেকে ? অসম্ভব। বিচার-কর্তা যদি কেউ হয় এ-বাড়িতে সে তো একমাত্র তিনিই। সুনির্মল নালিশ করতে পারে তাঁর কাছে, তিনি পারেন না। যে-অপমান পরের মেয়ে করলো, আপন ছেলের কাছে তার বিহিত নিতে যে আরো মাথা নত হবে তাঁর। তা ছাড়া, তা ছাড়া— (এইখানে মুহূর্তের জন্য হিরণ্ময়ীর ভাবনা স্তব্ধ হ'লো) কোন মুখেই বা যাবেন ? এই বাড়িতে এই আসনে তো তিনিই প্রমীলাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দিনে-দিনে তিলে-তিলে তিনিই তো বাড়তে দিয়েছেন এই আগুন। এখন সুনির্মলকে দিয়ে তিনি কী করাবেন ? এখন কী বলবেন তাকে ? কী অনুরোধ জানাবেন ? ত্যাগ করতে ? বাপেরবাড়ি পাঠিয়ে দিতে ? হায়-হায় ! শেষে মা হ'য়ে পুত্রবধূর নামে চুকলি কাটবেন ছেলের কাছে ? এই উপায়ে সম্মান আদায় করবেন এই সংসারে ? যে-সংসার তিল-তিল ক'রে তাঁর সুধা দিয়েই রচনা ?

চোখের জলে মাটি ভিজে গেল, তবু তিনি একটা কথা বলতে পারলেন না মুখ ফুটে।

দরজার কাছে ছায়া পড়লো লম্বা হ'য়ে, অন্ধকার ঘরে শুয়ে সেই ছায়া তিনি দেখলেন, সাড়া দিলেন না, প'ড়ে রইলেন ঘুমের ভান ক'রে। ছায়া দরজার কাছ থেকে স'রে গেল ধীরে-ধীরে। সিঁড়িতে আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল সুনির্মলের ক্লান্ত পায়ের আওয়াজ।

৩

জামা-কাপড় ছেড়ে আলো নিবিয়ে শুতে না-শুতেই অন্ধকারে গায়ের কাছে স'রে এলো প্রমীলা, সঙ্গে-সঙ্গে খানিকটা স'রে গেল সুনির্মল। এত রাত ক'রে প্রমীলার জেগে থাকা অপ্রত্যাশিত।

'ওগো শুনছো?'

একটা মেয়েলি গন্ধে হঠাৎ গা ঘিনঘিন ক'রে উঠলো, সুনির্মল একেবারে খাটের এ-প্রান্তে চ'লে এলো।

'ঘুমোওনি?' গলায় ত্রাস ফুটলো তার।

'নিশাচরের বৌ যখন হয়েছি তখন কি নিশাচরী না হ'লে চলে?'

'তাই তো।'

'রাত ছাড়া তোমার সঙ্গে দেখা হয় কখন, শুনি?'

'তাই তো।'

'শোনো।'

'বলো।'

'তোমার কি রোজই রাত দশটা পর্যন্ত আপিস থাকে?'

'না।'

'তবে?'

সুনির্মল চুপ।

'কোথায় যাও?'

চুপ।

'বাড়ি আর ফিরতে ইচ্ছে করে না, না?'

চুপ।

'পাড়ায় আরো তো লোক আছে, তোমার মতো এমন বাউণ্ডুলে কে শুনি?'

'তাই তো।'

'সকলেই আপিস থেকে বাড়ি ফেরে, বৌ নিয়ে সিনেমায় যায়, দোকান-পসারে কেনে-কাটে।'

'হুঁ।'

'এই পাশের বাড়ির অখিল মিত্তির, রাগ ক'রে গিন্নি বাপের বাড়ি গেল, অমনি একসেট চুড়ি গড়িয়ে দিলো।'

'তুমি তো আর যাওনি।' এইবার যেন একটু জিলজিলিয়ে উঠলো স্থনির্মল।

'আমি গেলেই তুমি দিতে কিনা।'

'হ্যাঁ দিতাম, নিশ্চয়ই দিতাম। ছাখোই না দিই কিনা।'

'তা বটে।' আধ-শোয়া হ'য়ে মাথা নাড়লো প্রমীলা, 'বোকা ব'লে এত বোকা ভেবো না, বুঝলে ?'

'না, তোমাকে কেন বোকা ভাববো।'

'ভেবেছো, গেলেই তো রক্ষে! আপদ চোকে, না ? তোমার মতলব আমি বুঝিনে কিছু ?'

'বোঝো নাকি ?'

'বুঝি বুঝি, খুব বুঝি। হাড়ে-হাড়ে বুঝি।'

গলার স্বরে যুদ্ধের ঘোষণা। স্থনির্মল শঙ্কিত হ'য়ে চুপ করলো। প্রমীলা বিছানা ছেড়ে উঠে, গায়ের অসংবৃত আঁচল ঠিক করলো কি করলো না, নেমে এসে আলো জ্বাললো টিপ ক'রে, তারপর কুঁজো থেকে ঢক-ঢক ক'রে পুরো এক গ্লাস জল খেয়ে চেয়ার টেনে স্বামীর মুখের কাছে বসলো, 'তোমার সঙ্গে পরিষ্কার-পরিষ্কার কয়েকটা কথা বলবার জন্মই জেগে আছি আমি। শোনো—'

'আজ না বললে নয় ?' হাত দিয়ে চোখের আলো আড়াল করলো স্থনির্মল।

'তাই যদি হবে তবে আর জেগে থাকা কেন ?'

তা তো ঠিকই। স্বামীর জন্ম জেগে থাকার নিগূঢ় অর্থটা কী স্থনির্মল নিজেই কি তা বোঝেনি? ভেতরে-ভেতরে আরো অন্যান্ত অনেক

রাত্রির বিভীষিকা স্মরণ ক'রে ভয় হ'লো তার। না, পারে না। কিছুতেই পারে না। এই চিৎকার, মারামারি, লাফালাফি, গালিগালাজ, এর বিরুদ্ধে কোনো জেহাদই ঘোষণা করতে পারে না সে। প্রতিবাদ ক'রে কেবলমাত্র দুঃখটাকে আরো নোংরা, আরো ঘৃণ্য, আরো অসহ্য ক'রেই তোলা হয়। একমাত্র উপায়, বর্জন। আর নয়তো নিঃশব্দে বহন। আর বর্জন যখন সম্ভব নয়, তখন এই মৃতভার বহন করা ছাড়া আর গতি কী সুনির্মলের ?

সে তো জানেই, এই স্ত্রীলোকটির কোনো হৃদয় নেই, ভালোবাসা নেই, লজ্জা-সরম, সম্ভ্রম কিছুই নেই। মনের বালাই নামক কোনো জিনিস দিয়েই বিধাতা তাকে ধরাধামে পাঠাননি। তার জ্ঞানের মধ্যে আছে এক অদম্য ঈর্ষা, লোভ আর প্রচণ্ড অর্থলোলুপতা। টাকা টাকা টাকা, টাকা তার সব চাইতে প্রিয়, প্রিয়তম। কাউকে একবিন্দু দিতে তার মাথায় আগুন জ্ব'লে ওঠে। অল্প বয়সে, যখন সে একদম চুপ ক'রে থাকতো— তখনো নানা ঘটনার সমাবেশে তার মুখে এমন সব রেখাপাত হ'তে দেখেছে, ঈর্ষা ক্রোধ আর লালসামিশ্রিত এমন দৃষ্টি ফুটে উঠতে দেখেছে চোখে যে, কতো সময় সুনির্মলের সারা অন্তর সংকুচিত হ'য়ে উঠেছে ঘৃণায়। কিন্তু বাক্যহারা সেই মনোভাবকে রূপ দিতে পারে এমন ক্ষমতা তখন তার ছিলো না। বৃত্তিগুলো ছিলো সহজাত। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সহজাত বিদ্যাটি তার বুদ্ধির আধারে স্থান পেয়েছে। আর সেই বুদ্ধির বাহন ভাষাকেও এমন প্রবলভাবে সে আয়ত্ত করেছে যে সেই তোড়ের মুখে দাঁড়াবে এমন সাধ্য আর যারই থাক, শান্ত ভদ্র সুনির্মলের অন্তত ছিলো না।

হঠাৎ মুখে-চোখে একটা প্রফুল্ল ভাব আনলো সে, খুশী-খুশী গলায় বললো, 'ও, ভালো কথা, আজ হঠাৎ একটা লাভ হ'য়ে গেল আপিসে।'

বেগতিক দেখলে এই হঠাৎ লাভের ঘোষণা আরো অনেকদিন কাজে লাগিয়েছে। প্রমীলা শান্ত হয়েছে তাতে, খুশী হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, শান্তি নেমেছে পৃথিবীতে। কিন্তু ইদানীং এ-কথাটার উপর প্রমীলার কোনো বিশ্বাস ছিলো না, সে এটুকু জেনেছিলো, সুনির্মলের চাকরিতে আর যা-ই থাক, কোনো উপ্‌রি পাওনার সুযোগ নেই। কিন্তু সুনির্মল উপ্‌রি পাক না পাক তার নিজের যে কিছু উপ্‌রি পাওনা হবে সেটা তো ঠিক। উৎসুক গলায় বললো, 'কই? কই সে-টাকা? কী করেছো? দাও আমাকে।'

'আজ পাইনি, কাল দেবো।'

'দেবে না হাতি! দান-খয়রাতেই তো সব উড়ে যাবে।'

'দান-খয়রাত আবার করবো কাকে? কাল ঠিক তোমার হাতেই এনে দেবো।'

'আহা গো,' মুখভঙ্গিসহকারে সে হাত-পা নাড়লো, 'লোকের যেন অভাব। বাড়ি তো একটা অতিথিশালা। তুমি যদি মানুষই হবে তবে আর এতগুলো টাকা এমনভাবে নষ্ট হ'তে পারতো না। এই শহরে আমার নিজের বলতে কিছু তুমি ক'রেই দিতে। নেই গয়না, নেই কাপড়, নেই বলতে কিছুটি নেই। একটা বাঁদীরও অধম আমি এই বাড়িতে।' আলো নিবলো, হামাগুড়ি দিয়ে সুনির্মলের গায়ের উপর দিয়ে এ-পাশে এসে শুলো প্রমীলা, 'টাকাটা কিন্তু কালকেই মনে ক'রে এনে দিয়ো।' একখানা হাত স্বামীর গায়ে রাখলো, 'আমি ব'লে তাই এত সহ্য ক'রেও এই সংসারে প'ড়ে থাকি—'

'তাই তো।' হাতটা নামিয়ে দিলো সুনির্মল।

'নামিয়ে দিলে কেন?' ফোঁস ক'রে উঠলো প্রমীলা। 'আমার হাত কি গরম লোহা?'

সুনির্মল ততক্ষণে উঠে বসেছে। নিঃশব্দে নেমে দাঁড়িয়েছে বিছানা থেকে, পকেট হাতড়ে দেশলাই সিগারেট বার করতে-করতে বললো, 'ছাতে যাই, বড্ডো গরম।'

'হ্যাঁ, তাই কিনা, আমার আঁচই তোমার সয় না। তা সইবে কেন—হ'তো যদি বিনুর ননদ, সেই শকুনি—'

সুনির্মল বাইরে এসে সিগারেট ধরালো।

পরের দিন সকালে হিরণ্ময়ী প্রস্তুত করলেন নিজেকে। না, লজ্জা নয়, দুঃখ নয়, মান-সম্মানেরও কথা নয়, এভাবে এ-মানুষকে আর বাড়তে দেওয়া অসম্ভব। ছেলের সাড়া পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন তিনি। 'সুনু।'

সুনির্মল কাঁধে তোয়ালে নিয়ে স্নানে যাচ্ছিলো, মা-র ডাকে ফিরে দাঁড়ালো, 'ডাকছো?'

'হ্যাঁ, এদিকে আয়।'

সুনির্মল টুথব্রাস রেখে এগিয়ে এলো।

'এ কী! তোমার চেহারা এরকম হয়েছে কেন?' কতোদিন বাদে ঘরের বাইরে পরিষ্কার আলোয় মা-র মুখখানা দেখতে পেলো সে। যত রাগই থাক, তবু মনটা কেমন ক'রে উঠলো।

'চেহারার কথা থাক। কতগুলো দরকারি কথা আছে। ঘরে আয়।'

ছেলেকে খাটের উপর বসিয়ে নিজে মাটিতে বসলেন। 'তোর বৌকে আমি বাপেরবাড়ি পাঠিয়ে দিতে চাই।'

এ-কথা আশা করেনি ছেলে। সহসা ভেবে পেলো না কী জবাব দেবে। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আমার ইচ্ছের উপর নির্ভর ক'রেই কি ওকে রেখেছিলে তুমি?'

'ঘুমিয়ে জবাব দিস্‌নে, আমার মনে হয়—'

'কী আপনার মনে হয় তা আমি জানি।' শিকারী বাঘের মতো কোথায় ওৎ পেতে ছিলো, কোথা থেকে যে এমন উদ্দাম হ'য়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রমীলা কে জানে। মা ছেলে দু-জনেই চমকালো, যেন ভয়ই পেলো তার দিকে তাকিয়ে। 'বেইমান, ছোটোলোক, ইতর।' রাগে দুই চোখে যেন আগুন জ্ব'লে উঠলো প্রমীলার। 'ঐ যে বলে না, যার ঘরে খাবে তার বুকে ব'সেই দাড়ি ওপড়াবে। ছেলেকে ঘরে ডেকে নিয়ে ওষুধ খাওয়ানো, মাদুলি পরানো আর তুক্‌ করা, না? কেন? কেন? কিসের জন্য? এ-বাড়ি আমার, আমার, আমার। মরবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমার। কে আমাকে সরাবে, তাড়াবে— কোন্‌ বাঁদীর বাচ্চায়—'

সকালের স্নিগ্ধ আকাশ কালো হ'য়ে গেল। ঝি-চাকর ভিড় করলো দরজায়। এ-বাড়ি ও-বাড়ির লোক পর্যন্ত হাট-বাজার ভুলে, রান্নাবান্না ভুলে, ছেলের কাঁথা ধোয়া ছেড়ে ঝুঁকে পড়লো এ-দিকে।

সুনির্মল বেগে এগিয়ে এসে বলিষ্ঠ হাতে মুখ চেপে ধরলো স্ত্রীর, চাপের চোটে কষ বেয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। 'ছি-ছি-ছি!' হিরণ্ময়ী এক ধাক্কায় বার ক'রে দিলেন তাকে ঘর থেকে, 'তুইও কি পাগল হলি সঙ্গে-সঙ্গে? এ-বাড়ির মান-মর্যাদা সব ভুলে গেলি। লোক জমা ক'রে ফেললি চারদিকে? ছি! ছি! এর চেয়ে যে মরণ ভালো আমার! যা, যা, তুই স্নান করগে যা।' অভি, সীমন্ত পড়া ফেলে ছুটে এসেছে ব'লে তাড়া লাগালেন, সরিয়ে দিলেন ঝি-চাকরের ভিড়, তারপর দরজা আটকালেন ঘরের। বৌয়ের হাত ধ'রে টেনে বসাতে চেষ্টা করলেন খাটের উপর, 'তুমি-না ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের স্ত্রী, এ-সব কী ভাষা তোমার, কী অসভ্যতা!'

হিরণ্ময়ীর সাধ্য কি তাকে রোখেন। এক ধাক্কায় সে ঠেলে দিলে অভুক্ত অনিদ্র শাশুড়িকে। তীক্ষ্ণ চিৎকারে মুখ দিয়ে অবিরত অশ্লীল ভাষার খই ফুটলো। প্রায় অর্ধমৃত হ'য়ে কানে আঙুল দিয়ে হাঁটুতে মুখ ঢাকলেন হিরণ্ময়ী।

এর পরে হিরণ্ময়ী আবার শামুকের মতো গুটিয়ে গেলেন নিজের মধ্যে। কতো শত বিনিদ্র রাত্রির বেদনা গ'লে পড়লো তাঁর গাল বেয়ে কে তার হিসেব রাখে। দোষ দেবেন কার? বরাতে যার যা পাওনা আছে তাই তো নিতে হবে হাত পেতে? ছোটো ছেলে ছুটো মাঝে-মাঝে গোঁয়ার্তুমি করে, তাদেরই তিনি ব'কে-ঝ'কে সামলে নেবার চেষ্টা করলেন। অধিকার যখন পুরোমাত্রায় প্রমীলারই, সেখানে মিছিমিছি গলা ফাটিয়ে বাড়িটাকে বস্তি বানিয়ে লাভ কী? আর এই মানুষ কি তাঁর রাগেরও যোগ্য! ওকে কি তিনি ততখানিও গণ্য করতে পারেন?

আবার অভিমান করলেন তিনি ছেলের উপরে। তাঁর যেন মনে হ'লো, সুনির্মল ইচ্ছে করলেই পারতো এর একটা প্রতিকার করতে। বাড়ির প্রতি তার এই নিরাসক্তিকে— যা হচ্ছে হোক, যা করছে করুক, যেমন চলছে চলুক— এই এড়িয়ে-যাওয়া পালিয়ে-আসা ভাবকে তিনি ধিক্কার দিলেন। কিন্তু এ-কথা ভাবলেন না যে ছেলের এই বাড়ি-ছাড়া হবার জন্যও তিনিই দায়ী।

আর সুনির্মল! প্রমীলার স্বামী। হিরণ্ময়ীর ছেলে। হিন্দু-বিবাহের পবিত্র বন্ধনে বন্দী হ'য়ে প্রমীলার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের প্রজা হ'য়ে দিনে-দিনে সংসারের প্রতি, সকলের প্রতি আরো অমনোযোগী হ'য়ে উঠতে লাগলো। অবিশ্যি সে পুরুষ। গায়ে তার শক্তি আছে। তাই ব'লে সে-শক্তি তো একটা স্ত্রীলোককে ধ'রে মারবার জন্যেই অহরহ ক্ষয় করতে পারে না। সেটা ভদ্রতায় আটকায়, সভ্যতায় আটকায়, আর লোক-লজ্জার ভয়ও মনুষ্যজগতে কিছু কম নয়। তা ছাড়া মারলেই বা কী। প্রমীলার কি কোনো আত্মসম্মান আছে? সম্ভ্রম-বোধ আছে? চড়-

চাপড় না-ই বা দিলো, এমন অভদ্র ইতর ঘটনা তো কতোবার ঘটেছে যার ফল চড়-চাপড়ের চাইতে অনেক, অনেক বেশি গুরুতর হয়েছে, অনেক বেশি অপমানের। কী ফল হয়েছে তাতে? তাতে কি সে চ'লে গেছে? প্রতিকার হয়েছে কোনো? শুধু রাত্তিরে ঘুম গেছে, আর সকালে প্রতিবেশীর চোখের তলায় রাস্তায় নামতে লজ্জা করেছে।

যদি এমনও হ'তো যে স্বামীর সুখ-দুঃখকে সে সামান্যতমও গ্রাহ্য করে, মানুষটার প্রতি একতিল মমতাও বোধ করে হৃদয়ের মধ্যে, তবু না-হয় আশা থাকতো। সেই রন্ধ্রটি বেয়ে-বেয়েই এগুতে পারতো সুনির্মল, কিন্তু যার বুকের তলায় হৃদয় নামক কোনো পদার্থের অস্তিত্বই নেই তাকে নিয়ে আর কী করা যায়? অনেক বুঝিয়েছে— কখনো অসহ্য ক্রোধ নিয়ে, কখনো অমানুষিক ধৈর্য নিয়ে— মাকে সে কোথায় ফেলে দেবে, ভাইদের সে কেমন ক'রে তাড়াবে, বলতে-বলতে উত্তেজিত হয়েছে। সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে এসেছে দুর্মুখ দুঃসহ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে— না, মারতে ইচ্ছে করেনি, মেরে ফেলতে ইচ্ছে করেছে। শাদা, নিরক্ত, শ্রীহীন গলার কাছে যাবার জন্য নিস্‌পিস্‌ ক'রে উঠেছে ডান হাতের পাঁচটা আঙুল। আর সেই অদম্য ইচ্ছাকে সংযত করতে তাকে ছুটে-ছুটে বেরিয়ে যেতে হয়েছে রাস্তায়, পার্কে, এখানে-ওখানে। কতো রাত ট্র্যাম লাইনের ঘাসে ব'সে থাকতে-থাকতে একটা প্রতিহিংসা জ্ব'লে উঠেছে বুকের মধ্যে। হিরণ্ময়ীর পুত্রবধূকে সমাদরে গ্রহণ ক'রে সর্বস্ব সমর্পণ করার এই তো উপযুক্ত প্রতিশোধ, এ-কথা ভেবে মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা আরামও বোধ হয়েছে তার।

নেহাত নির্বিরোধী শান্ত প্রকৃতির মানুষ সে। এমন একটা ঘটনার সঙ্গে দিনরাত লড়াই করবার মতো যোগ্যতা বা উদ্যম সত্যিই তার ছিলো না। প্রমীলার স্তরে নেমে এসে ঠিক তার উপযোগী ব্যবহার করা

অসহ্য তার পক্ষে। ঝগড়া, তর্ক, মারামারি, সবটার ভাষাই তার এমন যে-ভাষা প্রমীলার বোধগম্য নয়। যেটা বোধগম্য (যদি বোধ থাকে) সেটা স্থনির্মল জানে না। জানলেও পারে না।

প্রমীলা এ-বাড়িতে থাকবেই, স্বামী তার, তারই তো বাড়ি। তাকে তাড়াবে এমন সাধ্য কার আছে এখানে ? যজ্ঞেশ্বরকে চিঠি লিখে, উকিলের দরজায় হাঁটাহাঁটি ক'রে পাকাপোক্তভাবে পরিত্যাগ করবার একটা চেষ্টা করেছিলো স্থনির্মল, সঙ্গে-সঙ্গে বাপ এলো আর প্রমীলা তার স্ত্রীত্বের সকল অধিকার নিয়ে রুখে দাঁড়ালো। এখানে স্থনির্মলের হাত-পা চিরদিনের জন্য বাঁধা। স্ত্রী নিজে থেকে না গেলে সাধ্য কার তাকে উচ্ছেদ করে এই অধিকার থেকে।

অতএব নিঃশব্দে পলায়ন ছাড়া ভদ্রলোকের আর উপায় কী। শুধু বাড়ি থেকে নয়, জীবন থেকেও। ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতে বেরুনো, আর ঘুমে ক্লান্তিতে ধুঁকতে-ধুঁকতে নিশুতি রাতে ফিরে আসা। এই ক'রে-ক'রে প্রমীলার সঙ্গে প্রত্যক্ষে স্থনির্মল যুক্ত রইলো বটে, কিন্তু মনের মধ্যে তার নিশ্চিহ্ন মৃত্যু ঘটলো।

কী চাই ? টাকা ? কর্তৃত্ব ? শাড়ি ? গয়না ? বেশ তো, সব নাও। কিন্তু একটু শান্তি দাও, একটু নিঃশব্দে ভদ্রভাবে ক্লান্তিকাতর শরীরটাকে জিরোতে দাও রাত্তিরে। তার বিনিময়ে একেবারে নিঃশেষে আমি স্বামীর সকল কর্তব্য পালন করবো তোমার কাছে। মনে-মনে যেন এই বণ্ড লিখে দিলো সে।

২

সম্পূর্ণ একাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে এইবার একটু শান্ত হ'লো প্রমীলা। এক-আধদিন শাশুড়িকে একটু দয়াও করতে লাগলো। মাঝে-মাঝে

একাদশীর দিন দু-চার আনার খাবার পর্যন্ত আনিয়ে দিলো। কিন্তু সে যা' করছে, করছে। তাই ব'লে সুনির্মলের উপায় ছিলো না কখনো নিভৃতে মা-র সঙ্গে একটা কথা বলে কিংবা ভাইদের হাতে প্রকাশ্যে একটা জিনিস তুলে দেয়। দাঁত বার ক'রে তৎক্ষণাৎ সে ঝাঁপিয়ে পড়বে সেখানে। বিধবার একবেলার আহারকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে, দেওরদের আধপেটা খাইয়ে, ঝি-চাকরদের তুলে দিয়ে বাড়িটাকে একটা নরককুণ্ড বানিয়ে ছাড়বে, তবু তার ঝগড়ার স্পৃহা কিছুতেই নির্বাপিত হবে না, শান্ত হবে না।

সুনির্মল যতটা বাড়ির সংস্রব ত্যাগ করলো, ভাইরাও তার চেয়ে কিছু কম গেল না। তারা বল্গাহীন ঘোড়ার মতো প্রাণ ভ'রে আড্ডা মারতে লাগলো বাইরে, চুপে-চুপে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে দাদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাড়ির অর্ধাশনের যোগ্য মাশুল আদায় করতে লাগলো রেস্তোরাঁর গর্ভ থেকে। আর সকলের মাথার উপর পা দিয়ে একটা মূর্তিমান নিগ্রহ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো প্রমীলা।

এই বৈচিত্র্যহীন ব্যর্থ বিরস তিক্ত জীবনযাত্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো দুটি। প্রথমটি, সুনির্মলের বোন এলো প্রবাস থেকে ছোট্টো বাচ্চা নিয়ে মা-র কাছে জুড়োতে এবং এক মাসের মধ্যেই অতিষ্ঠ হ'য়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বিদায় নিলো। যাবার সময় মাকেও নিয়ে যাবার জন্য কান্নাকাটি করেছিলো কিন্তু জামাই-এর বাড়িতে তিনি কোথায় যাবেন? ফিরে তো আসতেই হবে। কিছুতেই গেলেন না। আর দ্বিতীয় ঘটনা শকুন্তলা।

ছোট্টো একটু গল্প আছে এ-বিষয়ে। খুব-কিছু রোমাঞ্চকর না-হ'লেও একটু কাব্যিক। মস্ত এক ধনীপুত্র এবং যোগ্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে স্থির হয়েছিলো তার। লাল চিঠি ছাপিয়ে তার দাদা-বৌদি সগর্বে সানন্দে

বিলিও করেছিলো দিগ্বিদিকে। বলাই বাহুল্য, সেই পত্রাঘাত থেকে হিরণ্ময়ী আর সুনির্মলও বাদ পড়েনি। সহসা খবর পাওয়া গেল বিয়ের আগের দিন কন্যাপক্ষ থেকেই টেলিগ্রাম ক'রে বিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। আর তার দিন পনেরো পরে শকুন্তলার সঙ্গে দেখা হ'লো সুনির্মলের হাওড়া স্টেশনে।

মন যখন উদ্‌ভ্রান্ত, হৃদয় যখন প্রবোধ মানছে না এমন সময় আপিসের অন্যান্য প্রয়োজনীয় চিঠির সঙ্গে পাতলা নীল খামের একটা চিঠি পেলো সুনির্মল। শকুন্তলা লিখেছে মেদিনীপুর থেকে। এই প্রথম চিঠি। খবর বিশেষ কিছু নেই, কয়েক লাইন মাত্র। পাটনাতে ইশ্‌কুল-মাস্টারির কাজ নিয়ে যাচ্ছে— পথে হাওড়া স্টেশনে অন্য গাড়ি ধরবার জন্য অপেক্ষা করার নির্দিষ্ট সময়টুকুতে যদি সুনির্মল একবার দেখা করতে পারে তার সঙ্গে।

বলা বাহুল্য, নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে গিয়েই প্ল্যাটফর্ম-টিকিট কেটে সুনির্মল পাইচারি করছিলো স্টেশনে। গাড়ি এলে শকুন্তলার কুমারী সিঁথি আর ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ থমকে ছিলো তার বুক। যখন হৃৎপিণ্ড আবার স্বাভাবিক গতিতে চলতে লাগলো, মুখ নিচু ক'রে শকুন্তলা বললো, 'ডেকে পাঠিয়ে কষ্ট দিলুম?'

আকুল হ'য়ে সুনির্মল বললো, 'তুমি কি আবার আজই চ'লে যাবে?'

'আজই।'

'একটা দিন থেকে যাও না।'

'অসম্ভব।'

'কেন, অসম্ভব কেন?'

'কোথায় থাকবো ?'

আবার সেই কোথায় থাকার প্রশ্ন। মরীয়া হ'য়ে স্থনির্মল বললো, 'যেখানে হয়, যেমন ক'রে হয় একটা দিন তুমি থাকো।'

'কী লাভ ?'

'কী না ? প্রত্যেক দিন আমার জীবন থেকে দশটা ক'রে আয়ুর পাতা খ'সে যাচ্ছে, একটা দিন আমি স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে চাই।'

এ-কথার অনেক জবাব ছিলো শকুন্তলার মনে, কিন্তু দিলো না। চোখ তুলে একবার তাকালো শুধু।

মাথা নিচু ক'রে বললো, 'মামীমা কেমন আছেন ? তাঁকে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে।'

হিরণ্ময়ীর কথা উঠতে নিশ্বাস চাপলো স্থনির্মল। বরাবর লক্ষ্য করেছে এই মেয়েটির সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে হিরণ্ময়ীর। এই দু-জন মেয়েই তার হৃদয়ের ঠিক একটি জায়গাতেই এসে দাঁড়িয়েছে। আস্তে বললো, 'মা-র কথা থাক।'

'কেন, ওঁর শরীর ভালো নেই ?'

'না।'

একটু চুপ।

'তোমার সময় কতোক্ষণ ?'

'চল্লিশ মিনিট। তিনটে দশে গাড়ি ইন্ করবে।'

'তিনটে দশে ? তবে আর কতোটুকু সময় ?'

'মন্দ কী।'

'কুন্তী !'

'বলুন।'

'আজ তুমি থেকে যাও।'

'রাত্তিরে পৌঁছবো গিয়ে, সকাল দশটায় জয়েন করতে হবে।'

'তবে চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই।'

শকুন্তলা হাসলো। 'তাই ভালো। চিরদিন তো পুরুষই নারীহরণ মামলার আসামী হ'য়ে এসেছে, আমার জীবনে চমৎকার একটি অভিনব ঘটনা ঘটবে। কাগজে-কাগজে নরহরণ মামলার খবরের সঙ্গে আমার ছবি বেরুবে। ফাঁকতালে দিব্যি বিখ্যাত মহিলা হ'য়ে উঠবো।'

শকুন্তলার ঠাট্টায় কান দিলো না সুনির্মল। অন্যমনস্ক হ'য়ে বললো, 'হঠাৎ চাকরি নিয়ে যাচ্ছো কেন? তোমার চাকরি করার দরকার কী?'

'বা রে, এত বড়ো মেয়ে ভাইয়ের উপর ব'সে খাবো নাকি?'

'এম. এ. পড়লে না কেন?'

'সুবিধে হ'লো না।'

'বিয়ে বন্ধ ক'রে দিলে কেন?'

সব 'কেন'রই জবাব দেওয়া সহজ, এই 'কেন'র নয়। নিবিড় অথচ শান্ত মেঘে বিদ্যুৎ খেললো একটু, চোখের কালো মণিটি মুহূর্তের জন্য চিকচিকোলো, তার পরে দূরের দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। 'কী মনে হয় আপনার?'

'যা মনে করতে ভালো লাগে তাই। কিন্তু তা তো আর সত্যি নয়।'

'সত্যি হ'লেই বা কী হ'তো, আর না-হ'লেই বা কী। ও-সব থাক। এইটুকু যে দেখা হ'লো তাই কতো ভাগ্য। কেবল মামীমাকে দেখে যেতে পারলুম না এই দুঃখ।' হাতের ঘড়িতে চোখ ফেললো সে— 'সময় হ'য়ে এলো।'

সুনির্মলও ঘড়ির দিকে তাকালো, তারপর অস্থির গলায় ব'লে উঠলো, 'কী আশ্চর্য! এতক্ষণ ধ'রে তোমাকে দাঁড় করিয়েই কথা বলছি। ছি-ছি। চলো কোথাও চা খেয়ে আসি।'

'আর সময় কই ?'

'যথেষ্ট সময় আছে, চলো, চলো।'

'তা হ'লে গাড়ি ফেল হবে।'

'একদিন গাড়ি ফেল হ'লে কী হয় ?'

'চাকরি যায়।'

'যাক।'

'তারপর ?'

'তারপর আর-কিছু না, চলো।'

'পাগল নাকি।'

হুড়মুড়িয়ে একঝাঁক কুলি ঢুকলো প্ল্যাটফর্মে। দিল্লি এক্সপ্রেস।

ন-মিনিট পরে পাটনা যাবার গাড়িটিও ইঞ্জিন লাগিয়ে প্রস্তুত। সুনির্মলের বুকের ভেতরটা যেন কেমন ক'রে উঠলো। যেন যথেষ্ট হাওয়া পেলো না ফুসফুসের মধ্যে।

শকুন্তলা তৎপর হ'য়ে কামরা খুঁজে উঠে বসলো। সুনির্মল সুজনিটা পেতে দিলো লম্বা বেঞ্চির প্রায় অর্ধেক জুড়ে, চুলের মিষ্টি গন্ধে ভরা ঝালরওলা নরম বালিশটা নাড়লো-চাড়লো দু-হাতে, তারপর নেমে এসে জানালায় দাঁড়ালো।

'একবার মামীমাকে নিয়ে পাটনা আসবেন বেড়াতে। শুনেছি স্কুলটা শহরের খুব সুন্দর জায়গায়। কোয়ার্টার দিচ্ছে—'

'আশা করি গিয়ে চিঠি লিখবে।'

'চিঠি লিখবো ?'

'লিখবে না ?'

একটু ভেবে বললো, 'না।'

'কেন ?'

শকুন্তলা মুখ নিচু ক'রে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো।

'কেন লিখবে না ?'

শকুন্তলা যতক্ষণে জবাব দিলো এই প্রশ্নের ততক্ষণে গার্ড নিশান দেখালো, গাড়ি হুইসিল দিলো। ট্রেন দুলে উঠলো।

'যে-চিঠি গোপনে লিখতে হয় সে-চিঠি কি আমার লেখা উচিত ?' চোখের উপর স্থির হ'লো চোখ, দু-চামচে টলটলে জল। 'আমি সে-দিনই আপনাকে চিঠি লিখবো যেদিন গোপন করার কথা উঠবে না। যে-চিঠি না-লিখলেই লোকেরা আমাকে ধিক্কার দেবে।'

ট্রেনের দ্রুত চলন্ত জানালা হাতের পাঁচ আঙুলে আঁকড়ে ধ'রে প্রায় ছুটতে-ছুটতে সুনির্মলের ব্যাকুল গলা কী যেন বললো চিৎকার ক'রে, শোনা গেল না ট্রেনের আওয়াজে। শকুন্তলা তার নরম হাতের আঙুলে তাড়াতাড়ি জানালা থেকে সুনির্মলের হাতটা সরিয়ে দিতে-দিতে বললো, 'কী করছেন, ছেড়ে দিন। ট্রেন জোরে চলছে না ?' বলতে-বলতে শিশিরের ফোঁটার মতো দুই বিন্দু জল গড়িয়ে পড়লো তার চোখ থেকে। হাতের দুই আঙুলে দুটি নিটোল মুক্তো।

'কুন্তী, কুন্তী !' ট্রেন তাকে ছাড়িয়ে, তার ডাক ছাড়িয়ে কোথায় চ'লে গেল। আরো কতো কথা বলার ছিলো, শোনার ছিলো, কিছুই হ'লো না। এমন কি এতক্ষণে ঠিকানাটা পর্যন্ত জেনে নিতে ভুলে গেল সে।

অনেক রাত্রিতে বাড়ি ফিরে স্থনির্মল এক ধাক্কায় টেনে তুললো স্ত্রীকে। বোকা-বোকা শাদা মুখে, ঘুমন্ত চোখের সমস্ত অর্থহীনতা নিয়ে স্বামীর মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো প্রমীলা।

'ওঠো, ওঠো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমি বিয়ে করবো, তার আগে এ-বাড়ি তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে, ছাড়তেই হবে।'

'অ্যাঁ ?'

'হ্যাঁ। ভালো হ'য়ে ভদ্রলোকের মতো গায়ে কাপড় দিয়ে বোসো। ও-রকম বিশ্রী ক'রে শোও কেন ?'

'বিশ্রী ?'

'অত্যন্ত বিশ্রী !'

মাথার মধ্যে এইবার আস্তে-আস্তে বুদ্ধি ঢুকলো প্রমীলার, সঙ্গে-সঙ্গে রাগে চিড়বিড়িয়ে উঠলো সমস্ত শরীর। এলো-গায়ে ঝংকার মেরে উঠে বসলো সে, বুকের শিথিল আঁচল একেবারে খসিয়ে দিয়ে বললো, 'বিশ্রীই শুই আর স্থশ্রীই শুই আমি আমার সোয়ামির ঘরেই শুই, পরের সোয়ামির ঘরে তো ঢুলুতে যাইনে।'

'ইতরের মতো কথা বোলো না, যা বলছি তা ভদ্র হ'য়ে ব'সে শোনো।'

'ও-ও-ওরে আমার রাতদুপুরের পাদ্রি রে। কোন্ নরক থেকে ঢোঁক-ঢোঁক তাড়ি গিলে রাত দুটোয় বৌ ঠেঙাতে এলেন শুনি ?'

'যে-নরক থেকেই আসি, তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট নরক কোথাও নেই। গায়ে কাপড় দাও।'

'দেবো না, দেবো না, দেবো না ; গায়ে কেন কোনোখানেই দেবো না

আমি। আমার শরীরটাকেই যত ঘেন্না। জানিনে আমি সে-কথা? কেন ঘেন্না তা-ও জানি।'

শাড়ির একটি প্রান্তও গায়ের উপর তুলে দিলো না প্রমীলা। হয়তো দিতো, কিন্তু সুনির্মলের কথায় তার জেদ্ বেড়ে গেল।

সুনির্মল উঠে গিয়ে আলো নিবিয়ে দিয়ে এলো। আধো-অন্ধকারে আবার এসে চেয়ারে ব'সে একটা সিগারেট ধরালো।

'চ্যাচামেচি ক'রে লাভ হবে না। এখান থেকে যেতে হবে তোমাকে। যেতেই হবে।'

'কী?'

'আরো অনেকবার বলেছি সে-কথা, তুমি শোনোনি।'

'আ-হা-হা-গো, বড়োই অন্যায় করেছি, কী সুন্দর পাকাধানে মই দিয়েছি—'

'তোমার বাবাকে বোলো, তাঁর মেয়ের সঙ্গে একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কোনো ভদ্রলোক বসবাস করতে পারে না। অতএব এখানে আর তোমার জায়গা হবে না।'

'কেন, মাগী পুষবে বাড়িতে এনে?'

'আবার ইতরের মতো কথা?'

'ইতর কে, তুমি না আমি?'

'তুমি তুমি তুমি!' মাথার চুল ছিঁড়লো সুনির্মল, 'শুধু কি ইতর! চোর নও?'

'কী?'

'চোর। তুমি চোর, তোমার বাবা চোর। আমার মা-র গয়নার বাক্স কে নিয়েছে? কেন সেদিন আমাকে দেখে যজ্ঞেশ্বর কন্ট্রাক্টর ও-রকম পালিয়ে গেল? কী লুকোলো চাদরের তলায়? আমি জানিনে কিছু?'

সহসা একটু যেন চমকে গেল প্রমীলা, পর-মুহূর্তেই চিৎকার ক'রে উঠলো, 'কী! এত বড়ো কথা? আমার বাপ চোর, আমি চোর? রাত ক'রে মদ গিলে বাড়ি এসে বেলেল্লাগিরি—' লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলো, 'পাড়া নেই, প্রতিবেশী নেই, আইন-আদালত কি উঠে গেছে দেশ থেকে?' দরজার দিকে বেগে ধাবিত হ'লো সে, শক্ত হাতে ধ'রে ফেললো সুনির্মল, 'বেশি চ্যাচালে গলা টিপে মেরে ফেলবো।'

'গলা আমি টিপতে জানি না? আমার হাত নেই, নখ নেই?' অন্ধকার মথিত ক'রে সত্যিই সে বড়ো-বড়ো নখের আঁচড়ে-কামড়ে একেবারে বিধ্বস্ত ক'রে দিলো সুনির্মলকে। অত বড়ো একটা ক্ষিপ্ত বুনো জানোয়ারের মতো মানুষকে বাগে আনতে রীতিমতো পরিশ্রম হ'লো সুনির্মলের। হাতের আঙুল ক'টা সাঁড়াশির মতো বেঁকিয়ে টুঁটির কাছে এসে থামলো তার। হত্যাকাণ্ডের একটা দুর্বার ইচ্ছাকে শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে রোধ করতে-করতে বললো, 'না, আর না, আর আমি তোমাকে সহ্য করতে পারবো না। একদম, একদম চুপ! তা নইলে সব ছটফটানি আমি এই মুহূর্তে বন্ধ ক'রে দেবো। তুমি শোনো, ভালো ক'রে শোনো— আমি এই মাসের মধ্যেই বিয়ে করবো, আমার স্ত্রী বাড়িতে আসবার আগে তোমাকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

'বেরিয়ে যেতে হবে? আমি বেরিয়ে যাবো আর তুই বিয়ে করবি, আমি বেঁচে থাকতে তুই বিয়ে করবি— তবে কর্—'

প্রবল শক্তিতে সুনির্মলের মুখ-চেপে-রাখা হাতের উপর সে একেবারে হাড় পর্যন্ত চার-চার আটটি দাঁত বসিয়ে ছুটে বারান্দায় এসে আর্তনাদ ক'রে উঠলো, 'ওগো, কে কোথায় আছো গো, বাঁচাও, আমাকে এরা খুন ক'রে ফেললো, মেরে ফেললো।'

প্রমীলার অমন অদ্ভুত বিকৃত গলার আওয়াজে পাড়ার অধিকাংশ লোক সচকিত হ'য়ে জেগে উঠলো। স্থনির্মল হ্যাঁচকা টানে তাকে ঘরে এনে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো। আলো জ্ব'লে উঠলো এ-বাড়ি ও-বাড়ি। জোড়া-জোড়া উৎসুক চোখ তাদের অন্ধকার ঘরের দিকে ধাবিত হ'লো। পাশের ঘরে অভি, সীমন্ত ঘুম ভেঙে উঠে ব'সে ঘুষি পাকাতে লাগলো। নিচের ঘরে হিরণ্ময়ী ঈশ্বরের নাম নিলেন।

গলায়-গলায় গুনগুনানি উঠলো, 'লোকটা বৌকে মারছে।'

'মাতাল যে। দেখছেন না কতো রাত্তিরে বাড়ি ফেরে রোজ।'

'দেখতে তো যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না, তলায়-তলায় মিটমিটে ডান।'

'আরে মশাই, অসচ্চরিত্র হ'লে কি আর কোনো জ্ঞানগম্যি থাকে?'

'এ-সব বদমাস লোক পাড়ার মধ্যে থাকতে দেওয়াই অন্যায়।'

'সে তো ঠিক কথাই।'

উল্টোদিকের বাড়ির এক যুবক সতেজে ডেকে উঠলো, 'ও মশাই শুনছেন? এটা ভদ্রলোকের পাড়া। বৌ কিলোতে হয় তো বস্তিতে যান, নইলে কিল কাকে বলে বুঝিয়ে ছাড়বো।'

স্ত্রীলোকের গলা থেকে পুরুষ, পুরুষের গলা থেকে স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক সকলের মধ্যেই একটা কথার লোফালুফি চললো কতক্ষণ। তারপর এক-সময় আলো নিবলো। পরোপকার ক'রে সকলে আবার নিশ্চিন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন হ'লো।

ঘুমিয়ে পড়তে প্রমীলারও দেরি হ'লো না খুব। কেবল খাঁচার বাঘের মতো স্থনির্মলই বাইরের ছাতে অন্ধকারে এ-মাথা ও-মাথা পাইচারি

করতে লাগলো। রাগে, দুঃখে, লজ্জায় আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করলো তার। হঠাৎ ভোর-ভোর সময়ে কী ভেবে দৌড়ে নিচে নেমে এসে হিরণ্ময়ীর দরজায় টোকা দিয়ে ডাকলো, 'মা।'

'বাবা।' হিরণ্ময়ী ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলে দিলেন। সুনির্মল ভেতরে এসে বসলো; বললো, 'তোমার গয়নার বাক্সে কী-কী ছিলো মনে আছে?'

'আছে। কেন রে?'

'বলো তো।'

হিরণ্ময়ী বললেন।

'পুলিশ এসে জিগ্যেস করলে ঠিকঠাক সব বলতে পারবে তো?'

'তা পারবো, কিন্তু এতদিন পরে—'

'তুমি বলবে কবে চুরি গেছে জানো না, টের পেয়েছো কাল রাত্রে।'

হিরণ্ময়ী আশ্চর্য চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'কী দেখছো? কী ভাবছো? কিছু ভেবো না। আমি সব জানি, কে নিয়েছে তার নাম ধাম ঠিকানা সব আমার মুখস্থ। তুমি শুধু ঠিকমতো ব'লে যেয়ো সব।' সুনির্মল বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বেলা প্রায় ন-টার সময় দু-জন সাধারণ পোশাক পরা পুলিশের ভদ্রলোককে নিয়ে বাড়ি ফিরলো সে। প্রথমেই তারা হিরণ্ময়ীর ঘরে এলো। হিরণ্ময়ী বসেছিলেন চুপ ক'রে মাটিতে হাতের ভর রেখে। দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে মাথায় আঁচল তুলে দিলেন। সুনির্মল বললো, 'তুমি বোসো মা, এঁরা যা জিগ্যেস করবেন তার ঠিক-ঠিক জবাব দাও।'

কথাবার্তা একজন ভদ্রলোকই জিগ্যেস করলেন সব, আরেকজন দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরে।

কী-কী গয়না ছিলো, নগদ টাকাও ছিলো কিনা, কী ধরনের বাক্স, বাক্সের বিশেষত্ব কী, গয়নাগুলোর কোন্‌টার কী নাম, চাবি কার কাছে ছিলো, কখন টের পেলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি— সব-কিছুরই যথাযথ জবাব দিলেন হিরণ্ময়ী। কেবল 'কাকে সন্দেহ করেন' এই কথাটির জবাব সুনির্মল নিজে দিলো।

'আমার স্ত্রীকে।'

'স্ত্রীকে! আপনার স্ত্রীকে।' ভদ্রলোক চোখ কুঁচকে ভালো ক'রে তাকালেন সুনির্মলের দিকে। হিরণ্ময়ী স্তম্ভিত।

'হ্যাঁ, আমার স্ত্রীকে।' বিনা দ্বিধায় চোখে-চোখে তাকিয়ে জবাব দিলো সুনির্মল।

'তিনি কোথায় থাকেন?'

'এ-বাড়িতেই।'

'বরাবরই এখানে আছেন, না মাঝখানে কোথাও গিয়েছিলেন?'

'বরাবরই আছেন।'

'কী কারণে তাঁর প্রতি আপনার এই অদ্ভুত সন্দেহ জন্মালো?'

'আমি দেখেছি।'

'দেখেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'যদি দেখেই থাকেন তা হ'লে তখন কেন ধরলেন না?'

'বুঝিনি।'

'মানে?'

'আমার স্ত্রীর বাবা আর আমার স্ত্রী দু-জনে মিলেই এই চুরি করেছে। তা'রা আমার ঘরে ব'সে কথা বলছিলো, হঠাৎ আমি সেখানে ঢুকতেই দু-জনে চমকে উঠলো। আমি দেখলাম আমার শ্বশুর তাড়াতাড়ি তাঁর

সিল্কের চাদরের তলায় বাক্সটি লুকিয়ে ফেললেন এবং আমার সঙ্গে ভদ্রতা-সূচকও কোনো কথা না ব'লে পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। আমার মনে হ'লো উনি ভয় পেয়েছেন এবং কিছু চুরি করেছেন।'

'এটা কদ্দিন আগের ঘটনা?'

'বেশ অনেক দিন আগে।'

'তার পরে টের পেলেন কাল?'

'হ্যাঁ।'

'এর মধ্যে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সে-বিষয়ে কোনো কথা হয়নি?'

'না।'

'তখন কি বাক্সটি দেখেছিলেন?'

'সম্পূর্ণভাবে দেখিনি, এবং এও বুঝিনি যে ঐটিই এই গয়নার বাক্স। কেবল এটা বুঝেছিলাম একটা বাক্স এবং সেটা আমাকে দেখেই লুকিয়ে ফেললেন। কাল রাত্তিরে যখন আমার মা টের পেলেন তখুনি আমি বুঝতে পারলাম সেই বাক্সই এই বাক্স।'

'তা হ'লে সেই সন্দেহের উপর ভিত্তি ক'রেই আপনি আপনার স্ত্রীকে সন্দেহ করছেন?'

'হ্যাঁ। শুধু সন্দেহ নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

এর পরে ভদ্রলোক আরো দু-একটা কথা জিগ্যেস ক'রে বাইরে এলেন। সারাবাড়ি ঘুরে-টুরে এলেন দোতলায় প্রমীলার ঘরে।

কাল রাত্রে অনেক ঝক্কি গেছে শরীরের উপর দিয়ে। উঠতে আজ দেরি হয়েছিলো প্রমীলার। প্রাত্যহিক নিয়মে একবাটি দুধ আর জিলিপি খেয়ে (এটা তার বাপেরবাড়ির অভ্যাস) সবে সে ঢেঁকুর তুলে নিচে আসবার জোগাড় করছিলো, অপরিচিত লোক দেখে থমকে দাঁড়ালো।

'ইনিই আপনার স্ত্রী?'

'হ্যাঁ।'

'এঁকেই সন্দেহ করেন ?'

'হ্যাঁ।'

প্রশ্ন শুনে প্রথমটা প্রমীলা বুঝতে পারলো না ব্যাপারটা। একটু পরেই তার কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিলো, যেন একটা দুরন্ত অস্থিরতা নেমে এলো সারা শরীরে, তারপর হঠাৎ ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লো মেঝের উপর। আচমকা কপাল চাপড়ে কেঁদে উঠলো আর্তনাদ ক'রে। যত প্রশ্ন করলো ভদ্রলোক একটিরও জবাব দিলো না সে। কেবল মাথা খুঁড়ে-খুঁড়ে বিলাপ করতে লাগলো : 'আমার অদেষ্টে এ-ও ছিলো শেষে। স্বামী হ'য়ে ঘরের বৌকে তুমি চোর ব'লে তাড়াতে চাও। চরিত্র খারাপ হ'লে কি মানুষ এত অমানুষ হ'য়ে যায়, বাইরের স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়লে কি মানুষের আত্মা ব'লেও কিছু থাকে না। আমি তো তোমার কাছে আর-কিছুই চাই না, কেবল একটু প'ড়ে থাকতে চাই এইখানে, এই ভিটেতে—সেটুকুও কি এত অসহ্য যে তার প্রতিশোধ নিতেই এমন ক'রে তাড়াবার মতলব করলে মা-ব্যাটায় মিলে ?'

স্ত্রীর অভিনয় দেখে সুনির্মল স্তব্ধ।

গাড়ির পা-দানিতে পা দিয়ে ভদ্রলোক একটু টিটকিরি দিলেন : 'স্ত্রীকে চোর প্রমাণ ক'রে হাজতে দিলে কি আপনার খুব সম্মান বাড়বে ?'

'সেটা আমার দেখবার কথা, আপনাদের নয়।'

'সে তো ঠিকই। কিন্তু ধরুন, আপনার স্ত্রী যদি নিয়েই থাকেন, সেটাকে চুরিই বা ধরছেন কেন ? আপনার সম্পত্তি আর ওঁর সম্পত্তি তো আলাদা নয়।'

'ওটা আমার সম্পত্তি নয়। আমার মা-র। উনি না দিলে সেটা নেবার কারো কোনো অধিকার থাকে না।'

'হুঁ। কিন্তু কোথায় তা হ'লে জিনিসগুলো থাকতে পারে ব'লে আপনার ধারণা?'

'এঁর বাবার বাড়ি দমদম। আমি জানি সেখানে সার্চ করলে জিনিসগুলো পাওয়া যেতে পারে। ভদ্রলোকের নাম যজ্ঞেশ্বর মজুমদার, কন্‌ট্রাক্টরি করেন।'

গাড়ির ভিতরে ঢুকে ভদ্রলোক দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। গাড়ি ছেড়ে দিলো। নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুনির্মল।

৩

একটু পরে আস্তে এসে সুনির্মলের পিঠে হাত রাখলেন হিরণ্ময়ী। হাত ধ'রে তাকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে ব'সে পড়লেন মেঝের উপর, তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'খুলে বল্ তো তুই কী ভেবেছিস।'

'ঠিকই ভেবেছি।'

'কী ঠিক?'

'তুমি কি কিছুই বোঝোনি?'

'না।'

'তবে শোনো। ও-গয়না প্রমীলা আর প্রমীলার বাবাই চুরি করেছে। আমি ওদের ধরিয়ে দেবো।'

'ছি।'

'হ্যাঁ।'

'এতদিন পরে এ তোর কী দুর্মতি?'

'নিজের স্ত্রীকে, বিশেষত একজন মেয়েকে জেনেও বুঝেও চোর ব'লে পুলিশে দিতে এতদিন আমার লজ্জায় আটকাচ্ছিলো, ভদ্রতায়

আটকাচ্ছিলো, কিন্তু আজকের দিনে আমি ভেবে দেখছি এই বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার আমার এই একমাত্র আশা।'

'আমার একটা কথা শোন্—'

'তোমাদের অনেক কথা শুনেছি, অনেক ভালো তোমরা আমার করেছো। আর থাক। আজ আমার প্রাণ বাঁচাবার তাগিদের চাইতে অন্য-কিছুই বড়ো নয়।'

এ-কথায় কোথায় ব্যথা পেলেন হিরণ্ময়ী— একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'মান-সম্মান, পারিবারিক কলঙ্ক—'

'না, না, না। ও-সব তুমি রেখে দাও শিকেয় তুলে। কোনো কথা আমি শুনবো না।'

'এই কি তোর মুক্তির উপায়?'

'জানিনে। কিন্তু এই আমার একমাত্র উপায়।'

পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন হিরণ্ময়ী— 'শোন্।'

'কী?'

'এমনিতেই অশান্তির শেষ নেই— তাকে আর বাড়তে দিসনে। তুই পারবিনে এ-সব। কোথাকার জল শেষে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। জাল, জোচ্চুরি, মিথ্যে কথা কিছুই তো এদের আটকায় না।'

প্রায় ছুটতে-ছুটতে সুনির্মলের ছোটো ভাই এসে দরজায় দাঁড়ালো, 'দাদা, বৌদি যেন কোথায় চ'লে গেলেন।'

'কে?' হিরণ্ময়ী চকিতে দরজায় অভির দিকে তাকালেন।

'বৌদি। আমি মোড়ের চায়ের দোকানে বসেছিলাম, উল্টোদিকের ফুটপাতে তাকিয়ে দেখি একটা ট্যাক্সির মধ্যে বৌদি আর বৌদির ঝি, ড্রাইভারের পাশে ছ-নম্বর বাড়ির পরেশবাবুর ছোটো ভাই— সেই ভ্যাগাবণ্ড নরেশটা।'

হিরণ্ময়ীর নিশ্বাস বড়ো হ'য়ে উঠলো। সহসা উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলো সুনির্মল, 'ঠিক! ঠিক হয়েছে। তুই নিজের চোখে দেখেছিস? আর কেউ দেখেছে? ক'জন দেখেছে?'

দাদার প্রশ্নে অবাক হ'লো অভি, বললো, 'আমরা সবাই তো প্রায় দেখেছি।'

'কী, নাম কী তাদের? দরকার হ'লে তারা সাক্ষী দিতে পারবে কোর্টে?'

'সাক্ষী!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাক্ষী। বলবে ট্যাক্সি ক'রে একটা নামকরা বদমাসের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে দেখেছে স্ত্রীলোকটাকে—'

'ছি!' হিরণ্ময়ীর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে যেন ধিক্কার নিয়ে শব্দটা বেরিয়ে এলো, 'শেষে তুই এখানেও নেমে এলি? এত বড়ো মিথ্যেতে?' হাতে মুখ ঢাকলেন তিনি। মুখ সুনির্মলও ঢাকলো। শান্ত সুস্থির গম্ভীর মানুষটি সহসা ফুঁপিয়ে উঠলো ছেলেমানুষের মতো: 'আমি বাঁচতে চাই মা, বাঁচতে চাই।' অভি দোতলায় উঠে এলো। প্রমীলার ঘরের দরজায় এত বড়ো তালা। সেখানে একটা লাথি মারলো অকারণে। ফিসফিসিয়ে অত্যন্ত গর্হিত একটা শব্দ উচ্চারণ করলো, তারপর মনে-মনে বললো, 'ইঃ, ছি না ছি। মা-র আবার বাড়াবাড়ি। ঐরকম মেয়েগুলোকে তো ঐরকম ক'রেই মাথার চুল ন্যাড়া ক'রে ঘোল ঢেলে তাড়াতে হয়। পাজী—'

হিরণ্ময়ী মাটিতে চোখ রেখে বললেন, 'যজ্ঞেশ্বরবাবু কি এতই বোকা যে অতগুলো গয়না তাঁর নিজের ঘরেই রেখে দিয়েছেন। সার্চ করলে কি পাওয়া যাবে? আর যদিও যেতো প্রমীলা পুলিশের অনেক আগে গিয়ে সে-সব সরিয়ে ফেলবে।'

সুনির্মল হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো মা-র দিকে : 'তবে ও সে-জন্যেই গেল ?'

'খুব সম্ভব।'

প্রচণ্ড তেজ বুকে নিয়ে দুপুরের সুতীব্র রোদ থমকে রইলো আকাশের বুকে। উনুনের আগুন ছাই হ'য়ে গেল। পুলিশ এসেছিলো, সে-খবর বাতাসের বেগে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো পাড়ায়। চাকরটা ভয় পেয়ে পালালো, প্রতিবেশীরা তাজ্জব হ'লো ; অভি, সীমন্ত কোথায় গেল, কী খেলো খোঁজ রইলো না, অভুক্ত সুনির্মল আর সুনির্মলের মা দু-জনে দু-জনের মুখের দিকে তাকিয়ে ব'সে রইলো অভিভূতের মতো।

৪

যজ্ঞেশ্বর সবে খেতে বসেছেন, এমন সময় হন্তদন্ত হ'য়ে প্রমীলা এসে আছাড় খেয়ে পড়লো— 'বাবা, সব্বোনাশ !'

'কী, কী রে ?' মুখের কাছে কলায়ের ডাল দিয়ে মাখা প্রকাণ্ড গ্রাসতোলা লোমশ হাতটি নামিয়ে তিনি উৎকণ্ঠিত হ'লেন।

'পুলিশ ! পুলিশ !'

'পুলিশ ?'

'হ্যাঁ পুলিশ।'

'কোথায় ?' প্রায় কাঁপতে-কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন যজ্ঞেশ্বর, 'তুই কার সঙ্গে এলি ?'

'সব বলছি, ঘরে এসো।'

ভাতসুদ্ধু থালা তেমনি প'ড়ে রইলো। কোণের দিকে যেখানে

যজ্ঞেশ্বর বেশি-স্বাস্তিরে ব'সে হিসেব-নিকেশ করেন সেইখানে, সেই নিরিবিলিতে এসে দরজা ভেজিয়ে দিলো বাপ আর মেয়ে।

শোবার ঘরের রুগ্নশয্যা থেকে উঠে বসলেন সুধাময়ী। মেয়ের গলার আতঙ্কিত আওয়াজ তাঁর কানে গেছে। চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না, অগত্যা ঝিকেই দূরে দেখতে পেয়ে হাতছানি দিলেন। পারতপক্ষে এই স্ত্রীলোকটিকে তিনি কখনোই ডাকেন না। ছোট্টো ছোকরা আছে একটা, সে-ই আশপাশে ঘুরে বেড়ায়, ফুটফরমাস খাটে। কোথা থেকে বিনি মাইনেতে শুধু খোরাকি দিয়ে এটাকে সংগ্রহ ক'রে এনেছেন যজ্ঞেশ্বর কে জানে। ছেলেটা ভালো, ছুটি খেতে পেয়েই খুশির তার অবধি নেই। সুধাময়ী লুকিয়ে-চুরিয়ে ছু-চারটে পয়সা দেন ব'লে তাঁরই অনুগত বেশি। তা ছাড়া, সুধাময়ী ছাড়া আর কে তাকে এ-বাড়িতে মিষ্টিমুখে কথা বলে? কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে তিনি দেখতে পেলেন না।

এই রাঁধুনির আগে, যতদিন অন্তত একটু হাঁটা-চলাও করতে পেরেছেন সুধাময়ী ততদিন কোনোরকমে নিজেই চালিয়েছেন। বাড়িতে ঠাকুর-চাকর রাখা পছন্দ করেন না যজ্ঞেশ্বর। কেবলমাত্র খরচের জন্যই নয়, সাবালক একটা পুরুষ সারাদিন ঘরে-দুয়ারে হেঁটে বেড়ালে অন্তঃপুরের সম্ভ্রমহানি হয় ব'লে। অবিশ্যি দেখে-শুনে ঝি এনে দিয়েছিলেন একবার। স্ত্রীর শরীর এত খারাপ, একটা রান্নাবান্নার লোক না হ'লে কি চলে? ভালোই ছিলো মানুষটি, লজ্জানম্র অল্পবয়সী দুঃখী মেয়ে। আপন বলতে ত্রিসংসারে কেউ নেই তার, তাই বাধ্য হ'য়েই গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে খাটতে। স্বাস্থ্যের জৌলুস ছিলো। কিন্তু কয়েকদিন পরেই কোনো-এক গভীর রাত্রে একটি অস্ফুট মুখচাপা আর্তনাদ ভেসে এলো তার ঘর থেকে। ঘুম ভেঙে সুধাময়ী চমকে উঠলেন। অন্ধকারে বেড়ালের মতো পা টিপে-

চুপে যজ্ঞেশ্বর ঘরে এলেন ছায়ামূর্তি হ'য়ে। সুধাময়ী দাঁতে দাঁত চেপে, চোখে হাত চেপে শক্ত হ'য়ে নিজেকে সামলালেন। ঘেন্নায় তাঁর মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরুলো না। পরের দিন সকালে উঠে আর দেখা গেল না সেই ঝি-কে। ভয়ে ত্রাসে কত্তো রাত্তিরে কোথায় পালিয়ে বেঁচেছে হতভাগিনী কে জানে। না কি আবার কোনো যজ্ঞেশ্বরের কবলে পড়েছে তাই বা কে জানে।

যত অমানুষই হোক, তবু তো মানুষ। যজ্ঞেশ্বরেরও একটু চক্ষু-লজ্জা আছে বৈকি। তারপর থেকে আর ঝি আনবার কথা ওঠেনি কোনো। এসেছে এই ছোকরা। কিন্তু অবস্থা অচল হ'লে আর কী করা? সুধাময়ী শয্যা নিয়েছেন প্রায় ছ-মাস, রান্নার লোক না হ'লে চলে? অতএব এই পরিচারিকা। না, এর ঘর থেকে চাপা গলা ভেসে আসে না। মাঝে-মাঝে খুব খোলা গলায় খোলা ভাষাতেই নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নেয় সে। ঘোরপ্যাচের দরকার কী?

সুধাময়ীর ঘরে বলতে গেলে সে আসেই না। খাবার-দাবার সবই এই ছোকরা। তবু তো দরকার হয় মাঝে-মাঝে? হয়ই।

'কেন?' হাতছানিতে কাছে এসে দাঁড়ালো কুসুম।

'আমার মেয়ে প্রমীলার গলা শুনতে পেলাম না?'

'হ্যাঁ।'

'কেন এসেছে? কী হয়েছে? কার সঙ্গে এলো?'

'অত খবর জানিনে মা, বলছে পুলিশ পুলিশ। তারপর তো ঐ। বাপের সঙ্গে দরজা বন্ধ ক'রে কী ফুসুর-ফুসুর গুজুর-গুজুর করছে।'

কী আর করেন। তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা ক'রে রইলেন। কী অঘটন ঘটিয়ে এলো কে জানে? যতই করুক, যা-ই করুক, তবু তো দশ মাস পেটে ধারণ করেছিলেন? নিজের শরীর বিচ্ছিন্ন ক'রেই তো বার

করেছিলেন এই শরীর। মায়া কাটাতে পারেন কই? মন থেকে যেমন নিঃশেষে স্বামীকে বাদ দিতে পারেন, স্বামীর সন্তানকে তা পারেন না।

অনেক পরে মা-র ঘরে এসে দাঁড়ালো প্রমীলা। 'কী রে? কী হয়েছে রে?' সুধাময়ীর স্তিমিত চোখের দৃষ্টি জলজলে হ'য়ে উঠলো।

'কী আবার হবে? তোমার গুণধর জামাই মাগী নিয়ে আসবেন কিনা, তাই আর আমাকে পছন্দ হচ্ছে না!'

চুপ হ'য়ে গেলেন সুধাময়ী। কী অভদ্র! কী অশ্লীল!

'আমাকে চোর ব'লে হাজতে দেবে, দিক না। দেখি না একবার কত খেমতা, কে কাকে হাজতে দেয় দেখিয়ে ছাড়বো না মা-ব্যাটাকে! ঐ হারামজাদী কি সোজা নচ্ছার, ওই তো যত নষ্টের গোড়া।'

'ছি!'

'ছি আবার কী! কিছু বলি না ব'লে তাই। কিন্তু সিধে আঙুলে তো ঘি ওঠে না। ভেবেছিলাম বুড়িকে যা হোক দু-বেলা দু-মুঠো দেবো ছড়িয়ে যদ্দিন না মরছে। কিন্তু এখন দেখছি মাগী দু-দুটো ষাঁড়ের মতো ছেলে নিয়ে ঘাড়ে ব'সে খাচ্ছে আর পেত্নির মতো রক্ত চুষছে, আমি তা সহ্য করবো? যদি আমি বাপের বেটি হই— যদি আমার মা অসতী না হয় তবে তুমি দেখে নিয়ো মা, ওদের সব-ক'টাকে আমি ঢিট বানিয়ে ছাড়বো। আর ঐ শাঁকচুন্নী মাগী, ঐ কেলে কিস্কিন্দি, ওদের সেই বোনের ননদটা শকুনি না গৃধিনী, তাকেও আমি একবার দেখে নেবো। তলায়-তলায় জল খাই, একাদশীর বাপেও জানে না। ভেবেছে টের পাই না কিছু, ঠিক ভেতরে-ভেতরে সাট আছে। তা নইলে বিয়ের দিন আবার বিয়ে ভেঙে দেয় কেউ? জানি না? বুঝি না?'

মুখ বেঁকিয়ে, আঙুল মটকে, দাঁত ঘ'ষে, একেবারে উথাল-পাথাল করতে লাগলো প্রমীলা। তারপর রাগ শান্ত হ'লে বাপের সঙ্গে খেতে বসলো গিয়ে।

৫

পুলিশ এলো সন্ধ্যায়। বাড়ি সার্চ ক'রে কিছুই পাওয়া গেল না। যজ্ঞেশ্বর লাফাতে লাগলেন টাট্টু ঘোড়ার মতো। এই অপমানের তিনি শোধ নেবেন, মানহানি আনবেন সে-জামাই-এর নামে, সব ঘোঁট, সব নষ্টামি ভেঙে দেবেন কোর্টে। পুলিশের ভদ্রলোকেরা তাঁর চিৎকারে আস্ফালনে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চ'লে গেল, আর অশ্লীল কথার খই ফুটতে লাগলো যজ্ঞেশ্বরের মুখে।

কী যে হ'লো ব্যাপারটা ভালো ক'রে কিছুই বুঝতে পারলেন না সুধাময়ী। স্বামীর গলার জোরে, মেয়ের দাঁত নিষ্পেষণে, পুলিশের খানা-তল্লাসিতে সব মিলিয়ে তাঁর শরীর যেন অবসন্ন হ'য়ে এলো; মন অস্থির হ'য়ে উঠলো। জনে-জনে জিজ্ঞাসা ক'রে ধমকই খেলেন শুধু। কিন্তু বুঝলেন সব রাত্তিরে। খাওয়া-দাওয়ার পরে যখন যজ্ঞেশ্বর নিজের ঘরে শুতে না গিয়ে মেয়ে নিয়ে তাঁর ঘরে এসে অতি সন্তর্পণে দরজা-জানালা বন্ধ করলো।

দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে মাদুর বিছিয়ে তাঁর ঘরের মেঝেতে এসেই বসলো ওরা। তারপর আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো কোথা থেকে ধনরত্ন এনে ছড়িয়ে দিলো মেঝেতে। তাকিয়ে হাঁ হ'য়ে গেলেন সুধাময়ী।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, 'রাতারাতি সব সোনা গলিয়ে ফেলে ইঁট ক'রে রাখাই ভালো। কী বলিস?'

প্রমীলা বললো, 'না।'

যজ্ঞেশ্বর বললো, 'এত গয়না, এ-সব তুই এখন রাখবি কোথায়? একবার যখন কথা উঠেছে— একদিন শেষে সর্বনাশ হবে।'

'আমি ঠিক রাখবো, কিন্তু সোনা আমি গলাবো না।'

'গলাবি না তো মর্ বুকে চেপে রেখে। ভালো বুদ্ধি তো কানে যায় না, মনে লাগে না। আজ যদি মালশুদ্ধ ধরাই পড়তিস কী হ'তো

ভবে? ভাগ্যিস্ সরাতে পেরেছিলাম! শুধু সোনা হ'লে তো আর সে-ভয় থাকে না।'

'তা হোক।'

'তা হ'লে এ-সব আমি আমার বাড়িতে রেখে বিপদ ডেকে আনতে পারবো না।'

'আমি নিজেই রাখবো।'

'তুই কোথায় রাখবি?'

'সে আমার জায়গা আছে।'

'হ্যাঃ! জায়গা আছে!' যজ্ঞেশ্বর অসহিষ্ণু হ'য়ে খিঁচিয়ে উঠলেন, 'বড়ো ওস্তাদ হয়েছিস!'

'আমি এ-সব নিয়েই যাবো এবার। সব মিলিয়ে আমার সাতাশটা গয়না আছে। তিনশো ষাট ভরি সোনা, আর একশো টাকার নোটে দশখানা ক'রে-ক'রে বাইশটা বাণ্ডিল— দেখি—' প্রমীলা দু-হাতে সাপটে সব কোলের কাছে টেনে নিয়ে গুনতে লাগলো। লোভে আর উত্তেজনায় চোখের দৃষ্টি তার বীভৎস হ'য়ে উঠলো, হাত কাঁপতে লাগলো।

একটানে সব কেড়ে আনলেন যজ্ঞেশ্বর— 'আবার গুনছেন ছাখো-না, কেন, তোরটা কি আমি চুরি করেছি না বাটপাড়ি করেছি যে গুনে-গুনে মিলোচ্ছিস? ক'খানা গয়না, কতো ভরি সোনা, ক'বাণ্ডিল টাকা— এত হিসেব-নিকেশের দরকারটা কী শুনি?'

'এত— এত গয়না কার?' সুধাময়ীর চোখের কোটর থেকে ডিম দুটো যেন বেরিয়ে এলো: 'তোমরা কার সর্বনাশ করেছো? ছি, ছি, ছি! শেষে কি তোমরা এ-সবও আরম্ভ করলে? তোমরা এত ছোটোলোক, এত হীন!' বুকের শ্বাস তাঁর ঝড়ের মতো দ্রুত হ'লো, 'হাজার হোক ভদ্রলোক তো, ভদ্রলোকের সন্তান তো। ছি-ছি—'

'চুপ।' যজ্ঞেশ্বরের চাপা-গর্জনে ঘরের দেয়াল কেঁপে উঠলো। সুধাময়ী চমকালেন কিন্তু থামলেন না, উঠে বসলেন। দুটি জীর্ণ হাত বালিশে রেখে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, 'না, না, আমার চোখের সামনে এ-সব আমি হ'তে দেবো না। কিছুতেই দেবো না। অনেক, অনেক সহ্য করেছি আমি, উপায় নেই ব'লেই সহ্য করেছি— কিন্তু আজ আমি বুঝেছি, তুমি শুধু লম্পটই নও, মিথ্যাবাদীই নও, লগ্নি-কারবারে পরের সর্বস্ব অপহরণ ক'রেই ক্ষান্ত নও, তুমি একটা দুর্ধর্ষ ডাকাত, তুমি চোর! কার সর্বনাশ করেছো বলো। নইলে আমিই পুলিশে খবর দিয়ে ধরিয়ে দেবো তোমাদের। নিশ্চয়ই ধরিয়ে দেবো। আর তুই— তুই একটা স্ত্রীলোক হ'য়ে, আমার মেয়ে হ'য়ে শেষে এই হলি? তুই ম'রে যা, ম রে যা—' গলা চিরে গেল সুধাময়ীর, যজ্ঞেশ্বর সহসা উঠে এসে তাঁর মুখ চেপে ধরলেন প্রাণপণ শক্তিতে। প্রমীলা ভুরু কুঁচকে চন্দনকাঠের বাক্সের মধ্যে একখানা-একখানা ক'রে গুনে-গুনে তুলতে লাগলো গয়নাপত্র।

মূর্ছা গেলেন সুধাময়ী। শরীরে কী আছে তাঁর। কিসের জোরে লড়াই করবেন এত বড়ো অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কতোটুকু তাঁর ক্ষমতা? তিনি চোখ বুজে প'ড়ে রইলেন বিছানায়। হাত ঝেড়ে যজ্ঞেশ্বর আবার এসে বসলেন: 'শোন্, এ-সব নিয়ে এখন তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। ও থাক আমার কাছে, আমি গালিয়ে-টালিয়ে ঠিক ক'রে রেখে দেবো। তুই কাল সকালেই চ'লে যা ওখানে, তারপর হালচাল বুঝে—'

'না, আমি গালাবো না।' প্রমীলার স্বর দৃঢ়।

প্রমীলা তার সহজাত কূটবুদ্ধি দিয়ে কেমন ক'রে জানি বুঝে ফেলেছে এই সোনা গালালে তার আদ্ধেকই উড়ে যাবে কোথায়, আর তা সে ফিরে পাবে না। বাপকে সে যতই ভালোবাসুক কিন্তু বিশ্বাস তো করতে পারে না।

এ নিয়ে ঝগড়া হ'লো খানিকক্ষণ। তারপর রফা হ'লো গালানোতেই, কেননা এত গয়না নিয়ে হজম করা যে সত্যিই অত্যন্ত কঠিন কাজ সেটা প্রমীলা বুঝতে পারলো শেষ পর্যন্ত।

'আর টাকা?'

'টাকা আছে ব্যাঙ্কে।'

যজ্ঞেশ্বর শুতে যাবার আগে একটু রসিকতা করলেন মেয়ের সঙ্গে, 'তুই তো এখন আমার চেয়েও বড়ো মহাজন। লক্ষ টাকার গয়না, বাইশ হাজার টাকা নগদ। বুড়ি কম নয়, অ্যাঁ? চুরি ক'রে-ক'রে কম জমায়নি মাগী!'

'জমাবে না! ছেলের টাকাগুলো তো সবই বোঁচকা বেঁধেছে।' মুখ ঝামটা দিয়ে গায়ের আঁচল সমান করলো প্রমীলা— 'আবার আমাকেই চোর ব'লে ধরিয়ে দিতে চায়। ত্যাখো-না, কী শোধ তুলি আমি!'

শেষ পর্যন্ত কিছুই হ'লো না, কোনো আশাই পূর্ণ হ'লো না সুনির্মলের। জিনিস পাওয়া গেল না, কেস উঠলো না, চোর ব'লে স্ত্রীকে বর্জন করার কোনোই প্রশ্ন রইলো না আইনের খাতায়। মাঝখান থেকে উকিলের পাল্লায় প'ড়ে কিছু অর্থদণ্ড আর প্রচুর দুর্নাম লাভ হ'লো শুধু। ব্যাপারটা চাপা দিতে চেষ্টা করেছিলেন হিরণ্ময়ী, কিন্তু এ-কান থেকে ও-কান, এ-মুখ থেকে ও-মুখ হ'তে-হ'তে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এমন কি প্রত্যেকটি চেনা মানুষ পর্যন্ত জেনে ফেললো ঘটনাটি। আর সঙ্গে-সঙ্গে একবাক্যে ছি-ছি ক'রে উঠলো সবাই। স্ত্রীকে যে লোক মিথ্যে মামলা সাজিয়ে চোর ব'লে হাজতে দেবার চেষ্টা করে সে যে একটা কী মানুষ সে-কথা ভেবে ফেলতে এক লহমা দেরি হ'লো না কারো। ঠাট্টায়, বিদ্রূপে, নিন্দায়, গালাগালিতে তৎক্ষণাৎ মুখর হ'য়ে উঠলো সবাই। সুনির্মলের বাড়ি থেকে বেরুনো প্রায় অসম্ভব হ'লো।

ভাঙা ঝরঝরে গাড়ি নিয়ে যজ্ঞেশ্বর দু-দিন পর্যন্ত অবিশ্রান্ত ঘুরে-ঘুরে জামাই-এর কীর্তিকলাপ ঘোষণা ক'রে অশ্রুমোচন ক'রে এলেন চেনাশুনো আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের বাড়ি-বাড়ি। সুনির্মলের এতদিনকার সব সুনাম খড়ির দাগের মতো মুছে গেল। যারা এতদিন মুখের সামনে হিরণ্ময়ী আর তাঁর ছেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলো, আর অন্তরে হিংসায় জ্বলছিলো, তা'রা বাড়ি ব'য়ে ঘুরিয়ে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল; যারা সত্যিই ভালোবাসতো তা'রা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলো, মানুষ এমনও হয়? যারা ভালো ক'রে চিনতো না তা'রা না-দেখেও বুঝে নিলো লোক কেমন।

হিরণ্ময়ী লজ্জায় দুঃখে প্রায় শয্যা নিলেন। অভি বললো, 'ধুত্তোরি,

এ-বাড়িতে ভদ্দরলোক থাকতে পারে?' অতএব পড়া ছেড়ে কোথায় এক চাকরির জোগাড়ে চ'লে গেল কার সঙ্গে। সীমন্ত মনে-মনে ভাবলো, আর কয়েকটা মাস, কোনোরকমে আই. এ.-টা পাস ক'রে নিই।

আর সুনির্মল! তার কথা থাক।

একটা মিটমাট না-হওয়া পযন্ত কয়েকটা দিন দমদমেই রইলো প্রমীলা, তারপর সময় বুঝে, সুযোগ বুঝে আবার এসে হাজির হ'লো সদম্ভে। পাড়ার মেয়েরা বললো, 'ধন্য বৌ, এব পরেও আবার স্বামীর ঘর করতে এসেছে, আমরা হ'লে অমন স্বামীর মুখ দেখতাম না।' আত্মীয়রা মুখ বেঁকিয়ে ঝংকার দিলো, 'শুধু কি সোয়ামিটাই বদ, শাশুড়িটাও কম না, জানি না ওদের কেচ্ছা? সেই বিদ্রুপ ননদটাকে নিয়ে কি কম কীর্তি করলো? মেয়েটার নামে টাকা বেখে গেছে বুঝি কিছু ওর বাপ ওর বিয়ের জন্য, সেই ক'টা টাকার লোভেই তো এত। ছি-ছি! এদিকে এই বৌটার বাপকেও তো মুচড়ে-মুচড়ে নিতে কম নেয়নি।'

ভদ্রলোকরা বললেন, 'মহিলার স্বামীর নামে মানহানি আনা উচিত ছিলো। এই জন্যেই তো এই বাঙালি মেয়েগুলোর এই দশা। আত্মসম্মান ব'লে তো কোনো পদার্থ নেই।' কয়েকদিন পর্যন্ত পাড়ায় এ ছাড়া কোনো কথাই রইলো না, কোনো আলোচনাই হ'লো না। অল্পবয়সী ছেলেরা ঘোঁট পাকালো, আবার যদি লোকটা স্ত্রীকে কোনো অপমান বা অসম্মান করে তা হ'লে কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থাই করতে হবে।

সকলের এ-রকম একটা সহযোগিতার ইন্ধন পেয়ে প্রমীলা আরো দুর্ধর্ষ হ'য়ে উঠবার অবকাশ পেলো। কড়ায় ক্রান্তিতে সে আদায় ক'রে নিতে লাগলো আপন কর্তৃত্ব আর অন্যের নির্যাস। সাধ্য কি আর তাকে কেউ কিছু বলে।

২

এই রকম একটা খাঁচায়-পোরা ইদুরের মতো দিন কাটাতে-কাটাতে স্থনির্মল হঠাৎ একদিন দমকা হাওয়ার মতো একটি চিঠি পেলো শকুন্তলার কাছ থেকে। মানুষের বুদ্ধি আর হৃদয় যে বেশির ভাগ সময়েই বিপরীতগামী সে-কথাই বারে-বারে বোঝাতে চেয়েছে সে। তাই চিঠি না-লিখে পারলো না। সেখানে, সেই নির্জনে, স্বজনবিরহিত পাটনা শহরের সেই প্রান্তরে, বকুলতলার ছোট্টো কোয়ার্টরের অন্তরে ব'সে একটুখানি কুশল সংবাদের প্রার্থনা করেছে সে স্থনির্মলের কাছে। বড়ো ছোটো প্রার্থনা। বড়ো ক্ষীণ।

জ্বরতপ্ত কপালে স্নেহভরা শীতল হাতের ছোঁযার মতো মিষ্টি সেই চিঠিটুকু। স্থনির্মল পড়লো, পড়া শেষ হ'লে একাগ্র চোখে তাকিয়ে রইলো অক্ষরগুলোর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে হাত বুলোলো লেফাপার এ-পিঠ ও-পিঠ। এক চিঠির জবাবে হাজার-হাজার চিঠি রচনা করলো কোটি-কোটি কথার মিছিল সাজিয়ে, তবু শেষ হ'লো না কথা। সব তবু বলা হ'লো কই ?

কিন্তু সবই মনে-মনে। লক্ষ ইচ্ছেতেও কাগজের বুকে কলম ছোঁয়ালো না সে। কী লাভ। যে-আগুন নেবাতে পারবে না সে-আগুন সে জ্বালবে কোন যুক্তিতে? নিজে পুড়ছে ব'লে কি প্রিয়তমাকেও পোড়াতে পারে? জীবনে সে যা পেলো না, পেতে পারলো না, সেই ব্যর্থতা কেন আরেক জনের বুকে ঢেলে দেবে? তার চেয়ে থাক, এই থাক, এই স্মৃতিটুকুই অক্ষয় হ'য়ে থাক— সে ছিলো, কখনো ছিলো, হৃদয়ের সবটুকু মাধুর্য নিয়ে সে একদিন ছিলো তার মনের মধ্যে। তারপর কালের প্রলেপে সবই তো ধুয়ে যাবে একদিন। একদিন নিশ্চয়ই শকুন্তলা ভুলে যাবে তাকে, মেঘ কেটে গিয়ে উজ্জ্বল রোদে ভ'রে

যাবে তার মনের আকাশ, আবার কুঁড়ি ধরবে, ফুল ফুটবে, শকুন্তলা সুখী হবে।

কয়েকটা দিন একটা মোহের মতো একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে কাটালো সুনির্মল ঐ চিঠিটি নিয়ে। কতো-কিছু ভাবলো, কতো-কিছু ভাবলো না। নিজের একলা নিঃসঙ্গ নির্ঘুম রাত্রে তারার দিকে তাকিয়ে রইলো আকাশে। আপিসের ফাইল ঠেলে রেখে চোখের তলায় পেতে রাখলো সেই ছাইরঙা একফালি কাগজের টুকরো। তারপর মন আবার আস্তে-আস্তে ভ'রে গেল মেঘে, বর্ষণহীন চাপা গুমোটে যখন দম বন্ধ হ'য়ে এলো, মনে হ'লো, থাক মা, থাক প'ড়ে নাবালক ভাই, সমাজ সংসার লজ্জা সম্ভ্রম চাকরি সব প'ড়ে থাক পেছনে, আমাকে বাঁচতেই হবে, যেতেই হবে আমাকে সেখানে, যেখানে আমি তাকে পাবো, যেখানে এ-রকম তিলে-তিলে মরতে হবে না নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে, মাসের শেষে যেখানে প্রত্যেকটি পাই তুলে দিতে হবে না স্ত্রীর হাতে, ফিরতে হবে না বাড়িতে, ঘুমুতে হবে না মেয়েলি গন্ধে ভরা গা-ঘিনঘিন-করা চার দেয়ালের ফোকরে! ঠিক এমনি দিনে আরেকখানা চিঠি এলো তার কাছে, প্রমীলার মা সুধাময়ী লিখেছেন।

৩

সুধাময়ী! তার শাশুড়ি? প্রমীলার মা। এই জগৎ-সংসারে যে এইরকম একটি মানুষের কোনো অস্তিত্ব আছে এমন অদ্ভুত কথাই তো কোনোদিন মনে হয়নি সুনির্মলের। ধুধু স্মৃতির মতো রোগা ছোট্টো একজন মহিলাকে মনে পড়লো তার, আধো ঘোমটা-ঢাকা সকরুণ একখানা মুখ। সেই বিয়ের সময় দেখেছিলো। ভদ্রমহিলা দু-ছত্র ভরা কেবল একটি সকাতর কাকুতি জানিয়েছেন, একবার যেন সুনির্মল দেখা দেয় তাঁকে। তিনি

অত্যন্ত অসুস্থ, তাঁর এই অন্তিম ইচ্ছেটুকু যেন পালন করে সে। পরিষ্কার শিক্ষিত হাতের লেখা, বলবার ভঙ্গিটি আন্তরিক আর সহজ। চিঠির তলায় পুনশ্চ দিয়ে যাবার জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় লেখা আছে। লেখা আছে, সেই দিন সেই সময় তিনি একা থাকবেন। জামাই-এর সঙ্গে বলতে গেলে এই প্রথম (হয়তো এই শেষ) সাক্ষাতকে তিনি অন্য মানুষের উপস্থিতিতে ঘোলাটে করতে চান না।

চিঠিটি অপ্রত্যাশিত। চিঠির ভাষাও তাই। সুনির্মল একটু অবাক হ'লো। ছুয়ে-ছুয়ে যে চার, এ-কথাটা যেন ঠিক মিললো না। শকুন্তলার চিঠি বুক-পকেটে রেখে এই চিঠিটির দিকেই এবার সে তাকালো মনোযোগের সঙ্গে।

সব আদর্শ, সব বিবেক ভেসে যাচ্ছিলো তার। ক'দিন ধ'রে মনে-মনে শকুন্তলার কাছে যাবার একটা অদম্য ইচ্ছের সঙ্গে লড়াই করছিলো সে। তার বদলে দমদম যাবার কথাটাই এবার সে চিন্তা করলো। ওটা তার যাবার জায়গা নয়, ওখানকার হাওয়া তার নিশ্বাসরোধী। তবু কেমন একটা কৌতূহল বোধ করলো, মনে হ'লো এ-মানুষটার কথা একবার শোনা দরকার, কেননা, এঁর জীবনের সঙ্গে হয়তো তার জীবনের খানিকটা সাদৃশ্য থাকলেও থাকতে পারে। সে যেমন প্রমীলার স্বামী, তিনিও তো তেমনি যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রী। নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে কার না কৌতূহল হয়? তা ছাড়া মুমূর্ষু মানুষের অন্তিম বাসনা, সেটাকে অবহেলা করতেও মনে-মনে কোথায় আঘাত লাগলো।

তবু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হ'তো কিনা কে জানে, কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট সময়ে আরেকখানা চিঠি নিয়ে একটি ছেলে এসে দেখা করলো আপিসে। জামাইকে গাড়ি ক'রে নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন সুধাময়ী। হয়তো ধ'রে নিয়ে যেতে। চিঠিতে আরেকপ্রস্থ মিনতি।

ছেলেটি বিনীত, কাঁচা বয়সের লাবণ্যে ভরা মুখশ্রী, প্রমীলার পিসতুতো ভাই রাখাল।

গাড়িতে ব'সে অতিশয় সংকোচের সঙ্গে অল্প-অল্প আলাপ করলো সে সুনির্মলের সঙ্গে। আই. এ. পাস করেছে অতি কষ্ট ক'রে। একটি চাকরি চায়। মামী, অর্থাৎ প্রমীলার মা ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই। কিন্তু মামী আর কী করতে পারেন? কতোটুকু ক্ষমতা আছে তাঁর হাতে। বাজারের পয়সাটি পর্যন্ত মামা গুনে দেন। তার উপরে তাকে তো মামার মেয়ে প্রমীলা কবেই তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে। তবু সে লুকিয়ে-লুকিয়ে মামীকে দেখতেই আসে এ-বাড়ি, তার যেমন মামী ছাড়া কেউ নেই, মামীরও তেমনি সে ছাড়া আর কে আছে?

চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সব শুনলো সুনির্মল।

৪

দাঁত বার-করা বিশ্রী বাড়ি, ঢুকতে ঘেন্না করে। একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত অসংখ্য ভাড়াটে; বোধ হয় ঘরে-ঘরে আলাদা লোক। কলরবে কান পাতা দায়। দোতলার পেছনের অংশে তাকে নিয়ে এলো রাখাল। কী কাজে যজ্ঞেশ্বর কলকাতার বাইরে গেছেন দু-দিনের জন্য, সেই সুযোগে সুধাময়ী ডেকে পাঠিয়েছেন জামাইকে।

ভাদ্রের দুপুর, টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিলো বাইরে, অথচ রোদের ঝিলিকও ছিলো। প্রকাণ্ড ডালপালা-ছড়ানো তেঁতুলের ঝিরিঝিরি পাতার তলা দিয়ে, কাঁচা মাটির কাদায় জুতো ডুবিয়ে বাইরে দিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় পৌঁছতে-পৌঁছতে সুনির্মলের শার্টে জলের ছাঁট লাগলো। মনে-মনে বিরক্ত বোধ করলো সে। কেন এলো, কেন এমন একটা দুর্বলতা হ'লো তার সে-কথা ভেবে যেন রাগ হচ্ছিলো নিজের উপর।

রাখাল মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের কথা পাঠ করলো কিনা কে জানে, লম্বা বারান্দা পার হ'তে-হ'তে করুণ মুখে বললো, 'এই যে, এই তো ঘর। ঈশ্! আপনি ভিজে গেলেন, আর ওখানটা এমন নোংরা হ'য়ে থাকে— কতো কষ্ট হ'লো আপনার।'

ঘর-জোড়া প্রকাণ্ড উঁচু খাটের উপরে একপাশে একটি ছোটো বিছানায় চুপচাপ শুয়েছিলেন সুধাময়ী। লম্বালম্বি আদ্ধেক খাট জুড়ে সারি-সারি ঢাকনা-পরানো ট্রাঙ্ক সাজানো। তার উপর চাদর ঢাকা স্তূপ-করা বিছানা-বালিশ। মাথার কাছে ছোটো লোহার সিন্দুক আলমারি, গায়ে গণেশের মূর্তি, তার উপরে সিঁদুরের ছাপ। মেঝেতে খাটের সামনে একফালি জায়গা, দেয়াল ঘেঁষে সেখানেও জিনিসের অভাব নেই। তারই মধ্যে সুধাময়ী দু'খানা চেয়ার এনে পাতিয়ে রেখেছিলেন, পায়ের শব্দে হাতের ভরে মাথা রেখে সচকিত হ'য়ে পাশ ফিরে তাকালেন। জামাই-এর মুখের উপর চোখ রেখে মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি তাঁর ঝাপসা হ'য়ে উঠলো। স্নেহে ভ'রে উঠলেন তিনি। আহা! কী সুন্দর ছেলে। এই তাঁর জামাই? এমন তার ভাগ্য? পাড়-ওঠা মোটা শাড়িটির আঁচল মাথায় তুলে দিয়ে আকুল গলায় বললেন, 'এসেছো?'

সুনির্মল লক্ষ্য করলো ভদ্রমহিলার কপালে বা সিঁথিতে যেমন এক ছিটে সিঁদুর নেই, মুখেও তেমনি একবিন্দু রক্ত নেই।

সিঁদুর ছেড়েছেন সুধাময়ী বহুকাল। আয়নায় মুখ দেখে, চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ে সযত্নে সিঁদুর এঁকে দেবেন সিঁথিতে এ-বাসনা তাঁর বহুকাল আগেই শেষ হয়েছে। ভাবতে পর্যন্ত ভালো লাগে না। স্বামীকে অস্বীকার করবার, নিজের অপমানিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত জীবনের উপর একটা প্রতিশোধ নেবার এই হয়তো এক দুর্বল চেষ্টা। তা ছাড়া, আর কী-ই বা তিনি করতে পারেন। কাপড় দিয়ে নাকের তলা থেকে মুখের বাকি

অংশটুকু ঢেকে আবার বললেন, 'সকাল থেকে আমি এই বিকেলের আশায় আছি।'

'সেজন্য আমাকেই তোমার প্রশংসা করা উচিত মামী, আমি না-গেলে বুঝি আসতেন!'

'আসতে না?' হাসিমাখা করুণ চোখ মেলে দিলেন সুধাময়ী, কেমন একটা মমতায় ভ'রে গেল সুনির্মলের মন। এতক্ষণকার বিরক্তি মুছে ফেলে মৃদু হেসে বললো, 'আসতাম বই কি!' সুনির্মল বসলো। আর বসতেই সুধাময়ী লক্ষ্য করলেন তার শার্ট ভেজা-ভেজা, শাদা ধবধবে জিনের প্যাণ্টে ছিটছিট জল। অস্থির হ'য়ে উঠলেন, 'ভিজেছো? বৃষ্টি নাকি বাইরে? তবে কী হবে? এই ভেজা জামা গায়ে দিয়ে—'

সুনির্মল বাধা দিলো—'ও কিছু না। আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এখুনি শুকিয়ে যাবে।'

'জামাটা খুলে রাখো না, শুকুলে শেষে—'

'না, না, কিছু হবে না।' সুনির্মল ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো।

সুধাময়ী বললেন, 'আমার ভাগ্যই এ-রকম। যাও-বা এলে, ভিজে-পুড়ে কষ্ট পেয়ে—'

'কী আশ্চর্য। সামান্য বিষয়ে আপনি অত অস্থির হচ্ছেন কেন? এইটুকু জল, টোকা দিলেই ঝ'রে যাবে।'

একটু চুপ ক'রে রইলেন সুধাময়ী, তারপর বললেন, 'কতোদিন ভেবেছি যদি তুমি একবার আসতে, চোখ ভ'রে দেখে নিতাম। কতোবার মনে-মনে বলেছি চিঠি লিখি, কিন্তু—'

'লিখলেই পারতেন।'

'কী লিখবো, কোন্ লজ্জায় লিখবো? কী তোমাকে আমি দিয়েছি যা নিয়ে এখানে, এই বাড়িতে আদর ক'রে ডাকবো তোমাকে।' বলতে-

বলতে যেন কান্না নেমে এলো গলায়, 'কিন্তু আমার আর সময় নেই, এতদিনের চেষ্টায় আয়ুটাকে বোধ হয় ফুরোতে পেরেছি। তাই ভাবলাম, এই বেলা যা বলবার ব'লে নিই, যা দেখবার দেখে নিই। ভারি ইচ্ছে করলো একবার তোমাকে শেষ দেখা দেখি।'

স্থনির্মল চুপ ক'রে রইলো।

'তবু তোমাকে আমি আজ এমনি-এমনিই ডাকিনি। একটা বিশেষ কথা বলবার জন্যই আসতে বলেছি।' ক্লান্ত চোখ একটু-সময়ের জন্য বুজে ফেললেন সুধাময়ী, নিশ্বাসকে বিশ্রাম দিলেন। তারপর মৃদু হেসে আবার বললেন, 'গ্যাখো, পূর্বজন্মে আমি দেখতে ভালো ছিলাম না, বাপও ছিলো নিতান্ত দরিদ্র। কাজেই এক দরিদ্রের সংসার থেকে আরেক দরিদ্রের সংসারে গিয়ে পড়লুম। স্বামী ছিলেন কালো-কুলো খারাপ দেখতে, মোটাসোটা ভালোমানুষ। টোলে পণ্ডিতি করতেন, মাসের আদ্দেক না-কাটতেই টান পডতো ভাতে। ভালো লাগতো না, বলতুম, বুদ্ধি ফিকির খাটিয়ে উপার্জনের চেষ্টা করো, নাকে তেল দিয়ে কেবল টোল আর বাড়ি, বাড়ি আর টোল করলে কি পেট চলে? ভারি রাগ হ'তো, দুঃখ হ'তো, মনে-মনে ভাবতুম, আর-জন্মে ম'রে যেন চেহারাটা একটু সুন্দর পাই, যেন একটু বিত্তবান বাপের ঘরে জন্মাই। তা হ'লেই কপালে এমন পোড়া হাঁড়ির মতো রং আর অলস স্বামীর বদলে একজন কর্মঠ মানুষ জুটবে, আর মানুষটার ঘরে মুঠো-ভরা ভাত-কাপড়েরও অভাব হবে না। বন্ধ্যা ছিলাম ব'লে সন্তানের আকাঙ্ক্ষাও বড়ো কম ছিলো না। ঈশ্বর আমার সেই নিঃশব্দ মনোবাসনা সব শুনতে পেলেন। তারপর জন্মান্তর ঘটিয়ে এই জন্মে নিয়ে এসে অক্ষরে-অক্ষরে সব পাইয়ে দিলেন। আমি তো শান্তি চাইনি, তাই শান্তিকে একেবারে শূন্য ক'রে দিলেন জীবন থেকে—'

'মামী, তুমি কিন্তু বড়ো বেশি কথা বলছো।' তার শান্ত সুস্থির স্বল্পবাক্ মামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রাখাল অবাক হ'য়ে গেল।

সুধাময়ী রাখালের মুখের দিকে তাকালেন, 'ডাক্তারি করছিস? তার চেয়ে, যা, রান্নাঘরে গিয়ে ওর জন্য একটু চায়ের জোগাড় ক'রে নিয়ে আয়।'

রাখাল চ'লে যেতে একটু চুপচাপ থেকে সুনির্মল বললো, 'আপনার অসুখ কদ্দিন?'

'ঠিক বিছানায় পড়েছি মাস ছয়েক, কিন্তু অসুখ আমার অনেক দিনের।'

'কী অসুখ?'

'যদি শরীরের অসুখের কথা জিগ্যেস করো তা হ'লে আমি তা বলতে পারবো না, তা বলা যায় না। আর মনের অসুখের কথা আমি না-বললেও আর কেউ না বুঝুক তুমি তো বুঝবে। সে-কষ্ট যে কী কষ্ট তা হয়তো তুমিও—'

সুনির্মল শাশুড়ির মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইলো। শাদা কাগজের মতো মিশে আছেন বিছানার সঙ্গে, সারা শরীর চাদরে ঢাকা, ছোট্টো মুখের আদ্ধেকটুকুই মাত্র বেরিয়ে আছে তার তলা থেকে। নিশ্বাসের দ্রুত ওঠাপড়ায় বুকের শাদা চাদরটা নড়ছে।

'কিন্তু আসল কথা শোনো!' গর্তে-বসা দুটো চোখ বড়ো-বড়ো দেখালো সুধাময়ীর। একটু থামলেন। বোঝা গেল কথাটা বলতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। হঠাৎ যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলের মধ্যে—'তোমার মা-র গয়নার বাক্স এ-বাড়িতেই আছে। এই লোহার সিন্দুকেই আছে। যদি-বা গয়না না থাকে তা হ'লে তার সোনা আছে। আমার দুর্বৃত্ত স্বামী আর তারই যোগ্য মেয়ে দু-জনে মিলে এই কাণ্ড করেছে!' সুধাময়ী

রুদ্ধস্বরে কেঁদে উঠলেন, 'এর পরেও তুমি জিগ্যেস করবে আমার কী অসুখ? বাবা, জীবন ভ'রে যত দুঃখ ওরা দিয়েছে এই লজ্জার তুলনায় তা কিছুই নয়।'

সুনির্মল স্তম্ভিত হ'লো।

'যেদিন জেনেছি সেদিন থেকেই চেষ্টা করছি তোমাকে খবর দিতে, পেরে উঠিনি। কেমন ক'রে দেবো? আর দিলেই বা কী হবে? ওরা এই সিন্দুক যক্ষের মতো আগ্‌লে রাখে। আমার মেয়ে একদিন দু-দিন বাদে-বাদেই এসে দেখে যায়। আমি প'ড়ে থাকি চুপচাপ মরার মতো। সাধ্য কী কথা বলি! তারপর উনি কাল কোথায় গেলেন দু-দিনের জন্য ব্যবসার কাজে। সেই থেকে সারাদিন আমি প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে-দিয়ে সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় সিন্দুকের চাবিটা খুঁজেছি, এই গ্যাখো—' বালিশের তলা হাত্‌ড়ে একটা প্রকাণ্ড চাবি বের করলেন তিনি, চাদরের তলা থেকে নিজের হাতটিও প্রসারিত করলেন জামাই-এর দিকে। সুনির্মল চাবিটা দেখলো না, হাতটা দেখলো। কনুই থেকে হাতের পাতা পর্যন্ত নগ্ন অংশটি শুক্‌নো-শুক্‌নো ঘায়ে খসখসে। জামাই-এর চোখের দিকে তাকিয়ে হাতটি ঢেকে ফেললেন, তাঁর ঘোলাটে-ঘোলাটে চোখের কোল বেয়ে দু-ধারা জল কানের পাশের চুলে গিয়ে মিশলো। একটু দম নিলেন।

'আমার সাধ্য নেই এই চাবি দিয়ে ঐ সিন্দুক খুলে তার অন্ধকার থেকে কিছু বার করি।'

উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে উঠে বসবার চেষ্টা ক'রে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'দরজা বন্ধ ক'রে দাও, দরজা বন্ধ ক'রে দাও। একটা ঝি আছে এ-বাড়িতে, সে কিন্তু বড়ো ভীষণ। তাকে আমি ফাঁকি দিয়ে বাইরে অন্য কাজে পাঠিয়েছি, যদি এসে পড়ে—'

চাবিটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুনির্মল। একটা হিংস্র অনুভূতিতে জ্বালা ক'রে উঠলো বুকের ভেতরটা।

'খোলো, শিগ্‌গির খোলো, খুলে সব, সব নিয়ে যাও। বিধবার সর্বস্ব ওরা চুরি করেছে— দাও, পুলিশে খবর দাও, আমি, এই আমি মরতে-মরতে সাক্ষী দেবো ওদের বিরুদ্ধে—' সুধাময়ী জোরে-জোরে হাঁপালেন— 'আর শোনো, ওর মধ্যে রাখালেরও কিছু সম্পত্তি আছে, যদি খুলতে পারো তা হ'লে ওর মায়ের গয়নাগুলোও আছে কিনা সেটা ওকে দেখতে দিয়ো—'

দরজা ঠেলে রাখাল ঢুকলো ঘরে। এক হাতে চা, আরেক হাতে প্লেট-ভর্তি খাবার।

'দরজা বন্ধ ক'রে দে, দরজা বন্ধ ক'রে দে—' ত্রাসে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ব্যাকুল দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে বললেন সুধাময়ী, 'নাও বাবা, তুমি আর দেরি কোরো না, তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো।'

অদ্ভুত একটা উত্তেজনায় সুনির্মলের ভেতরটাও কেঁপে-কেঁপে উঠছিলো। যন্ত্র-চালিতের মতো এগিয়ে গেল সিন্দুকের কাছে, আর সুধাময়ী ওখানে ব'সে-ব'সেই চাবি ঢোকাবার কৌশলটা ব'লে দিতে লাগলেন। ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইলো রাখাল, মনে হ'লো কোনো ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের একটি পাতায় চোখ আটকে আছে তার। পেছনে আধ-খোলা দরজার শাড়ি-কাটা ময়লা পুরোনো পর্দা হেলতে লাগলো বাতাসে।

দশম পরিচ্ছেদ

বাড়িঘরের সেদিন সংস্কার করছিলো প্রমীলা।

ভাঁড়ার ঘরের জিনিসপত্র কিছু এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখলো, কিছু জড়ো ক'রে রাখলো ঐ ঘরেরই কোণে একটা টুল পেতে, তারপর উঠোনে-ফেলে-রাখা তক্তপোশটা এনে পেতে দিলো সেখানে। একতলার সামনের ঘর আর হিরণ্ময়ীর ঘরটির জন্য মনে-মনে ভাড়াটে ঠিক করেছিলো সে। একশো তিরিশ টাকা দিয়ে এত বড়ো একটা আস্ত বাড়ির দরকার কী তাদের? মিছিমিছি টাকা চিবিয়ে খাওয়া। তার বাবার বাড়ির তিন তলায় তিন তিরিক্কে ন'খানা ঘরে সাত ঘর ভাড়াটে, মাঝের তলার মাত্র দু'খানা ছোটো ঘরেই তো তার বাবার অত জিনিসপত্রসুদ্ধ দিব্যি কুলিয়ে যাচ্ছে। এই উপলক্ষে ছোটো-দেওর সীমন্তর সঙ্গে তার এক পশলা ঝগড়া হ'য়ে গেল। কথাটা প্রমীলা ভাঙেনি কারো কাছে, কিন্তু সীমন্ত ঝি-র মুখে জেনেই তেড়ে এলো, 'তুমি নাকি ঘর সাব-লেট করছো?'

'তা করি আর না-ই করি তোর কাছে কৈফিয়ত দেবো নাকি?'

'দেবেই তো। আমাদেরও তো বাড়ি।'

'কার বাড়ি! তোর বাড়ি?'

'হ্যাঁ, আমারও বাড়ি। কাকে জিগ্যেস করেছো তুমি? দাদাকে? মাকে?'

'যা যা, বেশি-বেশি মুখ নাড়িসনে। খেতে দিই, পরতে দিই, থাকতে দিই, তাই ঢের মনে করিস।' প্রমীলা আপন কাজে ব্যস্ত হ'লো।

সীমন্ত গলার শির ফুলিয়ে বললো, 'রোজ-রোজ খাওয়াপরার কথা তুলবে না ব'লে দিচ্ছি। ভালো হবে না। আমার দাদার টাকায় যেমন

আমরা খাই, তেমনি তুমিও খাও। তোমার তো আর টাকা নেই, তোমার বাবারও না। আর আমার মা-র গয়না টাকা সব কে নিয়েছে শুনি! শুনি সে-কথা?' সব ছেলে-মেয়ের মধ্যে এই ছোটো ছেলেই হিরণ্ময়ীর অতিশয় অশান্ত, অতিশয় মুখর। এর সঙ্গেই প্রমীলা পেরে ওঠে না।

হাতের ঝাঁটা নিয়ে সে তেড়ে এলো— 'যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা তোর। ঘাড় ধ'রে আজ যদি তোকে আমি বার না-ক'রে দিই—'

'করো দেখি, কতো বড়ো সাহস তোমার।'

'করবোই তো। হারামজাদা, আজই তোকে বার করবো। বুড়ো ঢেঁকি, ভাইয়ের উপর প'ড়ে-প'ড়ে খাস্, লজ্জা করে না? গলায় দড়ি জোটে না?'

'তোমার লজ্জা করে না? তোমার দড়ি জোটে না?'

'আমার কেন লজ্জা করবে, দড়ি জুটবে। আমি কি তোরটা খাই, না তোর বাপেরটা খাই!'

'আমার দাদারটা তো খাও।'

'ওরে আমার দাদা রে!' প্রমীলা তার মুখের সামনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এগিয়ে দিলো। 'আমার সোয়ামির ঘাড়ে ব'সে আমার দাড়ি ওপ্‌ড়াস, এই তো তোর মুরোদ। বদমাস, বজ্জাত—'

প্রমীলার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শিত হাতটি এক ধাক্কায় সবেগে সরিয়ে দিলো সীমন্ত, 'তোমার সোয়ামি আগে, না আমার দাদা আগে সেটা শুনি? কার অধিকার বেশি? আর বড়ো তো স্বামী-স্বামী করছো, স্বামী যেন তোমাকে কতোই পোঁছে। তোমার সঙ্গে কি জীবনে একটা কথা বলে, না তোমার ঘরের ধার দিয়েও হাঁটে? তোমাকে দেখলে সকলে ঘেন্না করে।'

'তবে রে হতচ্ছাড়া—' ধাক্কা খেয়ে দেয়ালে টাল সামলে গায়ের কাপড়

কোমরে জড়ালো প্রমীলা, রাগে অধীর হ'য়ে হাতের ঝাঁটাটাই সে ছুঁড়ে মারলো সীমন্তর দিকে। সীমন্ত স'রে গিয়ে রক্ষা করলো নিজেকে, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে-যেতে বললো, 'ডাইনি!' একেবারে শেষ সিঁড়িতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'একদিন ঠিক পুলিশে ধরিয়ে দেবো। চোর। চোর। চোর।'

দুদ্দাড় নেমে এলো প্রমীলা, গলার তীক্ষ্ণ আওয়াজে দেয়াল কাঁপিয়ে সীমন্তর পিঠের উপর অশ্রাব্য কুশ্রাব্য অতিশয় ভয়ংকর সব মন্তব্য ছুঁড়ে মারলো, কিন্তু সীমন্তকে ছুঁতে পারলো না। দরজা খুলে সে ততক্ষণে বড়ো রাস্তার মোড়ে পৌঁছে গেছে। সেই ঝাল খানিকক্ষণ শাশুড়ির উপর ঝেড়ে প্রমীলা উপরে উঠে সোজা সুনির্মলের ঘরে এলো। সুনির্মল আজকাল অভি সীমন্তর ঘরে চ'লে এসেছে। অভি তো নেই-ই, সীমন্তও নিচে মা-র কাছে থাকে। সুনির্মলের একলা ঘরের ঘুম অবিশ্যি প্রায়ই আলোড়িত করে প্রমীলা কিন্তু তবু তো একটা সময় দরজা বন্ধ ক'রে নির্জন হ'তে পাবে সে। সারারাত তো আর চ্যাচাতে পারে না। ঈশ্বরের দয়ায় ঘুম তার বেশি।

সেই ঘরে এসে প্রমীলা তচনচ করলো সব। বিছানা তুলে নিয়ে গেল নিজের ঘরে, কাগজপত্র, বই-টই সব রাগের চোটে ফেলে দিলো মেঝেতে, হ্যাঙারে-ঝোলানো শার্ট কোটের আর হাল রাখলো না। যত রাগ তার স্বামীর উপরেই ফুটতে লাগলো। ইঃ, স্ত্রীর সঙ্গে শোবেন না বাবু, শোবে, শোবে, শোবে। একঘরে থাকবে না। থাকবে। থাকবে। থাকবে। পৃথিবীসুদ্ধু সবাই থাকে আর সে থাকবে না! সীমন্তর কথায় মনের কোন তারে আঘাত লেগেছে তার। আলাদা শোয় ব'লেই তো এত বড়ো কথা ও ব'লে গেল? পোঁছে না! পোঁছা-না-পোঁছার তুই কী বুঝিস রে হারামজাদা? টাকাকড়ি তোকে দেয়, না তোর মাকে দেয়?

না, দিলে সেটা পাঁচজনে মেনেই নেয়? বাবা তো বলেইছেন আর-কিছু বজ্জাতি করুক না বাছাধন, একেবারে পথে বসিয়ে ছাড়বো না! কেন, মাইনের টাকা এনে সেদিন নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলো না, তারপর? তারপর কী হ'লো? পারলো প্রমীলার সঙ্গে? প্রমীলার হ'য়ে যজ্ঞেশ্বর ইংরিজিতে তক্ষুনি চিঠি লিখে দিলেন না আপিসে! আর সেই চিঠি দেখেই তো ভয়ে এইটুকু!

তার ক্রুদ্ধ হাতের ঠ্যালা লেগে ওয়াড্রোবের উপর থেকে চিনেমাটির একটা ফুলদানি প'ড়ে গিয়ে ভেঙে চুরচুর হ'য়ে গেল, অ্যাটাচি কেসটা উল্টে প'ড়ে তার মুখ খুলে হাঁ হ'য়ে ছড়িয়ে গেল সব জিনিস। বিছানার তোশকের তলা থেকে বেরিয়ে কতকগুলো কাগজ উড়তে লাগলো বাতাসে।

দু'খানা চিঠি! এলোমেলো জিনিসপত্রের ফাঁকে চুপচাপ শুয়ে আছে নিরিবিলি। একখানা খাম শাদা আর একখানা নীল। সব ভুলে চিঠি পড়তে বসলো প্রমীলা। দু'খানা খামের উপরেই বাংলা পরিষ্কার হাতের লেখায় সুনির্মলের নাম, ঠিকানাটা ইংরিজিতে। নিজের মা-র হাতের লেখা তার চেনা উচিত ছিলো, কিন্তু মনের কোথাও সে-কথা নেই ব'লেই ধরতে পারলো না। নীল খামের ভেতর থেকে টেনে বার করলো শকুন্তলার চিঠিটা, তারপর এক নিশ্বাসে প'ড়ে ফেললো। পড়তে-পড়তে তার শাদা মুখ লাল হ'লো, দাঁতের সঙ্গে দাঁত আটকালো, নাকের বাঁশি ফুলতে লাগলো আর নিবতে লাগলো, চিঠিটাকে দুমড়ে মুচড়ে, পা দিয়ে মাড়িয়ে, থুতু ছিটিয়ে একাকার ক'রে দিলো। তারপর পড়লো সুধাময়ীর চিঠি। সঙ্গে-সঙ্গে স্প্রিং-এর পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, দৌড়ে নিচে এলো, আবার উপরে উঠলো, তারপর যেমন ছিলো ঠিক তেমনিই চাকর নিয়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। বড়ো রাস্তার মোড়ে এসে ট্যাক্সি নিলো।

সুধাময়ী বললেন, 'পেয়েছো ?'

স্থনির্মল বললো, 'না।'

'ছাখো, ছাখো, ভালো ক'রে ছাখো।'

'আমি আর পারছি না—'

'যদি সে-সব না-ই পাও তবে আমার যা আছে সব নাও।'

'ছি !'

'না, না, ছি নয়। তোমাদেরই তো জিনিস, তোমরা ছাড়া আর কে আছে আমার ? কী আছে ?'

'আপনি ভালো হ'য়ে উঠুন, তারপর সব হবে।' স্থনির্মল আলমারির পাট বন্ধ করলো, আর ঐ পাতলা শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে খাট থেকে চাদর ঠেলে নেমে এসে দাঁড়ালেন সুধাময়ী। 'তোমার তো নিজের হাতে নিতেই যত সংকোচ, আমি দেবো। আমার জিনিস আমি তোমাকে ভালোবেসে দেবো, সব দেবো। যাবার আগে এই একটা মাত্র আকাঙ্ক্ষা আমাকে পূরণ করতে দাও তোমরা। আয় রাখাল, আয়, তোরটাও তোকে দিয়ে দিই।'

এতক্ষণে সম্পূর্ণ মানুষটিকে দেখতে পেলো স্থনির্মল। আঁচল এলিয়ে পড়েছে, মাথার কাপড় খ'সে গেছে, পাগলের মতো উদ্‌ভ্রান্ত চোখ, ঠোঁটের দুই কবে দগ্‌দগে ঘা, চুলগুলো এত পাতলা যে মাথার মস্থণ অংশ সাদাটে হ'য়ে-হ'য়ে বেরিয়ে পড়েছে, পায়ের পাতা ফেটে-ফেটে চৌচির।

স্থনির্মলের মনে হ'লো দৌড়ে পালিয়ে যায় সেখান থেকে, শিহরিত হ'য়ে সে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো।

সুধাময়ী ঝন্‌ঝন্ ক'রে আলমারি থেকে একটার-পর-একটা মূল্যবান সঞ্চয় ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন মেঝেতে।

'পাপ! পাপ! সব পাপ! সব আজ দূর ক'রে দে রাখাল।' স্বামীর কাণ্ড দেখে রাখাল তাজ্জব হ'লো, এগিয়ে এসে জাপ্‌টে ধরলো তাঁকে, 'তুমি করছো কী! পাগল হ'য়ে গেলে নাকি?'

'ছাড়, ছেড়ে দে।' সুধাময়ীর গায়ে যেন প্রচণ্ড শক্তি ঢেলে দিয়েছে কে! এক ঝাপটায় রাখালকে সরিয়ে দিলেন। দরজার পুরোনো কাপড়ের পাতলা পর্দা ন'ড়ে উঠলো জোরে, একটা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলো প্রমীলা। একসঙ্গে তিনজন মানুষ চমকে উঠে স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

'তবে রে এই, এই হচ্ছে তোমাদের?' একটা ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়লো সুনির্মলের উপরে, 'জোচ্চোর, নির্লজ্জ, শাশুড়ির সঙ্গে সাট ক'রে তুমি চুরি করতে এসেছো এখানে? আর তুমি, মা, তুমি ম'রে যাও না কেন, কেন মরো না, তিন কাল গিয়ে এক কাল ঠেকেছে, শেষে তুমি জামাই-এর সঙ্গে, ছিঃ।'

'চুপ!' একেবারে গর্জে উঠে ছুটে এগিয়ে এসে মেয়ের গালে এলোপাতাড়ি চড় মারতে লাগলেন সুধাময়ী, 'অনেক, অনেক আমি সহ্য করেছি, আর না। আর না। আর আমি পারবো না। পারবো না। পারবো না।' তাঁর গলার সুতীক্ষ্ণ আওয়াজ এই ঘরের দরজা জানালা পর্দা ভেদ ক'রে অন্যান্য ঘরে গিয়ে পৌঁছলো, সেই সব ঘরের সচকিত অধিবাসীরা ছুটে এলো চারদিক থেকে স্রোতের মতো।

৩

সকলকে পাশ কাটিয়ে কেমন ক'রে কখন যে সুনির্মল বেরিয়ে এলো রাস্তায়, নিজেই যেন টের পেলো না। পানাপুকুর, ভাঙা ঘাট, পোড়োবাড়ি— এ-ধারটা নেহাতই গ্রাম। ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার ঝাপসা আলোতে পকেট থেকে দেশলাই বার ক'রে একটা সিগারেট ধরালো। উদ্‌ভ্রান্ত

শ্রান্ত মনের উপর একটি অপরিসীম বেদনাবোধ আচ্ছন্ন করলো তাকে।

এইমাত্র কোথা থেকে এলো, কী অবস্থা থেকে কাপুরুষের মতো সকলের অলক্ষ্যে পালিয়ে এলো, নাটকের চরম নিষ্পত্তি পর্যন্ত কেন সে দাঁড়িয়ে থাকলো না, বীরের মতো মুখোমুখি হ'য়ে রক্ষা করলো না দুর্বল পক্ষকে— সব কথা মুছে গেল মন থেকে। মনের উপর স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হ'য়ে শুধু সুধাময়ী ভেসে রইলেন, যে-মহিলার হাতে ঘা, পায়ে ঘা, ঠোঁটে ঘা, মাথায় টাক। এই বীভৎস রোগের জন্য যিনি এক তিল দায়ী নন, এই পাপের জন্য ফলভোগ যাঁর নিতান্তই ঈশ্বরের অবিচার। সত্যিকারের দুঃখ কী, দুঃখের অস্তিত্ব কতো দুর্বিষহ তা যেন প্রত্যক্ষ করলো সুনির্মল। মনের মধ্যে তার এই বোধ জাগলো যে, নিজেরটাই সবচেয়ে বড়ো নয়। পৃথিবীতে আরো আছে। আরো অনেক, অনেক।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে, বাস-স্টপে এসে অপেক্ষা করতে-করতে, বাসে রেক্‌সিনের ছেঁড়া গদিতে ব'সে থাকতে-থাকতে সমস্তটা সময় একটি কথাই ভাবলো সে। তারপর এক-সময় নিজেকে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠলো। এখানে সে কেন এসেছে? কী চায়? কোথায় যাবে? গেলেই বা কী হবে।

শরীর এলিয়ে এলো, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করলো, পা টলতে লাগলো। না, আর সে দাঁড়াতে পারছে না— আর সইতে পারছে না নিজের ভার। এবারে বিশ্রাম। সেই বিশ্রাম আছে সেখানে, সেই নির্জনে, স্বজন-বিরহিত পাটনা শহরের সেই প্রান্তরে, বকুলতলার ছোট্টো কোয়ার্টরের অন্তরে।

সুনির্মল পকেট থেকে মনিব্যাগ বার ক'রে তার গহ্বরে উঁকি মারলো,

তারপর হুইলরের স্টল থেকে একটি টাইম-টেব্‌ল কিনে এনে কোনো চায়ের দোকানে গিয়ে বসলো।

৪

প্রমীলা বাড়ি পৌঁছলো প্রায় রাত দশটায়। কড়া নাড়ার শব্দে হিরণ্ময়ী তাড়াতাড়ি সীমন্তকে তুলে দিলেন। সুনির্মল এখনো বাড়ি ফেরেনি, মনে-মনে সেই উদ্বেগে চুপচাপ অন্ধকার ঘরে জেগে ছিলেন তিনি। দু-দিন থেকে মাথায় তাঁর অসম্ভব যন্ত্রণা হয়েছে, শরীর এত খারাপ যে চোখ চাইতেও পরিশ্রম। বিরক্ত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে আলো জ্বাললো সীমন্ত।

গজ্‌গজ্‌ করলো আপন মনে। আবার এসেছে কেন মরতে, দরজা আমি খুলে দেবো না। যখন খুশি তখন বাপেরবাড়ি যাবেন, যখন খুশি ফিরে আসবেন, আর আমরা তো সব মাইনে-করা গোলাম আছি বাড়িতে। কেন, চাকর নিয়ে গেছে কেন? ও জানে না যে নিবারণ না থাকলে রান্না হবে না। আমরা খাবো কী, সে-চিন্তা নেই? নিজের ঝি-টিকে তো আবার সোহাগ ক'রে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

সীমন্তর এত কথায় উত্যক্ত হ'লেন হিরণ্ময়ী, ঈষৎ রাগ ক'রে বললেন, 'কী বকর-বকর করছিস তখন থেকে। শিগ্‌গির যা, তোর দাদা এসেছে।'

'দাদা? দাদা এখনো বাড়ি আসেননি?'

'কখন এলো? আমি তো সেই থেকে জেগে আছি।'

'ও।' তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরুলো সীমন্ত। এতক্ষণে তার মনে হ'লো রাত দশটায় আর বাপেরবাড়ি থেকে ফিরে আসবে না বৌদি। মুখের বিরক্তি-রেখা মুহূর্তে মুছে গেল।

দরজা খুলতেই ঝংকার দিলো প্রমীলা, 'করছিলি কী এতক্ষণ? ম'রে ছিলি সব? কখন থেকে কড়া নাড়ছি কানে আর যায় না, না?'

'না।' সীমন্ত তৎক্ষণাৎ অ্যাবাউট টর্ন করলো। ফিরে এ-দিকের দরজার কাছে এসে বললো, 'রাত বারোটায় পাড়া জ্বালাতে আসবে ব'লে সব জেগে ব'সে থাকবো কিনা! এত তো ভালোবাসার বাপেরবাড়ি, কী ক'রে জানবো যে সেখানে তোমার একটা রাতও জায়গা হয় না।'

প্রমীলার সঙ্গে নিবারণ ছাড়াও আর-একজন বুড়োমতো লোক এসেছিলো, তার বাবার কর্মচারী। প্রমীলা বিদায় দিচ্ছিলো তাকে, সীমন্তর কথা শুনে সেই বিদায় তার শেষ হ'লো না, চিড়বিড়িয়ে দরজার কাছে লাফিয়ে এলো, 'বেরো, বেরো হতচ্ছাড়া আমার বাড়ি থেকে, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো সব আপদ।'

সীমন্ত ততক্ষণে ঘরে গিয়ে ছিট্‌কিনি তুলে দিলো।

উপরে উঠে এলো প্রমীলা। সীমন্তর সঙ্গে এখন কথা কাটাকাটি করবার মতো মনের অবস্থা নয় তার।—শেমিজের মধ্যে শকুন্তলার চিঠি থরথর করছে, এ-আগুন না-নেবা পর্যন্ত তার শান্তি কই? সুনির্মলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যই এখন তার সমস্ত মন উন্মুখ হ'য়ে আছে।

এমনিতেই আসতে কতো দেরি হ'য়ে গেল। উপায় ছিলো না। সেই যে মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সুধাময়ী অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন, জ্ঞান হ'লো এই একটু আগে। ততক্ষণে তার রাখালকে তাড়াতে হয়েছে ঘাড় ধ'রে, দরজা বন্ধ ক'রে সিন্দুকের আনাচ-কানাচ খুঁজতে হয়েছে গয়নার জন্য; তারপর অপেক্ষা করতে হয়েছে মা-র জ্ঞান না-হওয়া পর্যন্ত। সিন্দুকের চাবি না আটকে তো আর আসতে পারে না? চাবি ঘোরাবার কৌশলটা জানা ছিলো না তার। এত রাত্তিরে অত সোনা বুকে নিয়ে আজ হয়তো আসতোই না সে, কিন্তু আসতেই হ'লো। সুনির্মলের মুখোমুখি হবার জন্যেই আসতে হ'লো। তা ছাড়াও হয়তো আরো-একটু

কারণ ছিলো, হয়তো যজ্ঞেশ্বরের অনুপস্থিতিতেই ও-বাড়ি ত্যাগ করতে চেয়েছিলো সে।

কিন্তু কোথায় সুনির্মল? না ঘরে, না ছাতে, না বাথরুমে, না কলতলায়। মায়ের কাছে লুকিয়েছে নাকি কচি খোকা? দুম্‌দুম্‌ ক'রে আবার তক্ষুনি নেমে এলো নিচে। হিরণ্ময়ী শুয়ে আছেন মেঝেতে, খাটের উপরে সীমন্ত। অত বড়ো মানুষটাকে তা হ'লে কোথায় লুকোলো এরা? হিরণ্ময়ী ক্লান্ত গলায় বললেন, 'সুনু এখনো বাড়ি ফেরেনি।'

'ফেরেনি?'

'না।'

'আপনি ঠিক বলছেন?'

'মিথ্যে ব'লে কী লাভ?'

'তবে মিন্‌সে গেল কোথায়?' যেন জলতে-জলতে বেরিয়ে এলো সে ঘর থেকে, খর্‌-খর্‌ ক'রে আবার উঠে এলো উপরে। না, শান্তি নেই, সোয়াস্তি নেই, ঝগড়া না-করা পর্যন্ত কোনো সুখ নেই তার। বুকের ভেতর থেকে-থেকে আগুন জ্ব'লে উঠছে, হিংসার আগুন। আর সেই আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে হৃদয়। শেমিজের মধ্যে হাত গলিয়ে বার করলো চিঠিটা। মোচড়ানো, দুমড়োনো, থুতু-মাখানো চিঠি। কী ভেবে এ-চিঠি সে ফেলে দেয়নি, তুলে নিয়েছিলো আবার। প্রমাণ কি কেউ নষ্ট করে?

৫

এমন রাত আর কাটেনি প্রমীলার জীবনে। কোনোদিন কোনো কারণেই এমন হয়নি যে কিছুতেই তার ঘুম এলো না। শেষের দিকটায় মেজাজ এমন আগুন হ'লো যে ঐ গভীর রাত্তিরে এলোপাতাড়ি লাথি

ছুঁড়ে কুঁজোটা ভেঙে ফেললো, আলনার ধুতিশাড়ি ছিঁড়তে লাগলো দাঁত দিয়ে। সুনির্মলের জামা জুতোগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলো বাইরে। তবু তার রাগ প্রবোধ মানলো না। দাঁতে দাঁত ঘ'ষে কেবল ভাবতে লাগলো, এবার কী করি! কী করি? রাগের চাপে মুখ-চোখ তার লাল হ'য়ে উঠলো। ঘর থেকে ছাত, ছাত থেকে নিচে, নিচে থেকে উপরে, এই ক'রে-ক'রে শেষে ক্লান্ত হ'য়ে এক-সময় ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের দিন বেলা ন-টা দশটার সময় যজ্ঞেশ্বর এলেন মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। বাড়ি ফিরেছেন ভোরবেলা, এসেই কালকের হুলুস্থুলের একটা বর্ণনা শুনেছেন ঝি-র কাছে, তাই সঠিক খবরের জন্য ছুটে এসেছেন এখানে।

প্রমীলা সবে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে তখন। কাল দুপুরের সেই ছড়ানো-ছিটোনো জিনিসপত্রে, জামাতে-জুতোতে, কাগজের কুচিতে ঘর একহাঁটু। সেদিকে তাকিয়ে ঝি-এর অনুপস্থিতিটা অসহ্য হ'লো। রাগে চিড়চিড় ক'রে উঠলো শরীর। 'মাগী কি মরেছে নাকি? তিন দিনের নাম ক'রে পাঁচ দিন হ'য়ে গেল, আসবার নামটি নেই। একবার আসুক-না, মুখে নুড়ো জেলে বিদেয় করবো না?'

ঝি-এর বদলে নিবারণ এসে দাঁড়ালো পর্দার ফাঁকে। সঙ্গে-সঙ্গে রাগটা নিবারণের উপরই পড়লো তার।

'আবার তুই মরতে এসেছিস কেন? তোরা কি আমাকে একদণ্ড শান্তিতে টিকতে দিবিনে?'

নিবারণ ভীতু গলায় বললো, 'বেলা হয়েছে অনেক, এবার বাজারে না গেলে যে কিছু পাবো না।'

'ও, বাজারে যেতে হবে? কেন শুনি? কালিয়া-কোর্মা রেঁধে আজ কাকে পিণ্ডি গেলাবে?'

'কাল আপনার সঙ্গে দমদম চ'লে গেলাম, রাত্তিরে আর উনুনই ধরেনি। ছোটোবাবু আগ করছিলেন। তবু তেনি মেলে হোটেলে খেয়ে আসতি পারেন, কিন্তু মা—'

বারুদ জ্বললো, 'বুড়ি মাগীর পেটের জ্বালা উঠেছে বুঝি? আর তুই এসেছিস তার মোক্তার হ'য়ে সাউখিরি করতে। ওরে আমার বন্ধু রে। বেরো, বেরো বলছি এখান থেকে। আমার বাড়িতে আজ থেকে আর-কারো পাত পড়বে না, এই আমি ব'লে রাখলুম। ওদের ব'লে দিস্ সে-কথা, আর তুইও জেনে নিস্। যা।'

ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে যাচ্ছিলো নিবারণ, প্রমীলা আবার ডাকলো তাকে। 'শোন্, ঐ মুখপোড়া হতচ্ছাড়া ছোঁড়াটাকে এখুনি চ'লে যেতে বল্। আমি যেন আর তার মুখ না দেখি।' আলমারি থেকে একটা সিকি বার ক'রে ছুঁড়ে মারলো, 'এই নে, আমার জন্য চার আনার কচুরি জিলিপি এনে দে। কচুরির সঙ্গে বেশি ক'রে তরকারি আনবি। তাড়াতাড়ি আসবি। আগে দুধের কড়াটা উপরে রেখে যা। বাড়িতে তো আর বেড়াল কুকুরের অভাব নেই।'

ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে যজ্ঞেশ্বর ঢুকলেন ঘরে— 'কী রে পেমি, কী হয়েছে রে কাল বাড়িতে?'

'ও মা, তুমি এসে গেছো? কখন এলে?' বাপকে দেখে মুখের ভাব নিমেষে বদলে গেল প্রমীলার। দু-হাতে বিছানা-বালিশ সরিয়ে বসতে দিলো তাড়াতাড়ি, 'সে আর বোলো না। সে-সব কুকীত্তির কথা শুনলে তুমি কানে আঙুল দেবে।'

'কী! কী কথা?'

'নিজেদেরই কেচ্ছা, নিজেদের ঘরেরই কলঙ্ক, কী আর বলবো।' প্রমীলা গুছিয়ে বসলো— 'আগে মা-র কাণ্ড শোনো, তারপর জামাই-এরটা

শুনো।' চোখ ঘুরিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে, রং চড়িয়ে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাটি ঘণ্টাখানেক ধ'রে বিবৃত করলো সে। আর সব শুনে কতক্ষণ থ' হ'য়ে রইলেন যজ্ঞেশ্বর। অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'দেখি সেই চিঠি?'

প্রমীলা বিছানার তলা থেকে শকুন্তলার আধ-ছেঁড়া চিঠিটা বার ক'রে হাতে দিয়ে বললো, 'ছাখো, বেশ্যা মাগীর ঢলানি ছাখো।' এক-পলকে চিঠিটা শেষ ক'রে যজ্ঞেশ্বর বললেন, 'আর তোর মা'রটা?'

'মা'রটা কোথায় ফেলেছি খুঁজে পেলাম না।'

রীতিমতো রেগে উঠলেন যজ্ঞেশ্বর, 'তবে এটা দিয়ে আমার কোন্ শ্রাদ্ধ হবে। সেটাই তো আমার দরকার।'

মুখভাব করলো প্রমীলা, 'শাশুড়ি জামাই-এর কাছে লিখেছে সেটাই বেশি গর্হিত, না একটা ছুকৃরি একজন—'

'নে, নে, চুপ কর্। ও-সব থাকেই পুরুষের। অত ঘ্যানঘেনে হ'লে চলে না।' উঠে দাঁড়ালেন, 'তা হ'লে সোনাগুলো তুই নিয়ে এসেছিস সব?'

ভারি মুখ আরো ভারি ক'রে প্রমীলা জবাব দিলো, 'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কেন আনবো না? তোমার তো ঘরের শত্রু বিভীষণ! মা-ই যেখানে লোক ডেকে আনে চুরি করাতে—'

'বেশ। এবার তো আমি এসেছি, এখন দিয়ে দে।'

'না, ও আমার কাছেই থাক।'

'মানে?' যজ্ঞেশ্বর ভুরু কুঁচ্‌কে মেয়ের দিকে তির্যক দৃষ্টি হানলেন।

'হ্যাঁ, আমার কাছেই রাখবো।'

'তোর কাছে রেখে কি জেলে যাবি!'

'না, জেলে যাবো কেন? এখন তো সব সোনার ইঁটই ক'রে ফেলেছো, কে চিনবে এগুলো কবে কার গয়না ছিলো?'

'যদি সুনির্মল জিগ্যেস করে এত সোনা পেলি কোথায় ?'

'করবে না।'

'করবে না তুই জানিস ?'

'হ্যাঁ, আমি জানি করবে না। এ-সব সে দেখবেই না।'

'দেখবে, দেখবে, দেখবে।' দাঁতে দাঁত ঘষলেন যজ্ঞেশ্বর, 'আমি বলছি দেখবে।'

'আমি জানি দেখবে না। সে এ-ঘরেই কম আসে, তার উপর আলমারি তো কোনোদিন খোলে না। আমার কী কাপড় আছে, কী গয়না আছে, কতো টাকা আছে কিছুই জানে না সে। জানতে তার ইচ্ছেও নেই।'

যজ্ঞেশ্বর দু-পা এগিয়ে এলেন, রূঢ় গলায় বললেন, 'তবুও ওগুলো আপাতত আমার কাছেই রাখতে হবে তোমার।'

প্রমীলা কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে বললো, 'কেন ?'

'ও-সবের অধিকার একা তোমার নয়।'

'তবে কার ?'

'অত কথার আমার সময় নেই, শিগ্‌গির দে।'

'আমার শাশুড়ির গয়না একা আমার নয় ?'

'না।' এবার মেয়ের আঁচল থেকে চাবি ছিনিয়ে নিলেন যজ্ঞেশ্বর।

প্রমীলাও সঙ্গে-সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়লো বাপের গায়ের উপর, 'না, না, আমি দেবো না, দেবো না, দেবো না।'

এক ধাক্কায় মেয়েকে ফেলে দিয়ে চাবি নিয়ে আলমারি খুললেন যজ্ঞেশ্বর।

প্রমীলা চিৎকার করতে যাচ্ছিলো, চোখ পাকিয়ে বললেন, 'চুপ।

গলায় আওয়াজ এক ফোঁটা বার করবি তো এখুনি পুলিশে খবর দিয়ে ধরিয়ে দেবো।'

'তুমি চোর না? তোমাকে ধরিয়ে দিতে পারি না আমি?'

'চোরের আবার অত গলা!' হাতের উল্টো পিঠে ঠাস্ ক'রে একটা চড় মেরে মেয়ের মোটা ফর্সা মাংসল গাল লাল ক'রে দিলেন, 'হারামজাদী, আমার মুখের উপর এত বড়ো কথা। ভেবেছিস আমি তোর ঐ মিনমিনে কাপুরুষ অপদার্থ সোয়ামিটার মতো ভীরু, বোকা, হাঁদা, মেয়েদের গায়ে দূরে থাক, বৌ-এর গায়েও হাত তুলতে ভয় পায়, লজ্জা পায়। গায়ের ছাল ছাড়িয়ে লঙ্কা বাটা ঘ'ষে দেবো আমি তোমাকে, যদি আর-একটা কথা মুখে-মুখে বলো।'

প্রমীলা রুদ্ধরোষে দৌড়ে গিয়ে দেয়ালে ঠং-ঠং ক'রে কপাল কুটতে লাগলো কিন্তু সাহস পেলো না বাপের কার্যকলাপে বাধা দিতে। যজ্ঞেশ্বর আলমারি খুলে ঐ কোণ্ থেকে শাড়ি-ব্লাউসের সাত পরতের আড়াল থেকে বের ক'রে নিয়ে এলেন গয়নার বাক্স। দরজা ভেজিয়ে ডালা খুলে দেখে নিলেন সব ঠিক আছে কিনা, আর দেখতে গিয়েই তাজ্জব হ'য়ে গেলেন। রাখালের মা-র তেরো ভরির চিকটা চুপচাপ শুয়ে আছে ন্যাকড়া জড়িয়ে। একটা জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন কপাল-কোটা কন্যার দিকে, তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

প্রমীলা বাপের চ'লে যাওয়ার ঝরঝরে মোটরের আওয়াজ শুনতে-শুনতে মেঝেতে লুটিয়ে প'ড়ে চাপা-চাপা বুকফাটা আর্তনাদে বিদীর্ণ হ'তে লাগলো।

এদিকে নিচের ঘরে শেষ রাত্রি থেকে বেহুঁস জ্বরে মূর্ছার মতো প'ড়ে রইলেন হিরণ্ময়ী। সাত সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই সীমন্ত যে কোথায় চ'লে গেল তার কোনো ঠিকানা রইলো না। অনেক বেলায়

ঝাপসা-ঝাপসা কী চিন্তা যেন অর্ধচৈতন্ত হিরণ্ময়ীর মগজের মধ্যে স্রোতের মতো ব'য়ে-ব'য়ে যেতে লাগলো, যেন স্বপ্নের ঘোরে কাকে খুঁজলেন, কাকে হারালেন, কাকে না পেয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

ভোর হ'লো। ট্রেনের জানালা দিয়ে বারুদ-গন্ধ শীতল হাওয়া ছড়িয়ে পড়লো কামরার মধ্যে। একটুখানি শীতের কামড়। শরতের আদর। কোটটা খুলে রেখেছিলো স্থনির্মল, আবার চাপাচুপি দিয়ে বসলো। তারপর সিগারেট ধরালো একটা। যাত্রী-ঠাসা কামরায় কয়েকবার দৃষ্টি পরিভ্রমণ করালো, এখনও ঘুমের অন্ধকার কাটেনি সেখানে। চাদর মুড়ি দিয়ে এঁকে-বেঁকে বিচিত্র ভঙ্গিতে শুয়ে আছে সব।

ধীরে-ধীরে সোনালি রোদ আলো ফেললো আকাশে। মেজেণ্টা রং-এ ভ'রে গেল মাঠ ঘাট বন-বাদাড় পাহাড়ের আনাচ-কানাচ। স্থনির্মল টাইম-টেব্‌লের পাতা ওলটালো। তা হ'লে সত্যি এলাম।

বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ ক'রে উঠলো।

কাল রাত্তিরে বৃষ্টি হয়েছিলো। টেলিগ্রাফের তারে-তারে বিন্দু-বিন্দু জল ঝুলে আছে মুক্তোর মতো। দু-পাশের খানা-ডোবা টলটল করছে বাদামী জলে। দূরে পাহাড়ের উপর দিয়ে একটা কাক উড়ে গেল, একঝাঁক নাম-না-জানা পাখি উড়লো আকাশে, লাল রোদ হলদে হ'লো, কামরার আলোটা মড়ার মতো ফ্যাকাশে চোখে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দপ ক'রে নিবে গেল। গাড়ির গতি ঝিমিয়ে এলো।

পরিষ্কার ঝকঝকে ছোট্টো স্টেশন। অল্প কয়েকজন যাত্রীই নামলো এখানে। একটু গোল উঠলো, যে যার গন্তব্যে যেতে-যেতে যতটুকু জাগরণ, তারপর আবার চুপ। স্থনির্মলও নামলো, কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলো কী ভেবে। হঠাৎ যেন বুঝে উঠতে পারলো না এর পরে তাকে কী করতে হবে। নিজেকে কেমন তার অত্যন্ত অপরাধী মনে হ'লো, অত্যন্ত স্বার্থপর।

সত্যিই তো। যাকে সম্মান দিতে পারে না, মর্যাদা দিতে পারে না, ঘর-সংসার স্বামী সন্তান অধিকার কিছুই দিতে পারে না— তার কাছে আজ তবে কী সম্বল নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে সে? নিজের রিক্ততা ভ'রে নেবার কী যুক্তি আছে তার জীবনে? মিছিমিছি আরো তাকে ব্যর্থতার ভারে অবনত করা, নিজের জ্বালা জুড়োতে এসে তাকে জ্বালানো। ছি!

ছটফটিয়ে পাইচারি করতে লাগলো স্টেশনের এ-মাথা ও-মাথা। বিবেকের সঙ্গে লড়াই করলো। তারপর কখন বিশ্রামাগার লেখা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। হৃদয় কি যুক্তির বশ? বিবেকের বশ? ভেতরে গিয়ে হাত-মুখ ধুতে-ধুতে অনুভব করলো সেই কথা। আস্তে-আস্তে মন শান্ত হ'লো একটু। কেলনারে এসে চা খেয়ে আরাম পেলো শরীরে। ততক্ষণে সামান্য বেলা বেড়ে তাপ উঠলো ভোরের হাওয়ায়, শহর সচল হ'লো। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সে রওনা হ'লো শকুন্তলার বোর্ডিং-এর দিকে।

২

সারা সপ্তাহ স্কুল ঠেঙিয়ে এই তো একটা রোববার। চায়ে চুমুক দিতে-দিতে আলস্য ভাঙছিলো শকুন্তলা। শীতের শিরশিরানি নিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া পর্দার উপর ব'য়ে গেল ঢেউ হ'য়ে। বেডকভারটা টেনে গায়ে তুলে দিলো আলতো ভাবে। মনটা উদাস হ'য়ে উঠলো।

টুপটাপ শিশির ঝরছে বকুলের পাতা থেকে, একটা ঝুমকো লতা এসে নুয়ে পড়েছে জানালায়, অজস্র ফুল ধরেছে। নরম মিষ্টি গন্ধে ভ'রে গেছে হাওয়া। আশ্চর্য! এ-লতাটা কিন্তু কেউ বোনেনি, কেউ যত্ন করেনি, আপনা থেকেই জন্ম নিয়েছে কবে। নিজে-নিজেই বড়ো হ'য়ে ঢেকে ফেলেছে এই পায়ের তলার পশ্চিমের জানালা।

আরো-এক ভাদ্রের কথা মনে পড়লো তার। ঠিক এমনি এক লতা-গাছ বেড়ে উঠেছিলো জানালায়। শকুন্তলা কলেজ থেকে নিয়ে এসেছিলো চারাটি। পরে একটা ভাঙা কেরোসিন কাঠের বাক্স-ভর্তি মাটি আনিয়ে বুনে দিয়েছিলো। বৌদি চা দিতে-দিতে বললেন, 'ও সুহৃদা, যাবার আগে আমাদের বাগান দেখে যেয়ো কিন্তু।'

'বাগান!'

'হ্যাঁ, কুন্তীর জানালার তলায়, মেথর-প্যাসেজে। উটকামণ্ডের বোটানিক্যাল গার্ডেনের নাম শুনেছো তো? তার পরেই এই বাগান।'

লাফিয়ে উঠলো সুনির্মল, 'কোথায়? কোথায়? কই! কই! কী আশ্চর্য! এত বড়ো খবরটাই এতক্ষণ বলোনি?'

মুখ ভার ক'রে কুন্তী বললো, 'বেশ। অত ঠাট্টার কী? ফুল যখন ফুটবে তখন দেখবো কেউ চায় কিনা।'

সুনির্মল দৌড়ে একপাক ঘুরে এলো: 'ফুটবে কী? ফুটেছেই তো। গন্ধে ভ'রে গেছে বাড়ি। পাচ্ছো না? কাকটা মোহিত হ'য়ে ঠুকরোচ্ছে দেখলুম।'

অ্যাঁ! কাকে ঠুকরোচ্ছে? চায়ের বাটি-ফাটি ফেলে কুন্তী ছুট। গিয়ে দেখলো তার অত সাধের গাছটির আর অস্তিত্ব রাখেনি বর্বর বায়স-প্রবর। বর্ষায় গাছ মাটিতে-জলেতে দু-দিনেই দিব্যি ঝকঝকে ডাল ছেড়েছিলো, লম্বা ঠোঁটে গোড়াসুদ্ধু উপড়ে ফেলেছে তাকে। হুস্ হুস্ ক'রে কাক তাড়িয়ে মাটি থেকে আলগা এলানো লতাটি হাতে নিয়ে একেবারে কেঁদে ফেললো সে। আর তার পরের দিন বিকেলে ট্যাক্সি-ভর্তি ফুলের টব নিয়ে এসে হাজির সুনির্মল: 'নাও, কতো গাছ তোমার চাই।'

এর কিছুদিন পরেই মারা গেলেন রাজেনবাবু। দেখতে-দেখতে যা ছিলো দৈনন্দিন তা হ'য়ে উঠলো স্মৃতি। আলোতে হাসিতে আনন্দে

ঝলমলে সুরেলা দিনগুলো কোথায় মিলিয়ে গেল হাওয়া হ'য়ে। একটা ভোজবাজি হ'য়ে গেল।

মাত্র একটা মানুষ চ'লে গেলেন শুধু হাতে পায়ে, আর অমনি একেবারে উল্টে গেল বিশ্ব-সংসার? একটা মানুষ এমন দামী ছিলেন আমাদের এতগুলো জীবনের পক্ষে?

ভাবতে-ভাবতে শকুন্তলা অবাক না হ'য়ে পারলো না। আর, তারপর এই তো মরা মাটি খুঁড়ছে, সেই সুখস্মৃতির কয়েকটি মঞ্জরী নিয়ে। এই কি জীবন? আর হাজার প্রার্থনায় যা ফিরে পাবেনা তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি! মন, কেন তুমি এমন অবুঝ? এমন অবাধ্য? একটা আত্মসম্মানও তো আছে? বৌদি— যে-বৌদি তার মায়ের বেশি, এ-কথাই তো তিনি বার-বার বুঝিয়েছিলেন তাকে, বিয়ে ভেঙে দেবার বিরুদ্ধে এই তো ছিলো তাঁর একটা যুক্তি। সে মানেনি। অনুরোধ, উপরোধ, চোখ-রাঙানি, কান্নাকাটি, কী দিয়ে তিনি তাকে রুখতে পারলেন! মন ফেরাতে চেষ্টা করেছিলো শকুন্তলা, কিন্তু পারলো না, কিছুতেই তো ভুলতে পারলো না মানুষটাকে, জীবনের এতগুলো বছরের মধ্যে মাত্র ঐ কয়েকটি মাসকে। ভেতরে-ভেতরে একটা অশ্রুত অব্যক্ত কান্না গুম্‌রে-গুম্‌রে উঠলো।

আলাদা কোয়ার্টার বলতে যা বোঝায় তার বাড়িটা ঠিক তা নয়। কেবল এই একটি ঘরেরই একা মালিক সে। তবে সকলের সঙ্গে বেড়া দিয়ে অংশ ভাগ করা। হেডমিস্ট্রেসের যদ্দিন আলাদা বাড়ি না উঠেছিলো তদ্দিন এ-অংশটুকু আলাদা ক'রে নিয়ে তিনিই ছিলেন এখানে। এখন শকুন্তলা। ঘর-সংলগ্ন ছোট্টো কাপড় ছাড়বার ঘর আছে একটি, সামনের দিকে এক ফোঁটা চৌকো বারান্দা আকাশের তলায়, প্রকাণ্ড বুড়ি বকুলের ছায়ায় শীতল। খায় সকলের সঙ্গেই, কেবল দু-বেলার জলখাবারের ব্যবস্থা

তার নিজের। একটা স্টোভ আছে, আছে ছোট্টো একটা কেট্‌লি, চায়ের কাপ-ডিস, ঝুড়িতে ডিম, রুটি-মাখন। আর একটা ছোট্টো মেয়ে আছে রুক্মিণী, মালীর মেয়ে, সারাদিন সে ঘুরঘুর করছে শকুন্তলার সঙ্গে। তাকে না-ডাকতেই সে হাজির, না-বলতেই কাজের জন্য এক পায়ে খাড়া। কুন্তী তাকে খেতে দেয়, জামা সেলাই ক'রে দেয়, পড়াতে নিয়ে বসে, রবারের জুতো কিনে দিয়েছে একজোড়া, উকুন-ভরা চুলের জন্য লাল রিবনও কিনেছে দু-গজ।

চায়ে শেষ চুমুক দিতেই একটি চিরকুট নিয়ে এসে দাঁড়ালো সে।

'কী রে?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে যে।'

'আমার সঙ্গে? কে?' শকুন্তলা পা থেকে চাদরটা ঠেলে দিয়ে উঠে বসতে-বসতে ভুরু কুঁচকোলো। তার সঙ্গে কে আবার এই অসময়ে এই শহরে দেখা করতে এলো? দাদা নয়তো? চিঠি দিইনি ক'দিন, চ'লে এসেছেন নাকি উদ্বিগ্ন হ'যে? না আর কেউ? কে? কে হ'তে পারে? হাত বাড়িয়ে চিরকুটটা সে নিলো।

'কে দিলো তোকে?'

'আমি আসছিলাম, বাবু নিজেই দিলেন।'

'বাবু নিজেই দিলেন!' ততক্ষণে নামটার উপর বার-বার চোখ বুলিয়েছে শকুন্তলা, বুকের ভেতরটা পায়রার মতো কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

ভাঙা খোঁপাটা তাড়াতাড়ি হাতে জড়িয়ে নিলো। ড্রেসিং-টেব্‌লটার সামনে দাঁড়িয়ে এলোমেলো কী যে খুঁজলো আর খুঁজলো না কে জানে, আলনাটার কাছে গিয়ে প্রত্যেকটা কাপড় এলোমেলো করলো, তারপর কী ভেবে সেই অবিন্যস্ত শাড়িতেই বেরিয়ে এলো বাইরে। মাথাটা আঁচড়াতে পর্যন্ত ভুলে গেল।

৩

গেটের কাছে, ভিজিটর্স রুমের দরজার সামনে মস্ত বাদামগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলো স্থনির্মল, পায়ের শব্দে পেছন ফিরে তাকালো। তারপর চোখে চোখ রেখে সময়ের দ্রুত চাকায় পার হ'য়ে যেতে দিলো অনেকগুলো দণ্ড পল মুহূর্ত। বর্ষার সজল আভা ছায়া ফেললো দুই জোড়া মিলিত চোখের কালো মণিতে। দৃষ্টি নমিত হ'লো। একটু কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে স্থনির্মল বললো, 'ভালো আছো?'

'আপনি হঠাৎ?'

'এলাম।'

'কে জানতো, ঘুম ভেঙে উঠেই আমার জন্য আজ এই ভাগ্য অপেক্ষা ক'রে আছে!'

'ভাগ্য।' শূন্যে ধোঁয়ার রিং তুললো স্থনির্মল, 'ভাগ্যের কাছে হাত পাততে আমিই তো এসেছি আজ।'

শকুন্তলা নতমুখে পা দিয়ে শিশির-ভেজা নরম মাটি খুঁড়তে লাগলো। রঙিন ফড়িং উড়লো একটি মাঝখান দিয়ে, দারোয়ান এসে ক্যাঁচ ক'রে বন্ধ ক'রে দিলো ফটক।

'আমার চিঠি পেয়েছিলেন?' একটু পরে সংকোচ কাটিয়ে জিগ্যেস না ক'রে পারলো না কুন্তী।

'পেয়েছিলাম।'

'ও।'

'জবাব না পেয়ে কি রাগ করেছিলে?'

'রাগ? না, রাগ কেন।'

'যা আমার বলবার কথা তা আমি কেমন ক'রে ঐ একটা ছোট্টো খামে পুরে পাঠাই বলো তো? লক্ষ কথাতেও কি চোখের তৃষ্ণা মিটতো?'

কুন্তী চোখ তুলে তাকালো, আকুল হ'য়ে উঠলো সুনির্মলের গলা, 'পারলাম না কুন্তী, পারলাম না। কিছুতেই পারলাম না। একবার তোমাকে দেখে যাবার লোভ কিছুতেই সংযত করতে পারলাম না আমি। আমাকে ক্ষমা করো, দয়া করো, প্রত্যেক মুহূর্তের মৃত্যু থেকে এক ফোঁটা শান্তি আমাকে নিয়ে যেতে দাও তোমার সান্নিধ্যের উত্তাপ থেকে।' উত্তেজনায় সিগারেটটা ধরিয়েই টোকা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো দূরে। ধোঁয়া উঠতে লাগলো ভেজা ঘাসের বুক বেয়ে-বেয়ে। সেই দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে কুন্তীর বুকেও সমুদ্রের আলোড়ন উঠলো, ঝাপসা গলায় বললো, 'চলুন, ঘরে গিয়ে বসবেন।'

সকালবেলার ঘুমভাঙা ঘর। ঈশ্! কী এলোমেলো। এই ঘর কুন্তী কতো সুন্দর ক'রে গুছিয়ে রাখে রোজ। আর আজ কিনা এই। বিছানা তেমনি প'ড়ে আছে আঢাকা, কাল রাত্তিরের অগোছালো টেবিল, একটু আগে নিজের হাতে তচনচ করা আলনা। ব্লাউসটা ঝুলে আছে চেয়ারের হাতলে, পেয়ালার চার পাশে পিঁপড়ে। দরজাটা ভেজিয়ে রেখে গিয়েছিলো, ঘর থেকে যেন রাত্তিরের গন্ধটাই কাটেনি।

আহা! কুন্তী কি জানতো আজ এমন মানুষ পা রাখবে তার ঘরে? তা হ'লে চুল দিয়ে মুছে রাখতো ঘরের সব ধুলো। ফুল দিয়ে ভ'রে রাখতো সব। মনটাই খারাপ হ'য়ে গেল।

এদিকে অভ্যর্থনা না করতেই কুঁচকোনো আধময়লা শাদা চাদর পাতা বিছানাটার উপর পরম পরিতোষ সহকারে ব'সে পড়লো সুনির্মল, কুন্তীর মাথা-ডোবানো এলোমেলো বালিশ দুটো টেনে নিলো বুকের কাছে, ক্লান্ত শরীর খাটের বাজুতে এলিয়ে দিয়ে বললো, 'আঃ! বাঁচলাম।'

কুণ্ঠিত হ'য়ে কুন্তী তাড়াতাড়ি বেডকভারটা নিয়ে এলো, 'ছি, ছি,

কী নোংরা ঘরের মধ্যে নিয়ে এলাম আপনাকে, একটু উঠুন, বিছানাটা অন্ততঃ ঢেকে দিই।'

'এই তো বেশ।'

'বেশ না হাতি। তার চেয়ে চলুন বারান্দায় বসবেন একটু, আমি ততক্ষণে—'

'সুন্দর ঘর তোমার।' সমস্ত ঘরটার যেন একটা নিশ্বাস নিলো সুনির্মল। 'ঠিক তুমিতে ভরা।' জুতোটা খুলে ফেলে পা দুটি তুলে নিলো খাটের উপর। হতাশ হ'য়ে হাতের বেডকভারটা চেয়ারের উপর রেখে টুকটাক অন্য কাজে মন দিলো কুন্তী। এক ফাঁকে স্টোভ জেলে চড়িয়ে দিয়ে এলো চায়ের জল। ঘর ঝাড়ালো রুক্মিণীকে ডেকে। টেবিলটা গুছিয়ে, আলনা সাজিয়ে, ফুলদানিতে নতুন ফুল দিয়ে মুহূর্তে সব ঝকঝকে ক'রে তুললো। জানালা দরজা খুলে দিয়ে সারা আকাশ নিয়ে এলো ঘরের মধ্যে। হালকা কচুরি ফুল রং-এর পাতলা পর্দা পালের মতো ফুলে উঠলো বাতাসে। তাকিয়ে দেখতে-দেখতে সহসা নিবিড় শান্তিতে ভ'রে উঠলো সুনির্মলের মন।

৪

তারপর চা। এর মধ্যে কতো করেছে কুন্তী। এত ও শিখলো কোথায়? ডিম ভাজা, টোস্ট রুটি, কুচো নিমকি, মাখন, জ্যাম, কলা— রীতিমতো ভোজ। ফাঁকে-ফাঁকে অল্প একটু গল্প, এক ফোঁটা হাসি, কুন্তীর স্বভাবোচিত কিছু-কিছু দুষ্টুমি— দু-জনের মনের আকাশে কখন জানি মেঘ ছিঁড়ে আলো ঝিলিক দিয়ে উঠেছে, ধোঁয়া-ওঠা খয় রং চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে কখন আর-সব ভুলে গিয়ে শুধু এই মধুর সকালটুকুই তার সব লাবণ্য নিয়ে জেগে আছে মনের মধ্যে।

যদি উপায় থাকতো সময়ের গতিতে আজ গণ্ডী এঁকে দিতো ওরা, পায়ে শেকল পরিয়ে দিতো। সব দিন একদিন হ'য়ে সব ঋতু এক ঋতু হ'য়ে আজকের এই দিনটিকে, এই ক্ষণটিকে চিরন্তন ক'রে রাখতো।

কিন্তু কতোক্ষণ এই খেলা? একটাই তো বেলা। দেখতে-দেখতে কখন যে ঝাপসা হ'য়ে বিকেল নেমে এলো। বকুলের ছায়া গাঢ় হ'য়ে বিস্তীর্ণ হ'লো মাঠে, স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গেল দিনটি। কুন্তী স্টেশনে তুলে দিতে এসে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, 'এর চেয়ে না-আসাই ভালো ছিলো।'

'ভালো ছিলো? তা হ'লে আমি বাঁচতাম কেমন ক'রে?'

'এটুকুই কি বেঁচে থাকার সব?'

'না।'

'তবে?'

'তবুও কুন্তী, তবুও, যতটুকু পাই।'

'এ-রকম কুড়িয়ে-কাচিয়ে, লুকিয়ে, কলঙ্কিত হ'য়ে? এই উদ্বৃত্তটুকু নিয়ে?'

'উদ্বৃত্ত?'

'না! কতোটুকু আমি পেলাম? মনের কতোটুকু ভরলো, তার চেয়ে শূন্য হ'লাম বেশি।'

'না, কুন্তী, না। ও-রকম ক'রে বোলো না তুমি। আমি সইতে পারিনে। আমার জন্য প্রার্থনা করো, যেন একদিন সম্পূর্ণ হ'য়ে তোমার কাছে আসতে পারি, যেন এই লোহার গারদ থেকে আমি মুক্তি পাই।'

'হায় রে। একজন মানুষ তার জীবন কেমন ক'রে যাপন করবে সে কী তারই রচনা নয়? সেখানে ঈশ্বর কোথায়? সেই গারদে বাস করা না-করা তো তারই ইচ্ছে।'

'জানি, আমার কথা তুমি বুঝবে না। কেউ বুঝবে না।' অন্ধকারে তারা-ভরা আকাশের দিকে মুখ তুললো স্থনির্মল।

চুপ ক'রে রইলো কুন্তী। না, সে বোঝে না। কিছুতেই বোঝে না। কেউ যদি না চায় তবে কেমন ক'রে আর-একজন মানুষ তার জীবনে তার সংসারে এমন একাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে— এ-কথা ভেবে-ভেবে কতো দিন কতো রাত তার চোখের জলে ভেসে গেছে; তবু সে এর পক্ষে কোনো যুক্তি খুঁজে পায়নি মনের মধ্যে। যত সহজে কুন্তীকে সে একদিন বিদায় দিতে পেরেছিলো তেমনি সহজে তো আরো-একজন মানুষকেও স্থনির্মল বর্জন করতে পারতো সেদিন জীবন থেকে। ইচ্ছে থাকলে আজও কি তা পারে না? দুটো মন্ত্রের জোর কি এতই বড়ো? হৃদয়ের বন্ধন কি কিছুই নয় তার কাছে? সহসা অভিমানে ভারি হ'য়ে উঠলো বুক।

একটু পরেই গুমগুম ক'রে দৈত্যের মতো লালচোখ ট্রেন এসে জানোয়ারের মতো হাঁপাতে লাগলো পায়ের কাছে।

'এলো? এসে গেলো?' কুন্তী যেন অস্থির হ'য়ে কাছে স'রে এলো: 'এর মধ্যেই সময় হ'য়ে গেল যাবার? তবে আবার, আবার কবে দেখা হবে?'

'আবার আসবো?'

'আসবে না?'

'এ-রকম চোরের মতো লুকিয়ে, তোমাকে দুঃখ দিতে—'

'তুমি তাই এসো, তাই এসো।' কান্নায় ভেঙে পড়লো সে, 'আমি তাই মেনে নেবো।'

স্থনির্মল গাড়ির জানালা দিয়ে কাঙালের মতো হাত বাড়িয়ে দিলো তার দিকে।

সুনির্মল যখন কলকাতা এসে পৌঁছুলো, রাস্তায় জল দেওয়া সুরু হয়েছে। তারই মধ্যে বেরিয়ে পড়েছে ঠেলাগাড়ির রুটি, কেভেন্টারের দুধ, ঝপাঝপ দুই ঝাঁটা দিয়ে ফুটপাত পরিষ্কার করতে লেগেছে ঝাড়ুদারেরা। ভিখিরিরা উঠে বসেছে আড়মোড়া ভেঙে।

আবার বাড়ি। আবার প্রমীলা। আবার আপিস। হতাশায় ক্লান্তিতে পা ভেঙে এলো সুনির্মলের। এই দায়িত্ব আর কতোকাল! কতোকাল আর! ফিরতেই হবে কোনো-না-কোনো সময়ে ঐ চার দেয়ালের ফোকরে। হা ভগবান! ট্যাক্সির গহ্বরে নিজেকে নিক্ষেপ ক'রে যেন ম'রে গেল মানুষটা।

বসবার ঘরের দরজাটা খোলাই ছিলো, শিথিল গতিতে ভেতরে ঢুকতেই নিবারণের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। শুকনো মুখে ব্যস্ত হ'য়ে ঐ ভোরেই কোথায় যাচ্ছিলো সে, তাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো: 'আপনি কোথায় ছিলেন দু-দিন? মা-র যে বড্ডো অসুখ।'

'মা-র! কী অসুখ?'

'খুব জ্বর। ডাকলে সাড়া নেই, শব্দ নেই। ওদিকে ছোটো দাদাবাবু রাগ ক'রে যে তার বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আছেন—'

'তাই নাকি!'

ব্যাকুল পায়ে মা-র ঘরে ছুটে এলো সুনির্মল। মেঝের উপর চোখ বুজে প'ড়ে আছেন হিরণ্ময়ী, বড়ো-বড়ো কালো চুল চোখে-মুখে মাখামাখি, থান কাপড়ের আঁচল বিশৃঙ্খল হ'য়ে ছড়িয়ে জড়িয়ে একাকার। দৃশ্যটা মর্মান্তিক। রিক্ত নিরাভরণ হাত দুটো অবলম্বনহীন হ'য়ে প'ড়ে আছে এলিয়ে। নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল সুনির্মল। এই সেই হিরণ্ময়ী?

তার মা। রাজেনবাবুর স্ত্রী। এই! এই তাঁর দশা! কেবলমাত্র রাজেনবাবু নেই, তাতেই তাঁকে এইখানে আসতে হয়েছে? সহসা অদ্ভুত একটা কষ্টের অনুভূতিতে ছেয়ে গেল বুকের ভেতরটা, যেন ঠিক কষ্টেরও না, সে যে কী-রকম বুঝে উঠতে পারলো না সে। কাছে স'রে এসে কপালে হাত রাখলো নিচু হ'য়ে, হিরণ্ময়ী বড়ো-বড়ো লাল চোখ মেলে তাকালেন একবার। সুনির্মল খাটের এলোমেলো বিছানাটা সমান ক'রে নিয়ে পাঁজা কোলে ক'রে তুলে দিলো তাঁকে। তারপর যথাযোগ্য ব্যবস্থা ক'রে উপরে উঠে এলো। সিঁড়ির মুখে ডাইনে প্রমীলার ঘর, দরজা খোলা, পর্দাটা নড়ছে বাতাসে, সুনির্মল বাঁ-এর বারান্দা বেয়ে নিজের ঘরে এলো, আর এসেই স্তম্ভিত।

ঘরটার মধ্যে যেন ঝড় ব'য়ে গেছে একটা। হিরণ্ময়ীর হাতের সাজানো ঘর, চিরদিনের বেডকভার-ঢাকা নিচু-নিচু পাশাপাশি দু-ভাইয়ের দুই খাট, বেডসাইড টেবিল, ওয়াড্রোব, তার উপরকার কাচের ফুলদানি, জামা জুতো হ্যাঙার, ট্রাঙ্ক বাক্স— সব ভেঙেচুরে ওলট-পালট, একেবারে তচনচ। ধুলোয় এক-হাঁটু, ঘরময় কাগজের কুচি— এক পলক তাকিয়েই ব্যাপারটা যেন হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো। তার পরেই ছুটে এ-ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো।

'আমার ঘর ও-রকম করেছে কে?'

প্রমীলার ঘুমের জড়িমা তখনো কাটেনি শরীর থেকে। চমকে মুখ ফেরালো, তারপর সুনির্মলকে দেখে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল তার চোখে-মুখে, সোজা তাকিয়ে রইলো স্থির দৃষ্টিতে, জবাব দিলো না।

'কে, কে করেছে ও-রকম? আমি জানতে চাই কে করেছে?'

'আমি।' —পরিষ্কার গলা প্রমীলার।

'কেন?'

'ইচ্ছে।'

'তোমার ইচ্ছে মতোই সব হবে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'না।'

'আমার যা ইচ্ছে তাই করবো।'

'না্না, না্না।'

'নিশ্চয়ই। তোমার যা ইচ্ছে তুমি তাই করো না।'

'মনে রেখো এটা আমার বাড়ি।'

'তুমিও মনে রেখো এটা আমার বাড়ি।'

'তোমার বাড়ি! তুমি এ-বাড়ির কে? কেউ নয়। ঘাড়ে ধ'রে এই মুহূর্তে আমি তোমাকে বার ক'রে দিতে পারি বাড়ি থেকে।'

'দাও না।'

'বেরোও, এই মুহূর্তে বেরোও তুমি এখান থেকে।' সুনির্মলের বিকৃত গলার আওয়াজে ভয় পেয়ে ছাতের আলিসা থেকে একটা কাক উড়ে পালালো। উল্টোদিকের বাড়ির ঝি-টা বাসন মাজতে-মাজতে উঠে এসে উঁকি দিয়ে দৌড়ে গেল, বোধ হয় আর-সকলকে এই মজার দৃশ্যটা দেখাবার জন্য। প্রমীলা একটা শিকারী টিকটিকির মতো গুটিগুটি এবার এগিয়ে এলো কাছাকাছি। দাঁত ঘষতে-ঘষতে, নাক ফুলোতে-ফুলোতে, হাতে মুঠো পাকিয়ে।

সুনির্মলের গা শিরশির ক'রে উঠলো তার দিকে তাকিয়ে। একটা ভয়, একটা অস্বস্তির শিরশিরানি— দু-পা পিছিয়ে গেল সে আর প্রমীলা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার গায়ের উপর, দু-হাতে টেনে ছিঁড়ে দিলো তার আধ-পুরোনো শার্ট, টানের চোটে টাইটা ফাঁসির মতো আটকে গেল গলায়। প্রায় জিব বেরিয়ে এলো।

'বলি ঐ তাড়কারাক্ষসীটা তোমাকে চিঠি লেখে কেন, শুনি? শুনি সে-কথা? দু-দিন দু-রাত হৃৎপিণ্ডেশ্বরীর সঙ্গে কোথায় গলা-ধরাধরি ক'রে শুয়ে এলে? কই? কোথায় সেই প্রেয়সী, ডাকো না, ডাকো না, তোমাকে রক্ষা করুক-না এসে এবার।' হাতের নখ বসিয়ে দিলো গলার কাছের উন্মুক্ত অংশে। দুই চোখ ধ্বক্‌ধ্বক্ করতে লাগলো হিংসার আগুনে। সুনির্মল এক-মুহূর্তের জন্য দিশাহারা হ'য়ে থমকালো একটু, তারপরই আচমকা একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় তাকে ফেলে দিলো মাটিতে। প্রমীলা দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে খাটের বাজুতে সিমেণ্টের শক্ত মেঝেতে প'ড়ে গেল লম্বা হ'য়ে, কপালের কাছে ফেটে গিয়ে রক্তের ফিন্‌কি ছুটলো। সুনির্মল দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিচে নেমে এসে হাত ধুলো।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ীকে নিয়ে কয়েক দিন খুবই টানা-পোড়েন গেল, তারপর ভালো হ'য়ে উঠলেন আস্তে-আস্তে। এই এক মাসের মধ্যে হাজার চেষ্টা ক'রেও মাকে এই অবস্থায় ফেলে আর সুনির্মল কিছুতেই পাটনা গিয়ে উঠতে পারলো না। কিন্তু চিঠি লিখলো ঘন-ঘন। আর সেই চিঠিতে ধীরে-ধীরে, আস্তে-আস্তে মনটাকে সে মেলে দিতে পারলো শকুন্তলার কাছে। দেখতে-দেখতে যেটুকু আড়াল ছিলো মাঝখানে কখন সেটুকু স'রে গিয়ে দু-জনই দু-জনের কাছে নিবিড়তর হ'য়ে উঠলো এই পত্রালাপের সেতু বেয়ে-বেয়ে। চিঠির গতি আরো দ্রুত হ'লো, ঘন-ঘন থেকে একদিন অন্তর, একদিন অন্তর থেকে রোজ, রোজ থেকে শেষে এ-বেলা ও-বেলা।

শুক্লপক্ষের চাঁদের মতো একটু-একটু ক'রে পূর্ণ হ'য়ে উঠলো দিনগুলো, বিবর্ণ ব্যথিত জীবনে ঝিরিঝিরি ফাল্গুনের হাওয়া বইলো, সমস্ত প্রতিকূলতাকে যেন হার মানিয়ে জিতে গেল তারা। একটি সূক্ষ্ম শীতল সুধাস্রোত ব'য়ে যেতে লাগলো রুক্ষ কঠিন ধূলি-ধূসরিত জীবনের উপর দিয়ে। যে-গাছ একফোঁটা জলের তৃষ্ণায় শুকিয়ে মরছিলো, এই সিঞ্চনে বেঁচে উঠলো প্রাণ পেয়ে। মরা ডালে আবার নরম সবুজ কুঁড়ি ধরলো।

এর পর আবার যখন দেখা হ'লো—

সুনির্মল বললো, 'এবার তুমি কলকাতা চ'লে এসো। আর পারিনে।'

শকুন্তলা বললো, 'পাগল!'

'কেন, আপত্তি কী?'

'ওখানে আমাকে কে চাকরি দেবে?'

'চাকরি কি একটা করতেই হবে তোমাকে?'

'আর আমার করবার কী আছে?'

'পড়ো-না!'

'পড়বো।'

'তবে আর কী!' খুশিতে ঝকঝক ক'রে উঠলো স্থনির্মল, 'তা হ'লে বিহু স্থনন্দও খুশী হবে। আমি ঠিক জানি তোমার এই চাকরি নিয়ে এখানে আসায় নিশ্চয় ওরা রাগ করেছে। বলো ঠিক কিনা।'

শকুন্তলা হাসলো— 'তাই ব'লে কি তুমি ভাবছো আমি কলকাতা যাবো?'

'নিশ্চয়ই।'

'এখানে থেকে বুঝি আর পড়া যায় না?'

'এখানে কী পড়বে?'

'বি. টি. পড়বো। তুমি বলবার আগেই ভেবেছি সে-কথা। মাস্টারির লাইনে ওটা ছাড়া ভালো গতি হয় না।'

'বেশ তো। তার জন্যেও তো তোমাকে কলকাতাই যেতে হবে।'

'তা কেন? প্রাইভেট পড়তে বাধা কী?'

'ও।' মুখ ভার করলো স্থনির্মল। একটু পরে বললো, 'আমি আসছে শনিবার আসবো না।'

'কেন?'

'আমার শরীর খারাপ হয়েছে।'

'কই দেখি।'

হাতের পাতায় হাত রাখলো শকুন্তলা, তারপর একটু হাসলো, 'মিছিমিছিই তুমি রাগ করছো, আমার পক্ষে চাকরি ছাড়া এখন অসম্ভব।'

'কিছু অসম্ভব না।'

'খুব অসম্ভব। যাদের কথা আমি মান্য করতে পারি না, তাদের টাকাও

আমি গ্রহণ করতে পারি না। এটুকু আত্মসম্মান আমাকে তুমি রক্ষা করতে দাও।'

'তা হ'লে কি তুমি বলতে চাও, তোমার পড়ার খরচ দিতে ওরা অনিচ্ছুক, যদি তুমি তাদের হুকুম মাফিক না চলো ?'

'ছি।'

'তবে ?'

'সে-সব তুমি বুঝবে না। ও-কথা থাক। ভেবে নিতে পারো না কেন চাকরি নিয়ে যখন এসেছি ওঁদের ছেড়ে তখন মনস্থির ক'রেই এসেছি।'

'তা হ'লে আমি খরচ দেবো।'

'কী !'

'কী আবার ? আমার আর তোমার টাকা কি আলাদা ?'

দূরে সিগন্যাল ডাউন হ'লো, তার দিকে তাকিয়ে আবছা হাসলো শকুন্তলা। আকাশের আলোয় তার চোখ চকচক ক'রে উঠলো।

তবু, তবুও এই বিচ্ছেদে মিলনেই, এই দূরত্বের ব্যবধানেই, মাঝে-মাঝে পাটনা আসতে পারার ভাগ্যটুকুতেই সুনির্মল ভেতরে-ভেতরে অদ্ভুত একটা মধুর বিধুর অনুভূতিতে থরোথরো হ'লো। তার মনটা যেন আশ্রয় পেলো, নির্ভর পেলো। ডুবে যেতে-যেতে যেন হঠাৎ মাটি পেয়ে বর্তে গেল পায়ের তলায়। মনে-মনে বললো, আছে, আছে, আমার জন্যেও কিছু আছে এই সংসারে। ঈশ্বর কৃপণ নন, অবুঝ নন, সবটাতেই তাঁর পরিমিতি আছে। এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারপুঞ্জের মধ্যেও এই তো কেমন লুকিয়ে রেখেছেন বিদ্যুৎ। বেঁচে থাকার এমন একটা পরিপূর্ণ অবলম্বন।

রাজেনবাবুর মৃত্যুর পরে এই যেন প্রথম সে হাওয়া নিলো বুক ভ'রে।

স্তব্ধ ফুসফুসে প্রাণ-সঞ্চয় হ'লো। রাত্তিরে অন্ধকার ঘরে একা বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ ডুবিয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করলো : তুমি আছো, আছো। আমি বাঁচলাম, বাঁচলাম। না-হয় না-ই পেলাম ধুলোতে মাটিতে, পার্থিব সুখের শারীরিক জগতে, তবু তো পেলাম! সারা হৃদয় ভ'রে পেলাম, সমস্ত মন ভ'রে পেলাম। যা পেলাম তার তুলনা পেলাম না। জানলাম তুমি আমার, শুধু আমারই। আমার জন্যই তুমি আছো। তুমি যখন অন্যমনে তাকিয়ে থাকো আকাশে, আমি জানি তুমি আমাকেই ভাবছো; সকালে যখন তোমার জানালা দিয়ে ঝরা-বকুলের গন্ধ ভেসে আসে, আমি জানি সেই গন্ধে আমাকেই তোমার মনে পড়ে। আর আমি ঘড়ির কাঁটার মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে সপ্তাহ কাটাই, আর-কিছু না থাক শনিবার তো একটা আছে সব-কিছুর শেষে? তারপর? তারপর তুমি। তুমি! সমস্ত রবিবার ভ'রে শুধু তুমি আর আমি।

সুনির্মল নতুন চোখে তাকালো পৃথিবীর দিকে। জীবনটাকে যত অসহ্য মনে হয়েছিলো তত অসহ্য আর লাগলো না।

২

আরও একটা অপ্রত্যাশিত শান্তি এলো তার জীবনে। সেটা প্রমীলার নিঃশব্দতা। হঠাৎ কেমন ক'রে কেন যে সে এমন চুপচাপ হ'য়ে গেল ভেবেই পেলো না সুনির্মল। মনে হ'লো হিরণ্ময়ীর অসুখের পর থেকেই যেন তার এই শান্তভাব। ঘর থেকেই বেরোয় না, এক মাসের মধ্যেও তার সঙ্গে একবার চোখোচোখি হয়েছে এমন কথা মনে পড়লো না তার। একদিন এসে মাসের প্রথমে খরচ চাইতে দাঁড়িয়েছিলো দরজায়, সুনির্মল সুতোয় গাঁথা মাইনের টাকা ছুঁড়ে দিয়েছিলো তার দিকে। যেমন ক'রে লোভী কুকুরকে মানুষ তার খাবার ছুঁড়ে দেয়। তারপর চুপ।

এতদিন পর তার জন্যেও মনের কোথায় একটু করুণা বোধ করলো সে। বোকা, লোভী, স্বার্থপর, হিংসুক, যাই হোক, আহা তবু তো মানুষ? আছে তো এখানে? ঈশ্বর তাকে এই বানিয়েই ধরাধামে পাঠিয়েছেন, তার বাপ তাকে এই শিক্ষা দিয়েই বড়ো করেছে। তবে ওর আর দোষ কী? ও যেমন কাউকে ভালোবাসতে শেখেনি, তেমনি ওকেও তো কেউ ভালোবাসে না। জীবনের প্রথম দিন থেকে সুনির্মলই বা কী দিয়েছে ওকে? কর্তব্য। কর্তব্যই কি সব? হয়তো এমনও হ'তে পারতো কোনো সহৃদয় মানুষের উত্তাপ পেলে ওর ঠাণ্ডা হৃদয়ের পাষাণ গ'লে পড়তো, ও মানুষ হ'তো, ও বাঁচতো।

কী ভেবে বাইরে বেরিয়ে যেতে-যেতে ও ফিরে এসে প্রমীলার ঘরে ঢুকলো। মরার মতো শাদা হ'য়ে প্রায় বিছানায় লেগে শুয়েছিলো প্রমীলা— স্বামীকে দেখে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলো। সুনির্মল বললো, 'কী হয়েছে? শুয়ে আছো কেন?'

'আমার অসুখ করেছে।'

'কী অসুখ?'

'জেনে তোমার লাভ কি?'

'অসুখ করলে তার প্রতিবিধান আছে।'

'মা-র জন্য করো গিয়ে, আমি কে?'

ভুরু কুঁচকে চুপ কবলো সুনির্মল।

প্রমীলা মুখ ঘোরালো সম্পূর্ণভাবে, 'তুমি আমার একটা উপকার করবে?'

'কী?'

'বলো আগে করবে? আগে কথা দাও।'

'না-শুনে কথা দেবো কেমন ক'রে।'

'আমার বাবার নামে একটা উকিলের চিঠি দেবে ?'

সুনির্মল আকাশ থেকে পড়লো— 'কার নামে ?'

'আমার জোচ্চোর বাবাটার নামে।'

প্রমীলার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? সভয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো সুনির্মল। প্রমীলা বেগে উঠে বসলো : 'ওকে আমি ফাটকে দেবো, ফাটকে দেবো, ফাটকে দেবো।'

'কী করেছে সে ?'

'কী করেনি ? আমার সর্বস্ব নিয়েছে, আমার সব হাতড়িয়েছে, আমাকে একেবারে সর্বস্বান্ত ক'রে পথে বসিয়ে ছেড়েছে গো—' বলতে-বলতে প্রায় ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো, 'আর এখন আমাকে দেখলেই পালিয়ে থাকে, আসতে বললে আসে না, যেতে চাইলে নেয় না। তুমি আমার স্বামী, আমার ইহকালের পরকালের দেবতা। তুমি এর একটা বিহিত ক'রে দাও।'

সুনির্মল পাথরের মতো স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তাকিয়ে রইলো ফ্যালফ্যাল ক'রে।

প্রমীলা আবার কাঁদলো : 'আমি তোমার হাতে ধরছি, পায়ে ধরছি, বলো, তার নামে তুমি মামলা আনবে, চুলের মুঠি ধ'রে পুলিশে তাকে টেনে নিয়ে যাবে জেলে, রুলের গুঁতোয় ভেঙে দেবে সব চালাকি।'

সুনির্মল চুপ।

'ওগো চুপ ক'রে রইলে কেন ? বলো, বলো, কথা দাও তুমি করবেই।'

'কী নিয়ে মামলা করবো ?'

'কী না ! ওগো তুমি আমি যে অভিন্নহৃদয় ! তোমার জিনিস আমার জিনিস যে এক—'

স্থনির্মল ভাষা শুনে শিহরিত।

'বাবা আমার তিনশো ভরি সোনার ইঁট চুরি করেছে।' হেঁচকি তুলে, 'একশো টাকার নোটে দশখানা ক'রে বাইশটা বাণ্ডিল—'

'অ্যা।'

'হায়! হায়! আমি কোথায় যাবো গো, আমার লক্ষ ট্যাকার গয়না, বাইশ হাজার টাকা—' শোকের অধীরতায় কথা ফাঁস হ'য়ে গেল।

প্রমীলার এমন নিঃশব্দ হ'য়ে যাওয়ার কারণটা এতক্ষণে বোঝা গেল। বোকার মতো তাকিয়ে থেকে হঠাৎ যেন স্থনির্মল ঘুম ভেঙে কথা ব'লে উঠলো, 'লক্ষ টাকার গয়না! বাইশ হাজার টাকা!'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমি তবে বলছি কি তোমাকে? তুমি সব উদ্ধার ক'রে দাও— আমি তোমার কেনা দাসী হ'য়ে থাকবো।'

'এত তুমি পেলে কোথায়?'

জবাব দিতে দেরি ক'রে প্রমীলা উপুড় হ'য়ে স্থনির্মলের পা জড়িয়ে ধরলো, 'সব আমি জমিয়েছিলাম। সব আমার! সব আমার! ভগবান সাক্ষী, দুই চোখের দিব্যি, সব আমার। যদি আমার না হ'য়ে বাবার হয় তবে যেন এই দু-চোখ আমার খ'সে পড়ে, আমার যেন কুষ্ঠকুষ্ঠ হয়!' একটা বুকফাটা হাহাকারে ডুকরে উঠলো সে।

৩

দেয়ালে হেলান দিয়ে গায়ে কাপড় জড়িয়ে ছবির মতো বসেছিলেন হিরণ্ময়ী, ছেলেকে দেখে ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলেন। ভালো হ'য়ে যাবার পর থেকে আবার ছেলের সঙ্গে দেখাশুনো তাঁর বিরল হ'য়ে উঠেছে। আজ এই অসময়ে তাকে দেখে একটু অবাক হ'লেন।

'এখনো বেরুসনি।'

'না।'

'আপিস নেই ?'

'আছে।'

'তবে ?'

'মা!'

'কেন ?'

'তুমি কি জানতে সব গয়না মিলিয়ে তোমার কতো ভরি সোনা ছিলো ?'

'কী ক'রে জানবো বাবা, মাপিনি তো।'

'বাণ্ডিল-করা টাকা ছিলো, কিন্তু ক'বাণ্ডিল তা কি জানতে ?'

'মনে নেই। সারা জীবনেব সঞ্চয়, কতো ছিলো দেখিনি, দেখলেও ভুলে গেছি।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, 'তোদের লুকিয়ে তোদেরই ভালো করতে চেয়েছিলাম, সবই হ'লো।'

'আমি জানি।'

'কী জানিস ?'

'কতো টাকা আর কতো সোনা ছিলো। পুলিশের কাছে কিছুই বলতে পারোনি, না টাকার অঙ্ক, না সোনার পরিমাণ।'

হিরণ্ময়ী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আমি আবার মামলা করবো।'

'আবার মামলা করবি ?'

'হ্যাঁ আবার। আবার।'

'তারপর ?'

'তারপর তোমার সুখ হবে, শান্তি হবে, লক্ষ টাকার গয়না আর বাইশ হাজার টাকার মালিক হবে তুমি।'

'লক্ষ টাকার গয়না, বাইশ হাজার টাকা? আবার সুখ, আবার শান্তি?' বলতে-বলতে ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়লেন, 'এত খবর কোথায় পেলি?'

'যে চুরি করেছে তার কাছ থেকেই। চোরের উপর বাটপাড়ি হয়েছে। বাপ-মেয়েতে পরামর্শ ক'রে করেছিলো কাজটা, এখন যজ্ঞেশ্বর কনট্রাকটর মেয়েকে ঠকিয়ে একাই সব গ্রাস ক'রে বসেছে।'

হিরণ্ময়ী এবার হাসলেন, 'আর তার গ্রাস থেকে তুই উদ্ধার ক'রে আমাকে এনে দিবি?'

'হ্যাঁ।'

'এ তো অনেক দিনের ঘটনা সুমু, এখন আবার নতুন ক'রে তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন বল্ তো?'

'এ কি ফেলে দেবার? চুপ ক'রে থাকবার?'

'ফেলেই তো দিয়েছিলি, চুপও তো করেছিলি, আজ কি তোর টাকার অঙ্কটা শুনেই লোভ হ'লো?'

'লোভ!' দপ্ ক'রে যেন বারুদ জ্ব'লে উঠলো: 'আমার লোভ!'

'তা ছাড়া আর কী। জানতিস অনেক গয়না, অনেক টাকা, কিন্তু তার পরিমাণ যে এত শুধু সেটুকুই তো জানতিস না। মন খুঁজে ছাখ্ তো, সেই পরিমাণটাই আজ তোকে বিচলিত করেছে কিনা।' হিরণ্ময়ী হাঁপালেন, 'না সুমু, না, ঐ ময়লা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি না। ঐ পাকের মধ্যে আর জড়াসনে। আজ শোকের আবেগে প্রমীলা তোকে যে-কথা ব'লে ফেলেছে, যে নির্ভর করেছে, যে আশ্বাস দিয়েছে, কাল তার চতুর বাপ এসে এক ফুঁয়ে ঠাণ্ডা ক'রে দেবে সব। ওদের কবল থেকে একটি আধা পয়সাও তুই বা'র করতে পারবিনে। ওরে বোকা ছেলে, এতদিনেও বুঝলিনে যে আর আমাদের সুখ নেই, শান্তি নেই, কিছুতেই আর-কিছু

হবার নয় আর? টাকা দিয়ে তুই সুখ কিনতে চাস? শান্তি কিনতে চাস?'

'মা!'

'না বাবা, না, ও-সব নোংরা ঘেঁটে আর আমাকে কষ্ট দিস্‌নে, কষ্ট দিস্‌নে।' ছেলের হাত দুটো ধ'রে বুকের কাছে টেনে নিলেন, 'আমার জন্যেই সব এমন ওলট-পালট হ'য়ে গেল। আমার জন্যেই এই দুঃখের সাগরে ডুবলি তুই, কিন্তু আর না—' গাল বেয়ে তাঁর অজস্র ধারায় জল গড়িয়ে পড়লো।

সুনির্মল তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলো তার দুঃখ-ক্লান্ত ছোট্টো হ'য়ে যাওয়া মাকে, যাঁর কপালে, দুই ভুরুর মাঝখানে এখনো চাঁদের মতো গৌর গোল ফোঁটাটি শাদা হ'য়ে সাক্ষী দিচ্ছে তাঁর অতীত সুখের কাহিনী।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

এই কলঙ্কিত দিন-রাত্রির দাগ লেগে-লেগেই সময়ের চাকা ঘুরতে লাগলো আপন বেগে। অভ্যর্থনাহীন, নিরুৎসুক, নিরানন্দ কতগুলো ক্লান্তি-কাতর দিনের সমষ্টি। একদিন আরেক দিনের পুনরাবৃত্তি। এরই মধ্যে গড়িয়ে-গড়িয়ে প্রায় বুকে হামা দিয়ে দু-বছরের পাতা খসলো জীবন থেকে। মোমের মতো পুড়ে-পুড়ে ক্ষয় হ'লো। ধীরে-ধীরে তিল-তিল ক'রে। এই সময়ের ফাঁকটুকুতে বি. টি. পাস করলো শকুন্তলা, হিরণ্ময়ী আরো বুড়ো হ'লেন, প্রায় বুড়ি। সীমন্ত আই. এ. ফেল ক'রে দিদির কাছে পালিয়ে গেল।

আর, প্রমীলার আরো স্থিতি হ'লো সংসারে। সে গিন্নী হ'য়ে আরো মোটা হ'লো, আরো ফর্সা হ'লো। থানা, পুলিশ, আইন, আদালত, সুনির্মল, সব-কিছুর সাহায্য ছাড়াই তার পরম পেয়ারের একমাত্র বান্ধবী বিলাসী ঝি-কে সঙ্গে নিয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে, হাত নেড়ে, মুখ নেড়ে, শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গ নাচিয়ে, চিৎকারে আর্তনাদে একদিন তাদের দমদমের বাড়িতে গিয়ে যজ্ঞেশ্বরের কাপড় টেনে ধ'রে ভিড় জমিয়ে ফেললো; তারপর ভদ্রতা-সভ্যতা লজ্জা-সরম সম্ভ্রমের গলায় দড়ি দিয়ে আদায় ক'রে নিয়ে এলো আপন পাওনা-গণ্ডা।

তাদের বাপ-মেয়ের ঝগড়া দেখতে সমস্ত দমদম ভেঙে পড়লো সদরে অন্দরে হাত মুঠো ক'রে।

চোখ বুজে মূর্ছা গেলেন সুধাময়ী।

যজ্ঞেশ্বর বললো, 'হারামজাদী, আর যদি কোনোদিন এ-মুখো হোস জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো।'

প্রমীলা বললো, 'আমি থুতু ফেলতেও আর আসবো না তোমার

বাড়ি, কিন্তু তাই ব'লে আর যা বাকি আছে তা-ও আমি ছাড়বো ভেবে নিশ্চিন্ত থেকো না।'

এর পরে আশ্বিন এলো পুজোর গন্ধ নিয়ে। ঘোড়ার কেশরের মতো ফোলা-ফোলা পাল-তোলা শরতের শাদা মেঘের শিশুরা দাপাদাপি করতে লাগলো সারা আকাশ ভ'রে। ইশকুল কলেজ ছুটি হ'লো, ছুটির সুখ নামলো সব মানুষের মনে। শকুন্তলারও চিঠি এলো, সে আসছে।

এই তো একটু আশা। সব-কিছুর শেষে এই তো একটুখানি বেঁচে থাকার চকিত অবলম্বন। জীবনের কাছে একফোঁটা আশ্বাস, একবিন্দু ছায়া। স্বর্গ। এই অন্তহীন, নিরবচ্ছিন্ন একঘেয়ে দিনের উপর পাতলা একটু সুখের আস্তরণ। সুনির্মল স্টেশনে ছুটলো।

সকাল থেকেই সেদিন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ছিলো। দুপুর হ'তে-হ'তে ঝরোঝরো হ'লো। স্টেসনে আসতে-আসতে একেবারে ভেজা-ভেজা হ'য়ে গেল সে।

ট্রেন থেকে নেমে তার দিকে তাকিয়ে শকুন্তলা প্রায় আঁতকে উঠলো, 'ঈশ্! এত ভিজেছো?'

'বাইরে অসম্ভব বৃষ্টি।'

'এমন ঝড়-জলের মধ্যে না-হয় না-ই আসতে। কী আশ্চর্য!'

'এ-কথাটা যে তুমি ভাবতে পারলে সেটা আরো আশ্চর্য।'

'কেন, আমি কি ওয়াই. ডব্লিউ. সি.-এর পথ চিনি না? ওটুকু রাস্তা যেতে পারতুম না একা?'

'নিশ্চয়ই পারতে। কিন্তু আমি কি তোমাকে শুধু পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই এসেছি?'

নিশ্বাস ফেলে মাথা নিচু ক'রে একটু চুপ রইলো শকুন্তলা।

'কিন্তু এ-রকম ভেজা জামা-কাপড়ে থাকলে তোমার অসুখ করবে না?'

'চলো, চা খাই গিয়ে কোথাও ব'সে। শরীর গরম হবে, শুকিয়ে যাবো।'

'চায়ের গরমে তোমার এই ভেজা তাতবে?' মৃদু হাসলো কুন্তী, 'এ-সব কাপড়-জামা ছাড়তে হবে তোমাকে।'

'তা তো এক-সময়ে ছাড়বোই। তবে যতক্ষণে ছাড়বো ততক্ষণে দু-বার শুক্‌নো হবার অবকাশ পাবো।'

'গায়ে জল ব'সে অসুখ করবে।'

'ভালোই হবে, তুমি সেবা করবে।'

'তবে তার রিহার্সেলটা এই মুহূর্তেই হ'য়ে যাক্ না।' একফোঁটা হাসলো, 'আসল নাটক পর্যন্ত পৌঁছুবো এমন ভাগ্য ক'রে তো আসিনি সংসারে।'

'কুন্তী—'

'চলো, রিফ্রেশমেণ্ট-রুম নিইগে একটা, তারপর ধীরে আস্তে—'

'ঘর ভাড়া দেয়, কিন্তু সেখানে শুক্‌নো কাপড় ভাড়া দেয় ব'লে তো শুনিনি।' সুনির্মল ঠাট্টা করলো।

শকুন্তলা হেসে বললো, 'সে আমি দেখবো, এই জল-টুপ্‌টুপ্ মানুষ নিয়ে আর আমি দাঁড়াতে পারছিনে।' ব্যস্ত পায়ে কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা হ'লো সে।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে আসতেই একটা ঝাপটা লাগলো বাতাসের, বড়ো-বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা। দূর দিগন্ত পর্যন্ত গঙ্গার বুকে সেই কোটি-কোটি ফোঁটার আলোড়ন। পৃথিবী ঝাপসা।

হাতে আগাম টাকা এবং কিঞ্চিৎ ঘুষ নিয়ে দরজা খুলে দিলো গাউন-পরা কালো রং-এর খৃস্টান মাদ্রাজি মেম। ঈষৎ হাস্য বিনিময় ক'রে

ধন্যবাদ জানিয়ে কুন্তী তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতরে এলো। ক্ষিপ্র হাতে খুলে ফেললো স্যুটকেসটা। দু'খানা যথাসম্ভব ছোটো পাড়ের শাড়ি বা'র করলো তাড়াতাড়ি, বা'র করলো তোয়ালে, আয়না, চিরুনি। সুনির্মলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'নাও, ছেড়ে নাও শিগ্‌গির, আমি চায়ের কথা ব'লে আসি।'

'তুমি কি পাগল? আমি এই শাড়ি পরবো?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'মেয়েদের শাড়ি?'

এবার প্রায় ধমক দিলো কুন্তী, 'যা বলছি তাই করো তো, নাও, ধরো—' গুঁজে দিলো শাড়ি দু'খানা, 'একটা পরো, একটা চাদর ক'রে গায়ে দাও। তোয়ালে নাও, ভালো ক'রে মুছে নিও মাথাটা।'

সুনির্মল অবাক চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, মনে হ'লো কবেকার কোন্ অতীত থেকে হিরণ্ময়ী যেন কথা ক'য়ে উঠলেন শকুন্তলার মধ্যে।

নিঃশব্দে তার বুকের তলায় এসে দাঁড়ালো শকুন্তলা, আস্তে খুলে দিলো শার্টের বোতাম ক'টা, ভেজা গেঞ্জিতে হাতের উল্টোপিঠটা দু-বার বুলিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ তেমনি ক'রেই সুনির্মল দাঁড়িয়ে রইলো ঘরের মধ্যিখানে। বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগলো। মনে করতে পারলো না এই সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের মধ্যে আর কবে কুন্তী এমন ক'রে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সম্বন্ধ তাদের যতই ঘনিষ্ঠ হোক, এমন নিকট সান্নিধ্য তাদের এই প্রথম।

যতক্ষণে আবার ঘরে ফিরে এলো শকুন্তলা ততক্ষণে কাপড় ছাড়লো

স্থনির্মল। কুন্তীর কথা মতোই একখানা পরলো, আরেকখানা চাদর ক'রে গায়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর হ'লো। আয়নায় মুখ দেখে মাথা আঁচড়ালো পরিপাটি ক'রে, তোয়ালে দিয়ে হাত-পা মুছে বাবু হ'য়ে উঠে বসলো খাটের উপর। শকুন্তলা ঘরে এসে চোখে-চোখে তাকিয়ে মৃদু হেসে ভেজা কাপড় শুকুতে দিলো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। মুহূর্তে তৈরি হ'য়ে গেল দু-জন মানুষের ছোট্টো সংসারের আদিম সুখ। ধবধবে ঢাকনা-দেওয়া ট্রে-ভর্তি চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এলো বয়, নিবিড় হ'য়ে বসলো দু-জন।

মখমলের মতো নরম, পাখির পালকের মতো হালকা, গুনগুন গানের মতো অনায়াস একটি বৃষ্টি-স্নিগ্ধ সজল সুন্দর মধুর বেলা ব'য়ে গেল স্রোতের মতো, আজকের সুখ বুকের মধ্যে লেখা হ'য়ে থাকলো সোনার অক্ষরে, আজকের পরিতৃপ্তির তুলনা রইলো না কোনো।

বৃষ্টি থামলো সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায়।

পথে আসতে-আসতে আলো-জ্বলা শহরের দিকে তাকিয়ে সহসা আবার বিধুর হ'য়ে উঠলো দু-জনের মন।

'সব ছুটিটাই কিন্তু এখানে কাটাতে হবে।' সুনির্মল আবছা আলোয় শকুন্তলার মুখের দিকে তাকালো। শকুন্তলাও মুখ ঘোরালো রাস্তা থেকে, 'মেদিনীপুর যাবো না?'

'যাবে না কেন, এখন নয়, শেষের দিকে।'

'এবার ছুটির আর আমার শেষ নেই।'

'মানে?'

'আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।'

'চাকরি ছেড়ে দিয়েছো? হঠাৎ?' একটু খুশী-খুশী গলায়, 'কিঞ্চিৎ সুবুদ্ধি হয়েছে তা হ'লে? ভালোই হ'লো, এবার এখানে ভর্তি হ'য়ে এম. এ.-টা—'

'বিদেশ যাবো।' শকুন্তলার গলা ছলোছলো।

'বিদেশ!'

'হঠাৎ একটা স্কলারশিপ পেয়ে গেলাম।'

'কী!' সুনির্মলের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটলো।

'বলতে গেলে দাদাই যোগাড় ক'রে দিলেন সব, টিচার্স ট্রেনিং-এর জন্য ছ-জন মেয়ে বি. টি.—'

'ও।'

'ভাবিনি হ'য়ে যাবে।'

'হুঁ।'

'দাদা বলছিলেন এ-সুযোগটা ছাড়া উচিত হবে না—'

'তাই তো।'

[illegible]-সময় তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো শকুন্তলা। একটি দীর্ঘনিশ্বাসকে নি[illegible]ত করলো চেষ্টা ক'রে; তারপর ব্যথিত গলায় বললো, 'তুমি কি আমার উপর রাগ করছো সেজন্য?'

'না, রাগ কেন। রাগ কেন করবো।' সুনির্মল গলা পরিষ্কার ক'রে নিলো কেসে, 'ভালোই তো।'

'তুমিই বলো, এ-ছাড়া আমার বাঁচবার অন্য কী গতি ছিলো?'

'বাঁচবার?'

'শুধু আমার নয়, তোমারো।'

'আমারো!'

'হ্যাঁ। তোমারো সুনির্মল, তোমারো। আমার দূরে যাওয়াই ভালো, আমার সান্নিধ্যে তোমার কেবল দুঃখই বাড়ছে। আমি মাঝখানে না থাকলে হয়তো তোমার পারিবারিক জীবনও এর চেয়ে সহনীয় হবে।

আধো-আলো আধো-অন্ধকার ট্যাক্সির ভেতরে সুনির্মলের চোখ

পাথরের মতো নিবদ্ধ হ'লো শকুন্তলার মুখের উপরে, জলের স্বচ্ছতায় হীরের মতো জ্বলতে লাগলো সেই দৃষ্টি। সইতে পারলো না শকুন্তলা। তার সমস্ত সংযম উত্তাল হ'য়ে উঠলো সে-চোখে চোখ রেখে, নিজের হাতের মুঠোয় যেন কুড়িয়ে নিলো স্থনির্মলের দুটি হাত, ব্যাকুল গলায় বললো, 'আমাকে ক্ষমা করো তুমি, ক্ষমা করো, আমি আর সইতে পারছিনে এ-জীবন। না, না, না স্থনির্মল, এটুকুতে আমার ক্ষুধা মিটছে না, আমি চাই, আরো চাই, আরো, আরো। আমি সম্পূর্ণ ক'রে তোমাকে পেতে চাই।'

'কুন্তী—' কেঁদে উঠলো স্থনির্মলের গলা। কাঁদলো কুন্তীও, 'আমি তো একটা মানুষই, মানুষের মতোই আমার বাসনা-কামনা। এই ভালো-বাসার পবিত্র বেদিতে দেবী হ'য়ে ব'সে থেকে আর আমার মন ভরে না, প্রাণ ভরে না। পার্থিব ইচ্ছে প্রচণ্ড হ'য়ে আমাকে ছিঁড়ে খায়, [illegible] আর পারিনে, পারিনে।' বাতাসের হিল্লোলের মতো শকুন্[illegible] শরীরে কান্নার ঢেউ গড়িয়ে গেল। 'ঐ ছোট্টো শহরটুকুতে, [illegible] ছোটো এই মাস্টারির জীবন— তা-ও আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। ওখানকার লোকেরা আমাকে নিয়ে বলাবলি করে, আঙুল দিয়ে দেখায়। এমন কি স্কুলের মেয়েরা পর্যন্ত তোমার আমার নাম জড়িয়ে ফিসফিস করে। সবাই জানে তুমি একজন বিবাহিত ভদ্রলোক, তোমার সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ অবৈধ, অন্যায়, ঘৃণিত।'

শকুন্তলার চোখের জলে সারা পৃথিবী অন্ধকার হ'য়ে গেল স্থনির্মলের কাছে। তার নিচু-করা কেঁপে-কেঁপে ওঠা কালো চুলে ভরা মাথার উপর একখানা হাত রেখে সে ব'সে রইলো স্তব্ধ হ'য়ে।

এর পরের দিনগুলোর কোনো বর্ণনা নেই। বোবা, নিঃসাড়। যেমন রুক্ষ, তেমন দীর্ঘ। যেন লয়হীন গানের মতো, কাণ্ডারীহীন নৌকোর

মতো এলোমেলো। তিক্ত, অবসন্ন, শিথিল। কেবল কতগুলো বুক-চাপা মুহূর্তের ভার।

এর সঙ্গে দেখা করা, তার সঙ্গে কথা বলা। এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে সেখানে। পাসপোর্ট, ভিসা, ডলার, পাউণ্ড। মেদিনীপুর, বিন্তু, সুনন্দ, কান্নাকাটি। দুরন্ত কোলাহলময় অস্তিত্বের ছেঁড়া-ছেঁড়া স'রে-স'রে যাওয়া কতকগুলি ছায়া-ছবি।

আর, অবসর সময়ে প্রকাণ্ড গড়ের মাঠের কোনো-এক নির্জন গাছের ছায়ায় দুটি ব্যথিত বিষণ্ণ ব্যর্থ হৃদয়ের স্বাক্ষর, দুটি অবনত অতৃপ্ত আসন্ন বিচ্ছেদকাতর হতভাগ্য মানুষ।

[illegible] ক'রে-ক'রে চক্ষের পলকে কেমন ক'রে কোথা দিয়ে যে পাঁচটা [illegible]টে গেল বোঝাই গেল না। তারপর একদিন সন্ধ্যায় হাওড়া [illegible] কুন্তীকে বিদায় দিতে এলো সুনির্মল। লাবণ্যে ঢলোঢলো, [illegible]তো শান্ত স্নিগ্ধ মধুর কালো মেয়েটিকে। তার আত্মাকে। যার বাঁ হাতের আঙুলে মস্ত একফোঁটা চোখের জলের মতো ঝলসিত হীরের দ্যুতি। আজ সকালেই এই আংটিটি সুনির্মল পরিয়ে দিয়েছে তার হাতে। ঐ নিটোল গোল গণ্ডিটির মধ্যেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ ক'রে দিয়েছে নিজেকে চিরকালের মতো।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে সুনির্মলের হাত দুটিতে নিজের মুখ ঢেকে দাদার সামনেই ফুঁপিয়ে উঠলো কুন্তী; আর, শূন্য চোখে, অর্থহীন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো সুনির্মল। কী যে দেখলো, কী দেখলো না, কী ভাবলো আর কী যে ভাবলো না নিজেও বুঝলো না কিছু।

সুনন্দ সঙ্গে যাচ্ছে বম্বে পর্যন্ত। সেখানে বোনকে জাহাজে তুলে

দিয়ে ফিরে আসবে। গাড়ি ছাড়ার শেষ মুহূর্তে সুনির্মলের পিঠের উপর হাত রাখলো সে, নরম গলায় বললো, 'তবে চলি। আপনি শক্ত হোন সুনির্মলবাবু, যা হ'লো না, হবে না, তা তো মেনে নিতেই হবে? ওর কথা ভাবুন। একটা ভবিষ্যত আছে তো? এখানে থেকে, এ-ভাবে জীবন কাটিয়ে—'

ট্রেনের ঘরঘর চাকার তলায় কথা গুঁড়িয়ে গেল।

কেমন বোকার মতো হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো সুনির্মল। অনেক, অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ট্রেন মিলিয়ে গেল, ট্রেনের শব্দ মিলিয়ে গেল, লোকজন বিরল হ'লো, তবু দাঁড়িয়ে রইলো সে। কখন যে রাত বাড়লো একটু-একটু ক'রে, কখন যে হিম বাড়লো, আর কখন যে রাত্রির ভাঁজে-ভাঁজে একটু-একটু ক'রে ছড়িয়ে পড়লো হেমন্তের ঠাণ্ডা স্পর্শ কিছুই টের পেলো না।

সেই প্ল্যাটফর্মে আরো কি গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিলো, আবার কি কেউ চ'লে গিয়েছিলো কাউকে ছেড়ে? দেহের আবরণ থেকে আবার কি কারো আত্মা ফাঁকি দিয়েছিলো কাউকে? কিচ্ছু জানতে পারলো না। কেবল একটা সুনিবিড় শূন্যতার সুতীব্র মোচড়ে বুকের ভেতরকার সমস্ত অন্ত্রী-তন্ত্রী যেন ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেল।

এর পরে হিরণ্ময়ী গেলেন। শরৎ কাটিয়ে, হেমন্ত কাটিয়ে কোনো-এক শীতের শেষরাত্রে প্রায় নিঃশব্দে তাঁর দুঃখদীর্ণ ভাঙা শরীর থেকে তাঁর লাঞ্ছিত অবমানিত পরমাত্মাটি এই সংসার থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচলো।

যাবার আগে তিনি কিছুই বললেন না, কাউকেই ডাকলেন না,

দেখতে চাইলেন না। এত চুপে-চুপে গেলেন যে প্রায় টেরই পাওয়া গেল না। ভাই-বোনদের কাউকেই খবর দিতে পারলো না স্থনির্মল, মৃত মুখের দিকে শুকনো চোখে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে এক-সময়ে মনে-মনে চিৎকার ক'রে উঠলো, 'কান্না দাও, কান্না দাও। হে ঈশ্বর! একটু কান্না দাও। একটু চোখ-ঠাণ্ডা চোখের জল!

গেল। সব গেল। সবাই গেল! সবাই পালিয়ে বাঁচলো! কেবল সে-ই প'ড়ে রইলো তার স্বামীত্বের ভাঙা ইচ্ছে নিয়ে, ফুটো নৌকোর জল সেচন করতে। তাই তো! সে যাবে কোথায়? তার তো ভবিষ্যৎ নেই, তার তো বর্তমান নেই— অতীতের কতগুলো মৃত স্মৃতির স্তূপ ছাড়া আর তো কিছু নেই তার! সে তো কবেই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে গেছে পুঞ্জ-পুঞ্জ ঘন অন্ধকারের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে। না, সেখানে পথ নেই, পথ নেই। হাজার মাথা খুঁড়লেও সেই আলোহীন, হাওয়াহীন, আকাশহীন, মাটিহীন, নিশ্বাসরোধী মহাশূন্য থেকে আর এক ছিটে সূর্য পাবে না স্থনির্মল। তবে এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারই কি তার নিয়তি? তার অদৃষ্ট?

নিয়তি! অদৃষ্ট! হায়, হায়, এই তার নিয়তি? এই তার অদৃষ্ট?

শূন্য মনে, শূন্য শহরে, শূন্য শহরের ততোধিক শূন্য রাস্তায়-রাস্তায় কতো ঘুরে বেড়ালো স্থনির্মল। কতো হোঁচট খেলো, কতো রক্তপাত হ'লো, অবসন্নতায় ভেঙে এলো শরীর, তারপর একদিন ফিরতেই হ'লো ঘরে। ফিরতেই হ'লো। নতজানু হ'য়ে নিজেকে সমর্পণ করতেই হ'লো অদৃষ্টের কাছে।

মনে-মনে বলতে হ'লো, হে আমার অদৃশ্য নিয়তি! তবে তুমিই নাও! তুমিই নাও আমাকে! এই হার-মানা, পোড়-খাওয়া, ভাঙাচোরা

অসহায় মানুষকে। এই ভাগ্যহত আমিকে। আমি এখন তোমার। তোমার। সম্পূর্ণ তোমার।

তোমার কাছেই আমি আমার এই একান্ত প্রার্থনা নিয়ে অঞ্জলি পেতে রইলাম, যেদিন আর সকাল ছ-টায় বেরিয়ে গিয়ে রাত দশটায় ফিরে আসতে হবে না প্রমীলার বাড়িতে, ফিরে এসে জালি-ঢাকা ঠাণ্ডা খাবার খেয়ে বিছানায় শুয়ে নির্ঘুম চোখে এ-পাশ ও-পাশ ক'রে রাত কাটাতে হবে না নিতান্তই আয়ু ফুরোয় না ব'লে।